আল্লামা ইকবাল

দ্বিতীয় খণ্ড

en

১৯৮৬ সালে আত্মপ্রকাশের পর হতে
আল্লামা ইকবাল সংসদের
প্রকাশনাসমূহ

১.	আল্লামা ইকবাল সংসদ স্মরণিকা	এপ্রিল ১৯৮৬
২.	জবাব	নবেম্বর ১৯৮৬
৩.	অনুভব	এপ্রিল ১৯৮৭
৪.	অধিকার	নবেম্বর ১৯৮৭
৫.	থ্রি ফোল্ডার	নবেম্বর ১৯৮৭
৬.	মাওলানা আবদুর রহীম স্মরণে	১৯৮৮
৭.	আল্লামা ইকবাল সংসদ পত্রিকা	এপ্রিল ১৯৮৮
৮.	আল্লামা ইকবাল সংসদ পত্রিকা	নবেম্বর ১৯৮৮
৯.	**Iqbal Studies**	**April 1989**
১০.	আল্লামা ইকবাল সংসদ পত্রিকা	নবেম্বর ১৯৮৯
১১.	আল্লামা ইকবাল [প্রথম খণ্ড]	১৯৮৯

প্রতিটি প্রকাশনা আপনার সংগ্রহকে সমৃদ্ধ করবে

কপি সংখ্যা সীমিত

আপনার কপির জন্য যোগাযোগ করুন

প্রকাশনা সম্পাদক

আল্লামা ইকবাল সংসদ

১০৯, নাজিম উদ্দীন রোড, ঢাকা

IQBAL ACADEMY PAKISTAN
Library
30992
LAHORE.

আল্লামা ইকবাল

সম্পাদনা কমিটি

ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন [চেয়ারম্যান]
অধ্যাপক শাহেদ আলী
এস. মুজিবউল্লাহ
প্রিন্সিপাল কে. এ. রহমান
প্রফেসর এ. এফ. এম. হোসাইন আহমদ
মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম
সৈয়দ তোসারফ আলী
আবদুল ওয়াহিদ

মূল্য ঃ ৫০ টাকা
২ ডলার

প্রকাশনায়

আল্লামা ইকবাল সংসদ
১০৯, নাজিম উদ্দীন রোড, ঢাকা

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ কাদেরিয়া পাবলিকেশন্স এণ্ড প্রোডাক্টস লিঃ
২/১, আর. কে. মিশন রোড, ঢাকা।

ছাপাঃ মাসরো প্রিন্টিং এণ্ড প্যাকেজিং, ১৪৩/১, আরামবাগ, ঢাকা

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

আমাদের কথা ।। ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন

প্রবন্ধ

১. ইকবাল ও মানবতাবাদ ।। দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ৯
২. ইনসানে কামেল সম্পর্কে আল্লামা ইকবালের মতবাদ ।। ডঃ আবু সাঈদ নূরুদ্দীন ১৫
৩. আল্লামা ডঃ মুহাম্মদ ইকবাল ।। আববাস আলী খান ২৪
৪. ইকবাল সাহিত্যের আদর্শ ।। আবদুল মান্নান তালিব ৩৬
৫। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইকবালের চিন্তাধারা ।। প্রফেসর এ. এফ. এম. হোসাইন আহমদ ৩৯
৬. ইকবালঃ ক্ষণজন্মা দার্শনিক ।। অধ্যাপক আবু বকর রফীক ৪৭
৭. ইকবালের নাম মুছে ফেলা সহজ নয় ।। সৈয়দ তোসারফ আলী ৫৩
৮. ইকবাল ও গণতন্ত্র ।। কানিজ-ই-বাতুল ৫৮
৯. ইকবাল সাহিত্যে নও-মুসলিম প্রসঙ্গ ।। মুহাম্মদ সাখী মিঞা ৬২
১০. বিশ্ব-গৌরব ইকবাল ।। আবদুল ওয়াহিদ ৬৭
১১. ইকবাল ও সরোজিনী নাইডু ।। ফারুক আহমাদ খান ৮৬
১২. ইকবালের আফগানিস্তান সফর ।। মোজ্জাম্মেলুল হক ৮৮
১৩. ইকবাল ও জওয়াহের লাল নেহরু ।। ছালেহ আহমাদ ৯১
১৪. ইকবালের স্মরণীয় বাণী ।। শরীফুল মুজাহিদ ৯২

অনুবাদ প্রবন্ধ

১৫. ইকবাল ও তাঁর শিল্পের সঙ্গে আমার পরিচয়
মূল ঃ মাওঃ সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী ৯৯
প্রিন্সিপাল কে. এ. রহমান অনূদিত
১৬. ইকবালঃ আমার হৃদয়ের সাথী, অকৃত্রিম বন্ধু
মূল ঃ মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদুদী
মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম অনূদিত

১৭. ইকবালের হাস্য-কৌতুক
মূল ঃ সাবের কালুরাবী
আবু নায়ীম অনূদিত ১০৬

পুনর্মুদ্রণ

২১. ইকবাল ও গোলাম মোস্তফা ।। ডঃ মুহম্মদ আবদুল্লাহ ১০৮
২২. ইকবাল-কাব্যের শিল্পরূপ ।। মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজ উল্যাহ ১২৭
২৩. আযাদ রাষ্ট্রের স্বপ্ন ।। ডঃ মুহাম্মাদ ইকবাল ১৪২
সৈয়দ আবদুল মান্নান অনূদিত
২৪. ইকবাল [১৮৭৭—১৯৩৮] ১৬৫
২৫. জাগরণের পথে আফগানী ১৭১

অনুবাদে ইকবাল

১৭২
১৮. হাস্‌নাইন ইমতিয়াজ ।। খোশহাল খানের ওসিয়ত
১৯. মতিউর রহমান মল্লিক ।। ইকবালের কবিতা ১৭৩
২০. মনীর উদ্‌দীন ইউসুফ ঃ ইবলিসের পরামর্শ-সভা ১৭৫

ENGLISH ARTICLES

26. POLITICAL PHILOSOPHY OF IQBAL ১৮০
ADVOCATE MUJIBUR RAHMAN
27. ABSTRACT OF CONTENTS ১৯০
DR. SYED SAJJAD HUSAIN

২৮. ইকবালের ৫২-তম মৃত্যুবার্ষিকী উদযাপন সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত।।
নূরুজ্জামান ১৯১

যাঁদের লেখা ছাপা হয়েছে

ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন ঃ উপদেষ্টা, চেয়ারম্যান, সম্পাদনা ও প্রকাশনা কমিটি
দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ ঃ বিশিষ্ট দার্শনিক, শিক্ষাবিদ, লেখক ও বুদ্ধিজীবী
ডঃ আবু সাঈদ নূরুদ্দীন ঃ ইকবাল স্কলার
ডঃ মুহম্মদ আবদুল্লাহ্ ঃ গবেষক, অধ্যাপক ও চেয়ারম্যান, উর্দূ ও ফার্সী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
প্রিন্সিপাল কে. এ. রহমান ঃ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, লেখক, অনুবাদক
আববাস আলী খান ঃ ইসলামী চিন্তাবিদ, লেখক, অনুবাদক, রাজনীতিক
মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজ উল্যাহ্ ঃ কবি, লেখক, অনুবাদক, পরিচালক, নজরুল ইনস্টিটিউট
আবদুল মান্নান তালিব ঃ সম্পাদক, মাসিক পৃথিবী ও কলম
সৈয়দ আবদুল মান্নান ঃ মরহুম, ইকবাল গবেষক
প্রফেসর এ. এফ. এম. হোসাইন আহমদ ঃ মাদ্রাসা-ই-আলিয়া, ঢাকা
অধ্যাপক আবু বকর রফীক ঃ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া
হাস্‌নাইন ইমতিয়াজ ঃ লেখক, অনুবাদক, সাহিত্য সম্পাদক, দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা
মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম ঃ ইসলামী চিন্তাবিদ, লেখক, অনুবাদক, একসিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ
সৈয়দ তোসারফ আলী ঃ সম্পাদকীয় সহকারী, দৈনিক ইত্তেফাক, ঢাকা
কানিজ-ই-বাতুল ঃ লেকচারার, উর্দূ ও ফার্সী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
মতিউর রহমান মল্লিক ঃ খ্যাতিমান কবি, গীতিকার, সুরকার, আশির দশকে ইকবালের কবিতার অনুবাদক
শরীফুল মুজাহিদ ঃ লেখক, অনুবাদক, ছাত্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা
আবু নায়ীম ঃ মাওলানা, হাফেজে কুরআন, গ্রন্থকার, লেখক, অনুবাদক,
মুহাম্মদ সাখী মিঞা ঃ সমাজসেবী, ব্যবসায়ী
আবদুল ওয়াহিদ ঃ লেখক, অনুবাদক, সমালোচক
ফারুক আহমাদ খান ঃ মাওলানা, লেখক, অনুবাদক, সমালোচক
মোজ্জাম্মেলুল হক ঃ ছাত্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ছালেহ আহমাদ ঃ ছাত্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
নূরুজ্জামান ঃ লেখক, সমালোচক, সাংবাদিক

Mujibur Rahman : Senior Advocate, Bangladesh Supreme Court.
Dr. Syed Sajjad Husain : Former Vice-chancellor, Rajshahi and Dacca Universities.

আমাদের কথা

গত সাত-আট মাসে *আল্লামা ইকবাল সংসদ*-এর উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যে সাড়া পাওয়া গেছে তা আশাব্যঞ্জক। ইকবাল সম্বন্ধে কিছুকাল যে সংশয় একশ্রেণীর মনে দেখা দিয়েছিল সেটা অনেকখানি কেটে গেছে বলে আমাদের ধারণা।

সংসদের বর্তমান প্রকাশনায় সৈয়দ তোসারফ আলী জোরালো ভাষায় বলেছেন যে, বড় কোন কবি বা শিল্পীর মূল্য অগ্রাহ্য করা যায় না। মহৎ সাহিত্য এবং শিল্প কোন গোষ্ঠীর একচেটিয়া সম্পত্তি নয়। শিল্প বিশেষতঃ সাহিত্য বিশেষ একটি মাধ্যমের সাহায্যে আত্ম—প্রকাশ করে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, সে সাহিত্যের আবেদন একটি ভাষার মধ্যেই সীমিত থাকতে বাধ্য। সাহিত্যের সীমাবদ্ধতা নেই তা নয়; কারণ সাহিত্য অনেক রকমের হতে পারে এবং হয়েও থাকে। কিন্তু একথা বলা বাহুল্য যে, মহৎ সাহিত্যের একটি সার্বজনীন আবেদন থাকে যা শ্রেণী ও গোষ্ঠীবিশেষে সবার মনে সাড়া জাগায়। ইকবাল ছিলেন এই ধরনের কবি।

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ তাঁর প্রবন্ধে দেখিয়েছেন যে, আপাতদৃষ্টিতে মুসলমান সমাজ সম্বন্ধে তিনি চিন্তা-ভাবনা করেছেন মনে হলেও ইকবাল ছিলেন মানবতার কবি, তাঁর কাব্যের মূল সুর হয়েছে মানবতাবাদের সুর।

অবশ্য একথা সত্য যে, ইংরেজ কবি কীটস্-এর মত কবিও আবির্ভূত হন যাঁরা সমসাময়িক সামাজিক সমস্যা সব এড়িয়ে গিয়ে অ্যাবস্ট্রাক্ট রূপের সন্ধান করেন। কীটসের মধ্যে বাস্তব জীবনের কোন প্রতিফলন নেই তা নয়। কিন্তু তাঁর বিখ্যাত *[ODE]* ওড-গুলিতে অথবা *HYPERION* বা *ST AGNES EVE* প্রভৃতি কবিতায় যে জগতের চিত্র তিনি এঁকেছেন তা প্রধানত কল্পিত জগত। কীটস মনে করতেন কাব্যের সাধনা যে করে তার পক্ষে অন্য কোন সমস্যায় জড়িয়ে পড়া অন্যায়। কিন্তু সব কবি এই মতবাদের সমর্থন করেননি। কীটসের যুগেরই শেলি, বায়রন এমনকি ওয়ার্ডস্বার্থ পর্যন্ত নানা রাজনৈতিক আন্দোলন এবং মতবাদের সমর্থন করেছেন। বায়রন তো অতিমাত্রায় এ সমস্ত আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন।

কালের বিচারে এঁদের কাব্যের মূল্যায়ন হয়েছে তাঁদের রাজনৈতিক মতামতের সমর্থন যোগ্যতা দিয়ে নয়, অন্য মাপকাঠিতে। ইংরেজিতে কবি *CRABBE* (ক্র্যাব) আরও সমাজ-সচেতন ছিলেন। কিন্তু ইংরেজি সাহিত্য ও ইতিহাসের ছাত্র ছাড়া আর কেউ তাঁকে স্মরণ করে না। কবি হিসাবে তিনি শেলি বা বায়রনের সমকক্ষ নন।

ইকবালের বিচারও হবে এই মানদণ্ডেই। তাঁর *শিকওয়া* বা *জাবেদনামা* একাধারে ইসলামের প্রতি তাঁর গভীর আনুগত্যের প্রকাশ। অন্যদিকে দুস্থ মানবতার জন্য এর মধ্যে রয়েছে এমন বাণী নিহিত যার মূল্য শাশ্বত। যা কখনও ম্লান হতে পারে না।

একথাও স্মরণ রাখা দরকার যে, ইকবাল ইসলামের কথা বলেছেন কিন্তু কোন মুসলিম দলের

মতবাদ প্রচার করেননি। মুসলিম লীগেরও নয়। তিনি নিজে এককালে মুসলিম লীগের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে জড়িত ছিলেন কিন্তু দলীয় স্বার্থকে কবিতার উপজীব্য করে তোলার প্রয়াস তাঁর মধ্যে নেই।

ইসলাম তাঁর কাছে একটি সার্বজনীন আদর্শবাদ। ইসলামের সাম্য-মৈত্রীর বাণী— বিশ্ব মানবতাবাদের আদর্শের জয়গান তিনি গেয়েছেন অকুণ্ঠচিত্তে।

ইকবালের আরেকটি বৈশিষ্ট্য বিশেষ অনুধাবনযোগ্য। প্রথম জীবনে তিনি লিরিক কবিদের মত বিচ্ছিন্ন নানা দৃশ্য এবং বিষয় নিয়ে কবিতা লিখেছেন। তিনি তাঁর বক্তৃতায় বলেছেন যে, মহৎ কাব্য হবে মহৎ দার্শনিক চিন্তার বাহন। উপমহাদেশের সমপর্যায়ের আর কোন কবি দার্শনিক তত্ত্ব নিয়ে এ ধরনের কাব্য সৃষ্টি করতে পারেননি। উর্দু কবি হালীর *মুসদ্দস* কাব্য হিসাবে ইকবালের কোন রচনার সমমূল্যের নয়। তেমনই পরবর্তী যুগের হাফিজ জলন্ধরীর *শাহনামায়ে ইসলাম* প্রধানত বর্ণনামূলক ; ইকবালের কবিতার গভীরতা, তার অন্তর্দৃষ্টি তার মধ্যে অনুপস্থিত। কবি দান্তের মধ্যে যেমন *VITA NUOVA* থেকে শুরু করে *THE DIVINE COMEDY* পর্যন্ত সব রচনা একসুরে গাঁথা তেমনি ইকবালের সমস্ত রচনার অন্তর্নিহিত সুর এক। তবে তাঁর কৃতিত্বের প্রমাণ এখানেই যে, তাঁর রচনায় একঘেঁয়েমি নেই। প্রত্যেকটি কাব্যই মনে হয় মৌলিকতায় ভাস্বর।

ইকবাল দার্শনিক তত্ত্বকে কবিতার বিষয়বস্তু হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন বললে সবটা বলা হয় না। কারণ, তাঁর মধ্যে অধ্যাত্মবাদের যে সুর— যা প্রকাশ পেয়েছে বিশেষভাবে *আসরারে খুদীর* মধ্যে— সেদিক দিয়েও তিনি বিশিষ্ট। বাংলায় অধ্যাত্মবাদমূলক কোন মহৎ সৃষ্টি নেই। অধ্যাত্মবাদ নিয়ে আরেক ব্যক্তি যিনি উপমহাদেশে কাব্য রচনা করেছেন তিনি হচ্ছেন অরবিন্দ ঘোষ। কিন্তু তাঁর বাহন ইংরেজি। কোন ভারতীয় ভাষা নয়। তবু ইকবাল এবং অরবিন্দ ঘোষ দু'জনই বিভিন্ন পথ ধরে যে উপলব্ধিতে এসে পৌঁছেছিলেন তার তুলনামূলক আলোচনা হলে হিন্দু-মুসলিম সভ্যতার স্বরূপ সম্বন্ধে অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হতে পারে।

ইকবাল সম্বন্ধে অনেক গবেষণা এবং আলোচনার অবকাশ আছে। তাঁকে অগ্রাহ্য করার অর্থ মহৎ সাহিত্যকে অগ্রাহ্য করা। *আল্লামা ইকবাল সংসদ* এই লক্ষ্য নিয়েই স্থাপিত হয়েছে।

ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন
চেয়ারম্যান
সম্পাদনা ও প্রকাশনা কমিটি

তারিখঃ ০৮-০৮-৯০ ইং

ইকবাল ও মানবতাবাদ

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ

মানবতাবাদ সম্বন্ধে প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে ভিন্ন ধারণা রয়েছে। পঞ্চদশ শতকে ইউরোপের বুকে যে মানবতাবাদ প্রচারিত হয়েছিল, তাতে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের মনীষী তাদের নিজস্ব মতবাদ প্রচার করে তৎকালীন সামন্ততন্ত্রীয় ও ধর্মীয় মতবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। ইতালীবাসী প্রেট্রার্কের [১] দ্বারা তার সূচনা হলেও সমগ্র পশ্চিম ইউরোপে তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। পেট্রার্কের মতবাদ অনুসারে মধ্যযুগীয় চিন্তাধারা পরিত্যাগ করে সনাতন ক্ল্যাসিকেল বা গ্রীকদের ধ্যান-ধারণার চর্চা হওয়া উচিত। তার এ চিন্তার সঙ্গে হল্যাণ্ডবাসী ইরেসমাসও (১৪৩৬-১৫৩৬) [২] মধ্যযুগীয় চিন্তার সম্পূর্ণ বিপক্ষে মানুষকে চিন্তার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা দেয়ার জন্য মানবজীবনে যে কৃত্রিম সমাজ গড়ে উঠেছে তাকে অস্বীকার করে সারা বিশ্বেই তার আবাস বলে ঘোষণা করেছিলেন। ফ্রান্সের ধর্মযাজক সমাজের রেবেলা (১৪৯০-১৫৫৩) [৩] খৃষ্টসমাজের রীতি-নীতিকে অস্বীকার করে এ বিশ্বের সর্ব মানবের নিকট গৃহীত আদর্শ নীতির প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। ইংল্যাণ্ডের স্যার টমাস মূর (১৪৭৮-১৫৩৫) [৪] সমাজবাদমূলক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে সকলে মিলে সমানভাবে এ বিশ্বের সম্পদ ভোগ করার পরিকল্পনা করেছিলেন। প্লেটোর মতবাদ দ্বারা তা প্রভাবান্বিত হলেও, তাতে তার নিজস্ব কতকগুলো অবদান ছিল। অপরদিকে স্পেনের স্যার ডেন্টীস্ (১৫৪৭-১৬১৫) [৫] মধ্যযুগীয় শৌর্য-বীর্যের ধারণাগুলো পরিত্যাগ করে মানবজীবনে সুকুমার বৃত্তিগুলোর প্রতিষ্ঠাকেই রূপকের আকারে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। সেক্সপীয়র এবং মারলো [৬] এ দুনিয়াতেই মানব-জীবনের কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে হয়– এ নীতি প্রচার করে মানব-মানসকে ইহলোকমুখী করতে সমর্থ হয়েছিলেন। সমগ্র মধ্যযুগে ইউরোপে পারলৌকিকতার প্রতি মানব-সমাজে যে-সব বিশ্বাস ও আশ্রয়শীল মনোভাব ছিল তার প্রতি আঘাত হেনেছিলেন।

তার ফলে পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইউরোপের বুকে যে আন্দোলন দেখা দেয় তারই ফলশ্রুতিতে এ দুনিয়ায় মানবতাবাদ এক রূপ পরিগ্রহ করে। এ মানবতাবাদের মূল বক্তব্য ছিল মানুষকে চিন্তা বা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে। কোন ধর্মযাজক বা চার্চের কর্তা মানুষের বিশ্বাস বা প্রত্যয়কে নিয়ন্ত্রণ করবে না। মানুষকে ধর্মের মাধ্যমে শোষণ করবে না এবং জাতীয়তাবাদের প্রাচীর গড়ে তুলে মানুষে মানুষে ভেদের সৃষ্টি করবে না। মানবতাবাদী পূর্বোক্ত মনীষীদের দ্বারা মানবতাবাদের কোনও বিশেষ বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি। প্রত্যেক মানবতাবাদীই তার বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে সে সম্বন্ধে আলোচনা ও প্রচার করেছেন। এতে প্রতীচ্যে যে মানবতাবাদ দেখা দেয়, তার ফলেই ধর্মের রাজ্যে প্রত্যেকের স্বাধীনতার জন্য ষোড়শ শতাব্দীতে মার্টিন লুথার (১৪৮৩-১৫৪৬) [৭] বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তার ফলেই প্রটেস্টাণ্ট মতবাদের উৎপত্তি হয়।

অপরদিকে, ব্যক্তিস্বাধীনতার নীতি যে মানবতাবাদে প্রবর্তিত হয়েছিল তারই ক্রিয়াশীলতার ফলে রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রজাতন্ত্রের উৎপত্তি হয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী রাষ্ট্র বিপ্লবে। তার নীতি হিসাবে গ্রহণ করা হয় সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা। সে শতাব্দীতেই আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে রাষ্ট্রীয় জীবনে ব্যক্তিস্বাধীনতার নীতি বিশেষভাবে স্বীকৃতি লাভ করে। তার ফলে ইউরোপ তথা আমেরিকায় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পঞ্চদশ শতকে ইউরোপে যে মানবতাবাদ প্রচারিত হয়েছিল তারই ফলশ্রুতিতে পরবর্তীকালে প্রতীচ্যে গণতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্রের উৎপত্তি ও প্রতিষ্ঠা হয়। অধ্যাপক সিলভাঁ লেভি[৮] তাকে মানবতাবাদের প্রতীচ্য রূপ বলে অভিহিত করেছেন।

অপরদিকে প্রাচ্যে, বিশেষ করে ভারতে যে মানবতাবাদ বিকাশ লাভ করে তার রূপ সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন। ভারতে আর্যদের আগমনের পরে ধর্ম বা তত্ত্বজ্ঞান সংক্রান্ত চিন্তার পরিণতিতে উপনিষদে ব্রহ্মধারণা বিকাশ লাভ করে। ব্রহ্মের এ ধারণার মধ্যে রয়েছে দু'টো দিক। একদিকে ব্রহ্ম নির্গুণ অপরদিকে ব্রহ্ম সগুণ। নির্গুণ ব্রহ্ম থেকে এ দুনিয়ার সকল কিছুর উৎপত্তি বলে ধারণা করা হয়। এ জন্য এ বিশ্বের সকল বিষয়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ রয়েছে। মানুষের সঙ্গে মানুষের তো নিছক সম্বন্ধ রয়েছেই, তার সঙ্গে সঙ্গে একই স্থিতি থেকে সকল জীবের উৎপত্তি বলে মানুষের সঙ্গে পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ এবং বৃক্ষাদিরও সম্বন্ধ রয়েছে। এ জন্য স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন ঃ 'মানুষ কেন অপর মানুষকে ভালবাসবে তার উত্তর প্রত্যেক ধর্ম থেকে পাওয়া যায়। কারণ, সকল মানুষই এক আদিম মানুষের সন্তান। তবে, মানুষ কেন কুকুর বা অন্যান্য ইতর প্রাণীকে ভালবাসবে, তার একমাত্র উত্তর হিন্দু ধর্মই দিতে পারে। কারণ, তাতে রয়েছে সকল জীবই এক নির্গুণ ব্রহ্ম থেকে উৎপন্ন। এ জন্য তারা সকলেই জন্মসূত্রে এক।[৯] উপনিষদের এ ধারণা ভারতীয় মননধারাতে প্রবল প্রভাব বিস্তার করেছে। পরবর্তীকালে ভারতীয় কবি বা সাহিত্যিকদের চিন্তাধারায় এবং মনীষীদের মনীষায়ও প্রভাব বিস্তার করেছে। ভারতীয় হিন্দু সমাজে পূর্বাপর এ প্রত্যয় বিশেষভাবেই কার্যকর ছিল। খৃষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতকের ভারতীয় রাজা ২য় চন্দ্র গুপ্তের (বিক্রমাদিত্যের) সভাকবি কালিদাসের রচনাতে সে দার্শনিকতত্ত্বের প্রভাব বিশেষভাবে সুস্পষ্ট। তার রচিত *'মেঘদূত'* কাব্যের নায়ক নির্বাসিত যক্ষ মেঘকে তার দূত হিসাবে তার প্রিয়ার কাছে অলকাপুরীতে পাঠিয়ে দিয়ে তার মর্মবেদনা পৌঁছে দেবার জন্য নিয়োগ করছে। এতে মানুষের সঙ্গে প্রাকৃতিক বস্তুরও যে নিগূঢ় সম্বন্ধ রয়েছে তা প্রকাশ পাচ্ছে। এ সম্বন্ধের স্বীকৃতি তাঁর রচিত নাটক *'শকুন্তলা'*তেও চমৎকার রূপ নিয়েছে। কন্ব মুনীর আশ্রমে প্রতিপালিতা শকুন্তলা আশ্রম কুমার শার্বঙ্গব ও শারদ্বত সহকারে তার প্রতি রাজা দুষ্মন্তের প্রাসাদে গমন করার পূর্বে একদিকে যেমন তার সখি প্রিয়ম্বদা ও অম্পরার নিকট থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন, তেমনি আশ্রমে পালিত হরিণ শিশু বা আশ্রমের গাছ-বৃক্ষ , লতা-পাতা সকল কিছুর নিকট থেকেও বিদায় গ্রহণ করছেন। এতে মানুষ ও অপরাপর জীবের মধ্যে যে নিগূঢ় প্রাণের সম্বন্ধ রয়েছে তা-ই প্রমাণিত হচ্ছে। এতে উপনিষদে যে তত্ত্ব ব্যক্ত হয়েছে তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে— মানুষ ও ইতর জীবের মধ্যে ঐক্যের সম্বন্ধের মধ্যে। মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রেম ও ঐক্যের নিগূঢ় সম্বন্ধের তত্ত্ব প্রকাশ পাচ্ছে পূর্বোক্ত রাজা বিক্রমাদিত্যের বৈমাত্রেয় ভাই ভর্তৃহরির আদর্শিক বচনের মধ্যে। তিনি উদাত্ত স্বরে ঘোষণা করেছেন ঃ

অয়ং নিজো পরবেতি গণনা লঘু চেত সাম

ইকবাল ও মানবতাবাদ

উদার চরি তানাংতু বসুদেব কুটুম্বকং

আপন-পর গণনা করা লঘুচিত্ত লোকের কাজ। উদার চরিত্রের লোকের নিকট সমগ্র পৃথিবীই কুটুম্ব। [১০]

এ মানবতাবাদের প্রকাশ পরবর্তীকালেও ভারতীয় নানা ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের নানা রচনার মধ্যেও তা রূপলাভ করেছেঃ

মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই
এই সূর্য্য করে– এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয় মাঝে যদি স্থান পাই

এ উক্তিতেও মানবজীবনের সঙ্গে প্রকৃতির এবং মানুষের সঙ্গে মানুষের অনাবিল প্রেমের সম্বন্ধ প্রকাশ পেয়েছে। অধ্যাপক সিলভাঁ লেভি এ ধরনের প্রত্যয়কে প্রাচ্যের মানবতাবাদ বলে অভিহিত করেছেন। [১১]

ইকবাল যে মানবতাবাদ এ দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াসী ছিলেন– সে মানবতাবাদের ভিত্তি রয়েছে কুরআন-উল-করীমে। তাতে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, তিনি এ দুনিয়ায় মানুষকে তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সৃষ্টি করেছেনঃ প্রতিনিধি হতে হলে তাকে মূল মালিকের গুণে গুণান্বিত হতে হবে। এ জন্য সৃষ্টির পরে যাতে মানুষ প্রকৃত মানুষ হতে পারে সে জন্য তার আদর্শ শিক্ষক হিসাবে হযরত রাসূল-ই-আকরাম মুহাম্মাদ মোস্তফা (সঃ)-কে আদর্শ শিক্ষক এবং কুরআন-উল-করীমকে নির্দেশিকা হিসাবে প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ্র রয়েছে একদিকে জাত *[Essence]* অপরদিকে ৯৯ গুণাবলী। মানুষ সে গুণাবলীকে একদিকে যেমন জ্ঞানের মাধ্যম হিসাবে *[categories of understanding]* ব্যবহার করবে, তেমনি তার জীবনে সেগুলোর রূপায়ণের দ্বারা প্রকৃত মানুষ বা ইনসান-ই-কামিল হবে। তার ফলে সে আল্লাহ্র প্রকৃত প্রতিনিধি হয়ে তার বিশ্ব চরাচরে তারই শাসন যেমন প্রতিষ্ঠিত করবে, তেমনি এ দুনিয়াতে যত অমঙ্গল, যত অত্যাচার-অনাচার রয়েছে সেগুলোকে উৎসাদিত করে তাকে এক অনিন্দ্যসুন্দর ও অভূতপূর্ব মঙ্গলময় রাজ্যে পরিণত করবে। কুরআনের এ মহৎ শিক্ষার অর্থ– মানুষের সৃষ্টি হয়েছে তাকে আল্লাহ্র খলিফা করে এ দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে। এ জন্য তার খুদির বিকাশ অত্যাবশ্যক। খুদির যত বিকাশ হবে তার জীবনে আল্লাহ্র গুণাবলীও ততই বিকাশ লাভ করবে। খুদি পূর্ণ বিকশিত হলেই সে ইনসান-ই-কামিল হবে। ইনসান-ই-কামিল বা পূর্ণ বিকশিত মানবাত্মা, আল্লাহ্র অস্তিত্বের মধ্যে লোপ পাবে না। সে মানুষ থেকেই যেখানে মানবতার অপমান হচ্ছে সেখানে আল্লাহ্র প্রতিনিধি হিসেবে তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করবে। এভাবে উদ্দীপ্ত হয়েই ইকবাল ঘোষণা করছেনঃ

উঠো মেরি দুনিয়া কি গরীবোঁ কো জাগা দো

এতেই তার মানবতাবাদ অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ পাচ্ছে। আল্লাহ্র গুণে গুণান্বিত ইনসান-ই-কামিলের নিকট মানবতার এ আদর্শলোকে ধর্ম, বর্ণ, জাতি, গোত্র নির্বিশেষে মানুষ হিসাবে সকলের সমান অধিকার। এখানে ভেদাভেদের প্রাচীর নেই। তিনি উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা

করেছেন ঃ

আদমিয়ৎ কী–মানুষের সম্মান করো
মানুষের মর্যাদা শিক্ষা করো
একটা কঠোর কথা বলা পাপ
কারণ কাফের ও মোমেন সবাই খুদার বান্দা।
হৃদয় পানি-মাটির জিন্দানে বন্দী থাকলেও
এই বিশাল বিশ্ব বিরাট হৃদয়ের সাম্রাজ্য।

এতে স্পষ্টই বুঝা যায়, তিনি যে মানুষকে ইনসান-ই-কামিল বলে তার বিভিন্ন বাচনে উল্লেখ করেছেন সে ইনসান-ই-কামিলের নিকট মানুষের বিভিন্ন প্রত্যয় বা বিভিন্ন তত্ত্বজাত বিভিন্নতা মানব প্রেম সৃষ্টির পক্ষে যদি প্রতিবন্ধক হয় তা হলে সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। আল্লাহ্র প্রতিনিধি আল্লাহ্রই মহান গুণাবলী রহিম ও রহমানের অধিকারী হয়ে এ দুনিয়ার সর্বত্র প্রেমের প্রতিষ্ঠা করবে। তবে, আল্লাহর কেবল এ গুণটাই গুণ নয়; আল্লাহর রয়েছে আরও গুণ। তন্মধ্যে 'রব' নামক গুণকে ধারণা করা হয় *'ইসমে আজম'* বা সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ বলে। 'রবের' মৌলিক অর্থ হচ্ছে সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও বিবর্তনকারী। তিনি এ বিশ্ব সৃষ্টি করেছেন—এ বিশ্বের সকল জীবকে তিনি পালন করছেন এবং বিবর্তনের ধারায় তিনি এ বিশ্বচরাচরকে উচ্চ থেকে উচ্চতর পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছেন। আল্লাহ্র প্রতিনিধি হতে হলে মানুষকে একদিকে যেমন তাঁরই মত নানাবিধ সৃষ্টি দ্বারা এ বিশ্বচরাচরকে সমৃদ্ধ করতে হবে তেমনি তাকে উন্নত থেকে উন্নততর পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে এ দুনিয়াতে অবস্থিত আল্লাহ্র সৃষ্ট জীবের খাদ্যের সংস্থান করতে হবে। আল্লাহর অপর প্রধান গুণ হচ্ছে তিনি মালিক—এ জন্য বিশ্বচরাচরের সকল কিছুতেই রয়েছে তাঁর একমাত্র অধিকার। এতে অপর কারো কোন নিরংকুশ মালিকানা থাকতে পারে না। এ গুণের ফলিত রূপ যখন মানব- জীবনে দেখা দেবে তখন মানুষ এ দুনিয়ার সম্পদকে কোন গোত্র, দল, জাতি বা রাষ্ট্রের মালিকানার অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করবে না। তাতে সকল মানুষের সমান অধিকার থাকবে। আল্লাহ্ হাকিম বা সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক—এ জন্য তিনি মানুষের মধ্যে যারা মানুষের সঙ্গে বা অপর কোন মানবেতর প্রাণীর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে অথবা তাদের উপর অত্যাচার করে তার বিচারও করবেন। সুতরাং যারা আল্লাহ্র এ গুণে গুণান্বিত হয়ে ইনসান-ই-কামিল হবে তাদের পক্ষে অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম করতে হবে। এ জন্য পূর্ণ বিকশিত মানবতাবাদীকে প্রয়োজনবোধে শয়তান বা অন্যায়-অমঙ্গলের সঙ্গে সংগ্রামেও লিপ্ত হতে হবে।

ইকবালের এ মানবতাবাদ সম্পূর্ণভাবেই কুরআন-ভিত্তিক। কুরআনের দার্শনিক তত্ত্বের আলোকে তিনি তার এ মানবতাবাদ বা ইনসানিয়াতকে প্রকাশ করেছেন। এ জন্য তাতে আল্লাহর বিভিন্ন গুণাবলীকে জীবনে রূপায়িত করার সঙ্গে সঙ্গে এ মানবতাবাদে প্রেমের সঙ্গে ন্যায়বিচারও মানবজীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে বাধ্য। এ তিনটে মানবতাবাদের তুলনামূলক আলোচনা করে দেখা যায়, এগুলোর প্রত্যেকটির মধ্যেই রয়েছে তাত্ত্বিক ধারণা। মানবজীবনকে সকল ধার্মিক ধারণা থেকে মুক্ত করে অথবা জাতি, বর্ণ, ভাষা ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত করে যদি এ উদার পৃথিবীর বুকে আগত এক বুদ্ধিপ্রধান জীব বলে ধারণা

করা যায় তা হলে তার চিন্তাধারাকে কোনও এক বিশেষ ধর্ম বা বিশেষ দার্শনিক মতবাদ দ্বারা কোনও বিশেষ খাতে প্রবাহিত করা অধীনতারই অপর নাম। সে তার জীবনের পক্ষে মঙ্গলজনক বা সুবিধাজনক যে কোন মতবাদও তার নিজস্ব চিন্তাধারা সৃষ্টি করতে পারে এবং তার আলোকে সে তার জীবনকেও পরিচালিত করতে পারে। এ জন্য তাকে চিন্তার বা মতবাদ গঠনের স্বাধীনতা দিতে হবে। এ স্বাধীনতা পেলে মানুষের পক্ষে একদিকে যেমন তার ধর্ম বা দার্শনিক মতবাদ গঠন করার সুযোগ দেখা দেবে—তেমনি মানুষ কর্তৃক মানুষের লাঞ্ছনা-গঞ্জনা, শোষণ ও শাসনের অবসান হবে। পূর্বোক্ত মানুষের দ্বারা সৃষ্ট কারণগুলো থেকেই জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি হয় এবং এ জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি হলে মানুষের মধ্যে হিংসা, বিদ্বেষ, মারামারি, হানাহানি দেখা দেয়। এ জন্য রিনেসাঁর অপর প্রবর্তক ইরেসমাস তাকে কোন দেশের অধিবাসী বলে স্বীকার করতে সম্মত ছিলেন না। তিনি গোটা পৃথিবীকেই তার দেশ বলে গণ্য করতেন। বাস্তবে কিন্তু দেখা যায় মানুষ যতই চেষ্টা করুক এ সকল কারণ মানুষের জীবনে পরিদৃষ্ট হয় এবং তার ফলে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদ বা ভাষা, বর্ণ, অর্থনৈতিক ও ভৌগোলিক কারণ সঞ্জাত জাতীয়তাবাদ মানবজীবনে দেখা দেয় এবং মানুষকে মানুষ থেকে পৃথক করে নেয়। তার ফলেই সে মানবতাবাদের উৎপত্তি হয়েছে পূর্বোক্ত কারণগুলোকে অপসারণ করে মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রেম ও মৈত্রীর সম্বন্ধ স্থাপন করার জন্য। বাস্তব জীবনে তার ফলে মানুষ চিন্তার স্বাধীনতা পেলো বটে, তবে তাদের মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্বের সৃষ্টি হল না। তাতে দেখা দিল শ্রেণীগত পার্থক্য। এক দল হয়ে দাঁড়ালো শোষক এবং অপর দল শোষিত। মানব-সমাজে সামন্ত শ্রেণী লোপ পেলো— সামন্ত প্রভুদের দাসত্ব থেকে মানুষ মুক্তি পেলো বটে—তবে তার স্থলে এসে দেখা দিলেন বুর্জোয়া প্রভুরদল। তাদের কাছে শ্রমিকরা দাসদের চেয়ে উন্নত আসন লাভ করে বটে, তবে শোষণের ক্ষেত্রে তারা দাসদের চেয়েও আরও নাজেহাল হয়ে পড়ে। এ দর্শনের পরিণতিতেই মানব-সমাজে দু'টো বিশ্ব যুদ্ধ দেখা দিয়ে মানব-সমাজকে কত না দুঃখ-কষ্টের মধ্যে ফেলেছিলো। রিনেসাঁর মনীষীদের মানসে নৈতিক মূল্যবোধ ছিল সীমায়িত। মানুষ কর্তৃক মানুষের স্বাধীনতাকে অস্বীকার করে কেবলমাত্র ধর্মের ও বুদ্ধির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ করে তারা সে আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন বলে মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ পরবর্তীকালে সম্ভবপর হয়েছিলো। খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী পুরোহিত শ্রেণী দ্বারা মানুষকে এভাবে বৌদ্ধিক শৃংখলে আবদ্ধ করা হলেও খৃষ্টধর্মে মানবতার প্রতি যে শ্রদ্ধা রয়েছে সে শ্রদ্ধাকে রিনেসাঁর নেতাগণের পক্ষে ত্যাগ করার কোন সঙ্গত কারণ ছিলোনা। এ জন্য রিনেসাঁর পরিণতিতে দেখা দিল এমন এক রাজনৈতিক মতবাদ যার ফলে মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতার নীতি স্বীকৃত হয়েও তার একশ্রেণীর পক্ষে অন্য শ্রেণীকে শোষণ করার দ্বার অবারিত রইলো। অপরদিকে প্রাচ্যদেশীয় যে মানবতাবাদের বর্ণনা দেয়া হয়েছে তার প্রেক্ষাপটে রয়েছে এক দার্শনিক বা ধর্মীয় তত্ত্ব। একই ব্রহ্মপ্রসূত বলে এ বিশ্বচরাচরের সকল বস্তুর মধ্যে রয়েছে প্রাণের সম্বন্ধ। কাজেই তাদের মধ্যে সর্বদাই প্রেম ও ভালোবাসার ঐক্য থাকা উচিত। এতে অতি উচ্চ এক নৈতিক মূল্যমান মানব-সমাজে প্রতিষ্ঠার জন্য প্রেরণা দান করা হয়েছে। এতে দ্বন্দ্ব-কোলাহলের কোন স্থান নেই। তবে একথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই, এ মানবতাবাদেও রয়েছে মানব-জাতির প্রাধান্যের স্বীকৃতি। যদিও উপনিষদে মানব শব্দের পরিবর্তে জীব শব্দই ব্যবহৃত হয়েছে তবুও জীবাত্মা বলতে মানবাত্মাকেই গ্রহণ করা হয়েছে। এ জীবাত্মা এ মায়াময়

সংসারে সর্বদাই নানাবিধ দ্বন্দ্বের মধ্যে অবস্থিত। প্রতি মুহূর্তে মানুষকে নানাবিধ শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহ করে টিকে থাকতে হয়। সংসার সমরাঙ্গনে টিকে থাকার জন্য মানুষকে অবিরাম প্রতিপক্ষের সঙ্গে সংঘর্ষ ও সংঘাতের মধ্যে লিপ্ত থাকতে হয়। এতে মানুষকে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে নানাভাবে আত্ম রক্ষার্থে তার শত্রু অপরাপর জীব বা ধ্বংসমুখী মানুষের সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত হতে হয়। এক্ষেত্রে তার পক্ষে বিশ্বচরাচরের সকল জীবের সঙ্গে প্রেমের সম্বন্ধে আবদ্ধ হওয়া সম্ভবপর নয়। এ জন্যে এ বিশ্বে মানুষকেই সৃষ্টির সেরা জীব গণ্য করে তাকে কুরআনের ভাষায় *আশরাফ-উল-মাখলুকাত* গণ্য করে তার সঙ্গে যে-সব প্রাণী মৈত্রী ভাবাপন্ন তাদের সঙ্গে প্রেমের সম্বন্ধ স্থাপন করা উচিত। মানুষের মধ্যে যারা মানব-জাতির ধ্বংস কামনায় নানাবিধ কাজ-কর্মে লিপ্ত তাদের কঠোর হস্তে দমন করা কর্তব্য। ইকবালের মানবতাবাদের মধ্যে তাই ইনসান-ই-কামিলের যে আদর্শ স্থান পেয়েছে সে ইনসান-ই-কামিল আল্লাহ্র গুণে গুণান্বিত হয়ে মানব-জাতিকে এ দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করতে এবং তাকে মানব -জাতির কল্যাণের, উন্নতির এবং ঊর্ধ্বে আরোহণ করার জন্য রয়েছে আবেদন।

প্রমাণপঞ্জী ঃ

১. *A History of Modern Philosophy – Fredick Meyr University of Redlands Califorina American Book Company. 1951 – p 14*

২. *Ibid–p 14-15*

৩. *Ibid–p 15-16*

৪. *Ibid–p 16*

৫. *Ibid–p 17*

৬. *Ibid–p 20*

৭. *A History of Philosophy – Frank Thilly Central Book Depot, Allahabad, 1973.–p 277-278*

৮. *Humanism in the East and the West – lecture delivered in the Dhaka University in 1922. Published by the University.*

৯. স্বামী বিবেকানন্দের সুপ্রসিদ্ধ উক্তি

১০ ইসলাম ও মানবতাবাদ ,প্রকাশক ইসলামিক ফাউণ্ডেশন ঃ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ

১১. পূর্বোক্ত অধ্যাপক সিলভাঁ লেভির উক্তি– *Humanism in the East and the West .*

১২. ইকবাল ঃ দেশে-বিদেশে—ইকবাল একাডেমি—ঢাকা-করাচী ১৩৭৪ বাং পৃঃ ২৫৭ ঢাকা হাই কোর্টের বিচারপতি আব্দুল মওদুদের উদ্বোধনী ভাষণ।

ইনসানে কামেল সম্পর্কে আল্লামা ইকবালের মতবাদ

ডঃ আবু সাঈদ নূরুদ্দীন

'ইনসানে কামেল' পূর্ণ মানব অর্থে ফারসী ও উর্দূ সাহিত্যে, *'আল-ইনসানুল কামেল'* আরবী সাহিত্যে এবং *'সুপার ম্যান'*—ফাওকুল বাশার বা অতিমানব ইংরেজী সাহিত্যে বহু ব্যবহৃত ও বহুল পরিচিত একটি দার্শনিক পরিভাষা। ইসলামী তাসাউফের ইতিহাসে এই পরিভাষাটি সর্বপ্রথম হিজরী সপ্তম শতাব্দীতে শেখ মুহীউদ্দীন ইবনে আরবী (রঃ) (মৃত্যু ৬৩৮ হিঃ ১২৪০) তাসাউফ শাস্ত্রের তাঁর প্রসিদ্ধ আরবী গ্রন্থ *'ফুসুসুল হিকাম'*-এ প্রয়োগ করেন। পরবর্তী পর্যায়ে হিজরী নবম শতাব্দীতে আব্দুল করীম আশজিলী (রঃ) (মৃত্যু ৮৩২ হিঃ / ১৯২৯) এই বিষয়ের উপর বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন ও 'আল-ইনসানুল কামেল' নামে আরবীতে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। অনেক পরে প্রখ্যাত জার্মান দার্শনিক নীচে *[Neitzsche]* —মৃত্যু (১৩১৮ হিঃ / ১৯০০ খৃঃ) সুপারম্যান বা অতিমানব-এর দর্শন পেশ করেন, যা আরবী ভাষায় 'ফাওকুল বাশার' নামে আখ্যায়িত হয়।

আল্লামা ইকবাল তাঁর কবিতায় সাধারণতঃ *'ইনসানে কামেল'*-এর জন্য বিভিন্ন পরিভাষা ব্যবহার করেন। যথা *'মরদে মুমেন'*, *'মরদে মুসলমান'*, *'মরদে খোদা'*, *'মরদে হক'*, *'মরদে হুর'*, *'মরদে আযাদ'*, *'মূমেন'*, *মূমেনে জাঁবায'*, *মরদে কামেল'*, *'কলন্দর'*, ও *'ফকীর'* ইত্যাদি। এ সবের অর্থ তাঁর কাছে একই অর্থাৎ *'ইনসানে কামেল'*। এজন্য এ প্রবন্ধের শিরোনাম পরিপূর্ণ অর্থে 'ইনসানে কামেল' দেয়া হলো।

'ইনসানে কামেল' প্রকৃতপক্ষে একটি সুফী মতবাদ যা *'ম্যাটাফিজিক্স'*-এর বিষয়বস্তু ও মানবজীবনের সর্বোচ্চ পর্যায়ের মূল্যবোধসম্বলিত এবং যার ভিত্তি হলো *'ওয়াহদাতুল ওজুদ'* বা সর্বেশ্বরবাদ। মুসলিম সুফী সাধকদের বিশ্বাস ঃ মানবাত্মা *'রব্বানী'* বা ঐশ্বরিক। মানব এই কাদা-মাটির পৃথিবী থেকেই অবিরাম সাধনা ও অনুশীলন যোগে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর সত্তায় বিলীন হতে ও একাত্মতা বোধ করতে পারে। অথবা সুফীবাদের ভাষায় ঃ মুজাহিদার বদৌলতে মুকাশিফায় অর্থাৎ সাধনা বলে খোদা দর্শন পর্যায়ে পৌঁছানো যায়। ঐ পর্যায়ে পৌঁছে মানব ইনসানে কামেল বা পূর্ণ মানব / মহামানব-এর আসন লাভ করতে সক্ষম হয়। সে তখন পৃথিবীতে খোদার প্রতিনিধিত্ব লাভ করে পৃথিবীর মুহাফেজ বা রক্ষণাবেক্ষণের সুমহান দায়িত্বভার গ্রহণ করতে পারে। তার বিদ্যমানে ধরাবক্ষে খোদার অশেষ রহমত অবতীর্ণ হয়। এ কারণেই তাকে সুফী ভাষায় পৃথিবীর কুতুবও বলা হয়।

এই সুফী মতবাদের ভিত্তি হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতেই স্থাপিত হয়। হযরত বায়যিদ বুস্তামী (রঃ) ও মনসুর হাল্লাজ (রঃ) যথাক্রমে *'সুবহানী মা' আযমু শানী'*— আমার পবিত্রতা— আমার মর্যাদা কত মহান, এবং *'আনাল হক'* আমিই সত্য—বাক্য দু'টি উচ্চারণ করে এ কথার প্রমাণ পেশ করে দিয়েছিলেন যে, মানবও আধ্যাত্মিকভাবে উন্নতি সাধন করে এবং

আল্লাহর সত্তাতে বিলীন ও একাত্মতা অর্জন করে পরিণামে এমন পর্যায়ে পৌঁছতে পারে যেখানে তার সন্তুষ্টি ও আল্লাহর সন্তুষ্টি এক হয়ে যায়।

কোন এক সুফী সাধকের উদ্ধৃতিঃ *'লাও লাকা লামা খালাকতুল আফলাকা'*— যদি হে রাসূল! আপনার আগমন না ঘটতো, আমি নভোমণ্ডলের কিছুই সৃষ্টি করতাম না— যা লোকমুখে হাদীসে কুদসী নামে প্রচলিত এবং রাসূলে আকরামের বাণীঃ *'আউয়ালু মা খালাকাল্লাহু নূরী'* — আল্লাহ পাক সর্বাগ্রে যা সৃষ্টি করেছেন, তা হলো আমার নূর বা জ্যোতি। -এর মর্মানুযায়ী ইবনে আরবীর কাছে বিশ্ব সৃষ্টির মূল কারণ হলো হাকীকতে মুহাম্মাদীয়া বা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বাস্তবতা। ভাগ্যলিপিতে পৃথিবীতে তাঁর শুভাগমনের কথা লিপিবদ্ধ না থাকলে অন্য কোন বস্তুরই সৃষ্টি হতো না। যেমনভাবে মানবজাতি সমস্ত সৃষ্টিকুলের সেরা ও সবচেয়ে সম্মানিত— *'ওয়ালাকাদ কাররামনা বানী আদামা'* — এবং নিশ্চয়ই আমি আদম বংশকে সম্মানিত করেছি (আল-কুরআন—১৭:৭০)। তেমনি রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সমস্ত মানবকুলের সেরা ও সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বতোভাবে পূর্ণ। অন্যান্য লোক এ সম্মান তাঁরই মাধ্যমে এবং ফয়েজ ও বরকতে লাভ করে।

বস্তুত *'ইনসানে কামেল'* ঐ হাকীকতে মুহাম্মাদীয়ারই বহিঃপ্রকাশ। সে সমগ্র বিশ্বের এমন একটি বাস্তব সত্য, যার অস্তিত্বে আল্লাহ তা'য়ালার পবিত্র গুণাবলীর প্রতিফলন ঘটে। হাকীকতে মুহাম্মাদীয়া যেমন বিশ্ব সৃষ্টির আসল রহস্য, তেমনি ইনসানে কামেলও মানব সৃষ্টির মূল কারণ। এক হাদীসে কুদসীতে এসেছেঃ *'আমি গুপ্ত ধন ছিলাম, তৎপর আমি পরিচিত হতে চেয়েছি এবং তাই এসব সৃষ্টির অবতারণা।'* ইবনে আরবী বলেনঃ যেহেতু সত্যিকার অর্থে কেবলমাত্র ইনসানে কামেলই আল্লাহ পাককে চিনে ও ভালোবাসে, সেহেতু সে-ই আসলে মানব সৃষ্টির মূল কারণ।

সুফী সাধকদের ন্যায় আল্লামা ইকবালও বিশ্ব সমক্ষে *'ইনসানে কামেল'*-এর সুফী মতবাদ তুলে ধরেন। কিন্তু যেহেতু তিনি ওয়াহ্দাতুল ওজুদ বা সর্বেশ্বরবাদ দর্শনের তীব্র বিরোধিতা করেছেন এবং তৎপরিবর্তে খুদীর গতিশীল জীবনদর্শন পেশ করেছেন, সেহেতু ইনসানে কামেল-এর মতবাদের বেলায়ও তিনি উক্ত প্রাচীন মতবাদ এড়িয়ে গিয়ে ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। অন্য কথায়ঃ *'ইনসানে কামেল'* সম্পর্কে তাঁর মতবাদের ভিত্তি সর্বেশ্বরবাদ-এর পরিবর্তে খুদীর জীবন-দর্শন।

অন্যান্য প্রসিদ্ধ সুফীগণ যেমন ওয়াহ্দাতুল ওজুদ বা সর্বেশ্বরবাদ-এর ভিত্তিতে মানবের আল্লাহ তা'য়ালার সত্তায় বিলীন ও একাত্মতা সাধনের মাধ্যমে ইনসানে কামেলের মতবাদ পেশ করেছেন, সেখানে আল্লামা ইকবাল মানব সত্তাকে আল্লাহ তা'য়ালার সত্তা থেকে পৃথক রেখে এবং প্রেম ও ভালোবাসার উপাদান দিয়ে শক্তিশালী করে ও *তাখাল্লাকু বে-আখলাকিল্লাহ*—আল্লাহ পাকের পবিত্র গুণাবলীর দ্বারা গুণান্বিত হও— অনুসারে আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভের শিক্ষা প্রদান করেন এবং মানব খুদীকে একটি বিশেষ পদ্ধতিতে

প্রশিক্ষণ দিয়ে ইনসানে কামেল-এর মতবাদ পেশ করেন। এ প্রসঙ্গে যদিও উভয়ের গন্তব্যস্থল একই, কিন্তু উক্ত গন্তব্যস্থলে পৌঁছার পথ ভিন্ন ভিন্ন। সুফী-সাধকগণ স্বীয় সত্তাকে আল্লাহ তা'য়ালার সত্তায় বিলীন করে উক্ত স্থলে পৌঁছেন। আল্লামা ইকবাল স্বীয় সত্তাকে আল্লাহ তা'য়ালার সত্তা থেকে পৃথক রেখে একই স্থলে পৌঁছার মত অবলম্বন করেন।

যেহেতু ইনসানে কামেল সম্পর্কে আল্লামা ইকবালের মতবাদ-এর ভিত্তি সর্বতোভাবে খুদীর জীবন-দর্শন, সেহেতু এটা বলা প্রয়োজন যে ইনসানে কামেল পর্যন্ত তাঁর আধ্যাত্মিক উন্নতির পন্থা কি। তিনি এ বিষয়টি তাঁর ফার্সী কাব্যগ্রন্থ *'আসরারে খুদী'* তে সুচারুরূপে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর কাছে খুদীর আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণের তিনটি পর্যায় রয়েছে, যা নিম্নরূপ ঃ

১. প্রথম পর্যায় হলো *'এতায়াত'* বা আনুগত্য। আনুগত্যের অর্থ আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর রাসূল (সঃ) ও আল্লাহ তা'য়ালার যাবতীয় আদেশ নির্দেশাবলী পালন করা। খুদীর প্রশিক্ষণে আনুগত্য ও অনুসরণের গুরুত্ব অপরিসীম। আনুগত্য ব্যতিরেকে মানুষ কোন অবস্থাতেই আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করতে পারেনা। এ জন্যই আল্লামা ইকবাল আনুগত্যকে খুদীর প্রশিক্ষণের সর্বপ্রথম পর্যায় নির্ধারণ করেছেন। আনুগত্যের সঠিক প্রতীকস্বরূপ তিনি জন্তুকুলের মধ্য থেকে উষ্ট্রের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন। উক্ত জন্তুটি তার সহজাত স্বভাবের কারণে প্রভুর একান্ত বাধ্য, অনুগত, আদেশ পালনকারী ও পরিশ্রমী হয়। উষ্ট্রচালক তাকে যেদিকে যেতে নির্দেশ করে বিনা দ্বিধায় সে তা ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে পালন করে। মানুষেরও উচিত, এ ভাবেই যেন সে আল্লাহ তা'য়ালা, তাঁর রাসূল (সঃ) ও আল্লাহ তা'য়ালার যাবতীয় আদেশ-নির্দেশাবলী অনুসরণ ও পালন করে। কেননা আনুগত্য, বশ্যতা ও আদেশ-নিষেধ পালনের মাধ্যমেই সে ইনসানে কামেল-এর পর্যায়ে পৌঁছতে পারে, অন্যথায় নয়। যথা তিনি বলেছেন ঃ

তুমিও তেমনি কর্তব্যাদি পালন থেকে বিরত থেকো না
তার কাছ থেকে পরিণামে পাবে তুমি উত্তম প্রতিদান
আনুগত্য স্বীকার করায় সচেষ্ট হও হে কর্তব্যবিমূঢ়
বাধ্যবাধকতা থেকেই উচ্চারণ হয় ইচ্ছাশক্তির স্বাধীনতা

আর এ জন্যই তিনি এভাবে মুহাম্মাদী শরীয়ত বা বিধি-নিষেধ পালনের জন্য তাকিদ করেনঃ

বিধি-নিষেধ মেনে চলায় রয়েছে যে যাতনা তার জন্য অভিযোগ করো না
মুস্তাফা কর্তৃক চিহ্নিত সীমানাসমূহ কখনো অতিক্রম করো না।

২. দ্বিতীয় পর্যায় হলো *'যব্‌তে নাফস'* বা নিম্ন প্রবৃত্তি দমনের মাধ্যমে আত্মসংযম। এ প্রসঙ্গে তিনি ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের পালনকে অত্যাবশ্যকীয় ঘোষণা করে সেগুলোর উদ্দেশ্যাবলী ও লাভসমূহ বর্ণনা করেন। ইসলামের স্তম্ভসমূহ হলো ঃ ১. কালেমায়ে তাওহীদ ২. নামায ৩. রোযা ৪. হজ্জ ৫. যাকাত।

আত্মসংযম-এর প্রথম স্তম্ভ হলো কালেমায়ে তাওহীদ। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ এর উপর পূর্ণ

বিশ্বাস স্থাপন না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার আত্মা ভীতও সন্ত্রস্ত থাকে। কিন্তু যে ব্যক্তি কালেমায়ে তাওহীদের উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে, তার আত্মা যাবতীয় প্ররোচনা ও প্রলোভন থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে। ঐ অবস্থায় সে শুধু আল্লাহ্ তা'য়ালাকেই সৃষ্টিকর্তা ও প্রভু বলে জ্ঞান করে আর অন্তরে তারই ভয় রাখে। যথা– আল্লামা ইকবাল বলেন ঃ

যতক্ষণ 'লা ইলাহার' যষ্টি তুমি হস্তে ধারণ করবে
যাবতীয় ভয়ের ইন্দ্রজাল ভাঙতে তুমি সক্ষম হবে
তার বুকে ভয় ঢুকার কোন পথ নাই
তার অন্তর আল্লাহ বিনা আর কারো দ্বারা ভীত নয়

অন্য এক উর্দূ কবিতায় বলেছেন ঃ

তুমিই থাকবে বিশ্বে অনুপম ও অদ্বিতীয়
যদি তোমার অন্তরে নেমে যায় 'লা শারীকা লাহূ'

মানুষের স্বভাবেই নিজ আত্মীয়-স্বজন ও স্ত্রী-পুত্রের প্রতি অনুরাগ ও ভালোবাসা থাকে, আর কোন কোন সময় ঐ অনুরাগ ও ভালোবাসা এত গভীর হয় যে, সে শরীয়তের অবশ্য-করণীয় কাজগুলো পর্যন্ত পালন করতে ভুলে যায়। কিন্তু কালেমায়ে তাওহীদের উপর যে ব্যক্তি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে সে আত্মীয়-স্বজন ও স্ত্রী-পুত্রের ভালোবাসার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যায়। যথা— তিনি বলেছেন ঃ

যে ব্যক্তি 'লা'-এর জগতে বসতি স্থাপন করলো
সে স্ত্রী-পুত্রের বন্ধন থেকে যেন মুক্তি লাভ করলো
যে অন্য সবকিছু থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়
সন্তানের গলায় নির্দ্বিধায় চালিয়ে দেয় ছুরি

আত্মসংযমের দ্বিতীয় স্তম্ভ হলো নামায। আল-কুরআনে এসেছেঃ "নিশ্চয় নামায অশ্লীলতা ও অপকৃষ্টতা হতে নিরোধ করে থাকে (২৯ ঃ ৪৬)।" এই আয়াত অনুযায়ী আত্মসংযমের জন্য নামায অতি প্রয়োজনীয় রুকন। কেননা, মানুষের নিম্ন প্রবৃত্তি সর্বদা মন্দ কাজের প্রতি আদেশ করে— আননাফ্সু আম্মারাতুম বিসসুয়ে— এবং নামায তা করা থেকে বিরত রাখে। তা ছাড়া নামাযের ফজীলত দ্বারা সমস্ত অপকৃষ্টতা রহিত হয়ে যায়। নামাযের এ ফজীলতের কারণেই একে হজ্জে আসগর বা ছোট হজ্জও বলা হয়ে থাকে। যথা– আল্লামা ইকবাল বলেন ঃ

লা ইলাহা হলো ঝিনুকবিশেষ, নামায মুক্তো
মুসলিমের অন্তরের জন্য নামায হলো হজ্জে আসগর
মুসলিমের হস্তে তা হয়েছে খড়গের ন্যায়
অশ্লীলতা, বিদ্রোহ ও অপকৃষ্টতা ধ্বংসকারী

আত্মসংযমের তৃতীয় স্তম্ভ হলো রোযা। রোযা রাখায় স্বাভাবিকভাবেই দেহে দুর্বলতা আসে

এবং তা নিষিদ্ধ ও শরীয়ত-বিরুদ্ধ ইচ্ছাসমুহ থেকে বাঁচার জন্য সহায়ক হয়। আল্লামা ইকবাল বলেন ঃ

রোযা ক্ষুধা-পিপাসার উপর নিদারুণভাবে আঘাত হানে
বিরাট দেহের প্রতিপালনকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়

আত্মসংযমের চতুর্থ স্তম্ভ হলো হজ্জ। দেশপ্রেম ও দেশভক্তি আত্মার একটি বিশেষ আকাঙ্ক্ষার মধ্যে পরিগণিত। এটা বর্জন করার একমাত্র উপায় হলো হজ্জ। হজ্জ মুসলমানদেরকে স্বদেশ ত্যাগের শিক্ষা প্রদান করে। দেশপ্রেম ও দেশভক্তি সাধারণত খারাপ নয়। ইসালম শুধু মাত্রাতিরিক্ত প্রেম ও অতিভক্তি অনুমোদন করে না। ইসলামে হিজরত প্রথার এ জন্যই প্রচলন হয়েছে। তদুপরি হজ্জ এমন একটি অবশ্য-করণীয় কাজ যার বদৌলতে একটি বিশেষ কেন্দ্রে ও বিশেষ সময়ে বিশ্বের মুসলমানগণ একবার একত্রিত হবার সুযোগ লাভ করে। আল্লামা ইকবাল এ প্রসঙ্গে বলেন ঃ

মুমেনদের জন্য আত্ম প্রশান্তি লাভ করার উপায় হলো হজ্জ
স্বদেশ ত্যাগ শিক্ষা দানকারী ও দেশভক্তি বর্জনকারী হজ্জ
এমন একটি আনুগত্য, যা সমগ্র উম্মার জন্য পুঁজিস্বরূপ
এবং একটি মিল্লাতের বিচ্ছিন্ন পাতাসমূহের বাঁধনস্বরূপ

আত্মসংযমের পঞ্চম স্তম্ভ হলো যাকাত। ধন-সম্পদের আসক্তি ও ভালোবাসা আত্মিক ইচ্ছাসমূহের একটি চালিকাশক্তি। এ প্রসঙ্গে যাকাত হলো আত্ম-সংযমের একমাত্র উপায়। তা ছাড়া যাকাত দ্বারা ভ্রাতৃত্ববোধ ও সাম্যের ভাব জন্ম নেয় এবং ধন-সম্পদে বরকতের কারণ হয়। আল্লামা ইকবাল বলেন ঃ

ধন-সম্পদের ভালোবাসাকে ধ্বংস করে যাকাত
এবং সাম্যের সাথে পরিচয় দান করে যাকাত
কুরআনের বাণী "হাত্তা তুনফেকু" দ্বারা আত্মা শক্তিশালী হয়
সম্পদ বৃদ্ধি করে ও সম্পদের ভালোবাসা হ্রাস করে

মোটকথা, এগুলোই হলো ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভ, যেগুলোর উপর আমল করে মানুষ আত্মসংযমের দ্বিতীয় পর্যায় অতিক্রম করতে পারে। এখানে উল্লেখযোগ্য, ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের আলোচনা মূলত অনেক ব্যাপক। এখানে শুধু আল্লামা ইকবালের মতবাদকে পেশ করার জন্য অতি সংক্ষিপ্তভাবে আলোকপাত করা হলো। যা হোক, আল্লামা ইকবাল বলেনঃ

এ সবই হলো তোমার শক্তি সঞ্চয়ের অবলম্বনসমূহ
তুমি অত্যন্ত পাকা-পোখত, যদি তোমার ইসলাম হয় মজবুত।

৩. তৃতীয় এবং শেষ পর্যায় হলো *নিয়াবতে এলাহী* বা আল্লাহ তা'য়ালার প্রতিনিধিত্ব। এ পর্যায়ে পৌঁছার পর মানব পৃথিবীর বুকে আল্লাহ তা'য়ালার প্রতিনিধি হবার যোগ্যতা অর্জন করে, এবং কুরআনের ঐ বাণীর, যাতে বলা হয়েছেঃ "*আমি নিশ্চয় পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি*

করবো (২ : ৩০)" সঠিক সত্যতা উপলব্ধি করতে পারে। যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'য়ালার প্রতিনিধিত্ব ও পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি হবার যোগ্যতা অর্জন করে, সে-ই হলো *'ইনসানে কামেল'*। ইনসানে কামেলের মর্যাদা অনেক উঁচু এবং মানবজীবনের আধ্যাত্মিক উন্নতির সারমর্ম ও চরম পর্যায়। জীবন বা খুদী দীর্ঘকাল যাবত দ্বারে দ্বারে কেঁদে বেড়ায়, তবেই একজন *'ইনসানে কামেল'* জন্ম নেয়। যথা– আল্লামা ইকবাল বলেন ঃ

বহুকাল যাবত কা'বা ও বুতখানায় কেঁদে বেড়ায় জীবন
তবেই না প্রেম-বাগ থেকে বেরিয়ে আসে কোন তত্ত্বজ্ঞানী

এই তত্ত্বজ্ঞানীর আবির্ভাব ইতিপূর্বেই হাকীকতে মুহাম্মাদীয়ারূপে হয়ে গেছে। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামই প্রকৃতপক্ষে ঐ তত্ত্বজ্ঞানী ও ইনসানে কামেল। জীবনের স্ফুলিঙ্গসমূহ শত শত ইব্রাহীমকে দগ্ধ করেছে, তবেই না এক মুহাম্মাদের প্রদীপ প্রজ্বলিত হয়েছে। কিন্তু যেহেতু তিনি *খাতেমুল আম্বিয়া*– সব নবীদের সর্বশেষ নবী এবং তাঁর পর পৃথিবীতে আর কোন নবীর আগমন ঘটবে না। সেহেতু আল্লামা ইকবালও অন্যান্য সুফী-সাধকদের ন্যায় অন্য এক ইনসানে কামেল-এর পক্ষপাতি। এ প্রসঙ্গে তিনি ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত প্রাচ্যবিশারদ প্রফেসর আর. এ. নিকলসনকে এক দীর্ঘ পত্রে(যা *'আসরারে খুদী'র* ইংরেজী অনুবাদ *"সিকরেটস অব সেলফ"*-এর ভূমিকায় শামিল আছে) লিখেছিলেন ঃ

"ইনসানে কামেল ব্যতিরেকে পৃথিবীতে শান্তি-শৃংখলা সৃষ্টি হতে পারে না। লীগ ও পঞ্চায়েতসমূহ এই উদ্দেশ্যে মোটেও যথেষ্ট নয়। আগত দিনগুলোতে এসব লীগ ও পঞ্চায়েতসমূহ রীতিমত অকৃতকার্য হচ্ছে।"

আল্লামা ইকবালের মতে 'ইনসানে কামেল-এর আবির্ভাবের পূর্বে মানবতার জন্য দৈহিক ও আধ্যাত্মিকভাবে উন্নতির সোপানগুলো অতিক্রম করা পূর্ব-শর্ত। *'ইনসানে কামেল'*আমাদের জন্য এখনো একটি লক্ষ্যবস্তু মাত্র।

সমকালীন বিশ্বে দৃশ্যতঃ তার কোথাও কোন অস্তিত্ব নেই। তবে, মানবজাতির বিবর্তন ও ক্রমোন্নতির দ্বারা এটা বুঝা যায় যে, ভবিষ্যতে এমন এক উন্নত জাতির উদ্‌ভব হবে, যার সদস্যবর্গ কম-বেশী এত পূর্ণতাপ্রাপ্ত হবে যে, ঐ প্রতীক্ষিত *'ইনসানে কামেল'* তাদের মধ্য থেকেই জন্ম নেবে। এ কারণেই তিনি 'ইনসানে কামেল'-এর আবির্ভাবের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল চিত্তে আশা ব্যক্ত করছেন ঃ

ওহে কালের ঘোড়ার উপর আরোহণকারী, তুমি আস
ওহে সম্ভাবনার চক্ষুর উজ্জ্বলতা, তুমি আস
তুমি সৃষ্টির কোলাহলের শোভা প্রতীয়মান হও
তুমি চক্ষুসমূহের পুতুলিতে বসতি স্থাপন কর
জাতিসমূহের ঝগড়া-ফাসাদকে শান্ত কর

ইনসানে কামেল সম্পর্কে আল্লামা ইকবালের মতবাদ

তোমার রাগিনীকে স্বর্গীয় আনন্দে ভরপুর করে তোল
আবার বিশ্বে আনয়ন কর শান্তির দিন-ক্ষণ
যুদ্ধবাজদেরকে দাও আবার শান্তির পয়গাম

আল-কুরআনে এসেছে ঃ *"নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলই উত্তম আদর্শ* (৩৩:২১)।" এই আয়াত অনুসারে মানুষ রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বরকতময় ব্যক্তিত্বকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে *'ইনসানে কামেল'* হওয়ার জন্য সচেষ্ট হতে পারে। আল্লামা ইকবালের দৃঢ় বিশ্বাস, মানুষের মধ্যে আল্লাহ তা'য়ালার প্রতিনিধি হবার যথেষ্ট যোগ্যতা বিদ্যমান আছে। এই উক্তির স্পষ্ট দলীল হলো আল্লাহ পাকের বাণী,(যার উদ্ধৃতি পূর্বেও দেয়া হয়েছে ঃ)"*আমি নিশ্চয় পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করবো* (২:৩০)।"

'ইনসানে কামেল' পৃথিবীতে আল্লাহ তা'য়ালার সত্যিকারের প্রতিনিধি হবে। সে তার স্বীয় স্বভাব ভাণ্ডার থেকে অন্যান্যদেরকে জীবন-ধন প্রদান করবে। মানুষ বিবর্তন ও ক্রমোন্নতির সিঁড়ি বেয়ে যে পরিমাণে অগ্রসর হতে থাকবে, সে পরিমাণেই সে পূর্ণতার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হতে থাকবে।

'ইনসানে কামেল' সবচেয়ে পূর্ণ খুদীর অভিব্যক্তি। মানবতার বিবর্তন ও ক্রমোন্নতিতে যত প্রকার ক্লেশ ও যাতনার সম্মুখীন হতে হয়, তা শুধু ঐ একটি লক্ষ্যবস্তু অর্জনের জন্যই সম্ভব হয়। *'ইনসানে কামেল'* বস্তুত,(যা পূর্বেও বলা হয়েছে) মানুষের দৈহিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির চরম সোপান বা পর্যায় হবে। সে পর্যায়ে পৌঁছার পর জীবনের যাবতীয় পরস্পর বিরোধী শক্তিগুলো একই সুর ধারণ করবে এবং তার মধ্যে শক্তি ও জ্ঞান উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে বিদ্যমান থাকবে। *'ইনসানে কামেল'* সমগ্র বিশ্বের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করবে। আল্লামা ইকবালের ভাষায় ঃ

মুমেনের পরিচয় হলো দিগন্তসমূহ তার মাঝে হয়ে যায় বিলীন

মাওলানা জালালউদ্দীন রুমী তাঁর বিশ্ব বিখ্যাত ফারসী মহাকাব্য *'মাসনবী'তে* রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শৈশবকালের একটি ঘটনাকে অত্যন্ত মনোরমভাবে বর্ণনা করে প্রমাণ করেছেন যে, *'ইনসানে কামেল'* বিশ্বমাঝে হারাতে পারে না, বরং বিশ্বই তার মাঝে হারিয়ে যায়। রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দুগ্ধমাতা হালিমা সা'দিয়া (রাঃ) একদিন তাঁর শৈশবকালে তাঁকে সঙ্গে করে কাছের এক মরুপ্রান্তরে বেড়াতে গিয়েছিলেন। হঠাৎ তিনি হারিয়ে যান। বিবি হালিমা তাঁকে দেখতে না পেয়ে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে যান। স্বভাবতই তিনি তাঁর অন্বেষণে এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করতে লাগলেন। তখন গায়েব হতে এ সান্ত্বনাদায়ক ডাক আসলো ঃ

তুমি ভেবো না, তিনি তোমা থেকে হারাতে পারে না
বরং মহাবিশ্বই তাঁর মাঝে হারিয়ে যাবে

আল্লামা ইকবাল বলেন, আমি *'ইনসালে কামেল'* সম্পর্কে এর চেয়েও অধিকতর জোর দিয়ে

বলি ঃ

তাঁর সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি এক হয়ে যায়
এ কথা মানুষের বিশ্বাসে কি করে আসবে ?

আল্লামা ইকবালের মতে *'ইনসানে কামেল'* -এর মধ্যে এমন প্রচণ্ড শক্তি নিহিত রয়েছে যে, সে কেবল এ বিশ্বভ্রহ্মাণ্ডকেই গ্রাস করেনা, বরং স্বয়ং আল্লাহ তা'য়ালাকেও নিজের মধ্যে টেনে নেয়ার ক্ষমতা রাখে। তখন তাঁর ইচ্ছা আর আল্লাহর ইচ্ছা এক ইচ্ছায় পরিণত হয়। তাঁর ইচ্ছা বা কামনাকে আল্লাহ অগ্রাহ্য করতে পারেন না। এ অর্থেই আল্লামা ইকবাল অত্যন্ত জলদগম্ভীর কণ্ঠে বলেছেন ঃ

"তোমার খুদীকে এত উঁচু স্তরে নিয়ে যাও যেন প্রত্যেক তকদীর লেখার পূর্বে
খোদা স্বয়ং বান্দার কাছে জিজ্ঞাসা করেন, বল কিসে তোমার সন্তুষ্টি।"

এজন্যই তিনি অন্যত্র আরো বলেছেন ঃ

তুমি মুসলমান, মনকে একই জগতের সাথে বেঁধে রেখো না
'কেমন ও কত' প্রশ্নসমূহের আবর্তে নিজকে হারিয়ে ফেলো না
মুসলিমের কভু ভূ-সীমার মাঝে সংকুলান হয় না
ওর হৃদয়ে হারিয়ে যায় শাম ও রোম দেশসমূহ
হৃদয়কে বশীভূত কর, কেননা হৃদয়ের পরিধিতে
হারিয়ে যায় এসব মাটি ও পানির আঙ্গিনাসমূহ

'ইনসানে কামেল' -এর সর্বব্যাপী প্রকৃতির উপর আল্লামা ইকবাল 'মুর্দে মুসলমান' শিরোনামে তাঁর উর্দু কাব্যগ্রন্থ 'যরবে কলীম-'এ অতি জোরালো ভাষায় একটি কবিতা রচনা করেছেন, যার বঙ্গানুবাদ নিম্নে দেয়া হলো ঃ

প্রতিনিয়ত মু'মেনের নতুন যশ ও নতুন আত্মাভিমান
কথায়, কাজে হয় সে আল্লাহর স্পষ্ট প্রমাণ !
দুর্নিবারিতা ও ক্ষমাশীলতা ও পবিত্রতা ও শক্তিশালিতা
এ চারটি স্বর্গীয় গুণ যদি থাকে তবে হয় সত্যিকারের মুসলমান !
অতি বিশ্বস্ত ফেরেশতা জিব্রীলের পড়সী মাটির মানুষ
ওর আস্তানা বুখারাতেও নয় সমরকন্দেও নয় !
এ রহস্য কেউ জ্ঞাত নয় যে সত্যিকারের মু'মেন
বাহ্যতঃ কারী পরিদৃষ্ট হয়, আসলে সে কুরআন !
সর্বশক্তিমান আল্লাহর উদ্দেশ্যাবলীর মাপকাঠি ওর ইচ্ছাসমূহ
পৃথিবীতেও সে মানদণ্ড কিয়ামতেও সে মানদণ্ড !
যদ্বারা লালা ফুলের শান্তি আসে ঐ শিশির !

ইনসানে কামেল সম্পর্কে আল্লামা ইকবালের মতবাদ

সাগরের বক্ষ দ্বারা কম্পিত হয় সেই তুফান
প্রকৃতির সার্বক্ষণিক গান তার দিবা রজনী
সুরে অনন্য যথা পবিত্র কুরআনের সুরায়ে আররাহমান !

'ইনসানে কামেল' সম্পর্কে আল্লামা ইকবাল-এর ভাবধারায় কিছু পরস্পরবিরোধী মত পাওয়া যায়। একদিকে তিনি মত পোষণ করেন যে, *'ইনসানে কামেল'* আমাদের জন্য এখনো একটি লক্ষ্যবস্তু মাত্র। সমকালীন বিশ্বে দৃশ্যত তার কোন অস্তিত্ব নেই। অন্যদিকে, তাঁকে এ কথার সত্যতা স্বীকার করতে দেখা যায় যে, প্রতি যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে *'গাওস, কুতুব'* ও *'আউলিয়া'* রূপে *'ইনসানে কামেল'* -এর অস্তিত্ব পাওয়া যায়। যথা– তিনি বলেনঃ *"প্রত্যেক খাঁটি মুমেনই 'ফওকুল বাশার' অর্থাৎ ইনসানে কামেল'*, এবং ইনসান ঐ সর্বোত্তম ছবি, যাতে *'ফওকুল বাশার'* রূপ পরিগ্রহ করে।" (মলফুযাতে ইকবাল পৃঃ ১৭৬) তাঁর মতেঃ *"ইনসানে কামেল"* -এর প্রতি যুগে প্রয়োজন অনুযায়ী আবির্ভাব ঘটে। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বেলায়েত বা অধিকারপ্রাপ্ত হয়ে আত্মপ্রকাশ করেন এবং মানুষকে সৎপথ প্রদর্শন করেন ও আল্লাহ তা'য়ালার মা'রেফত সম্বন্ধে শিক্ষা প্রদান করেন আর কেউ কেউ আত্মগোপন করেই সৎ পথ প্রদর্শনের স্বীয় দায়িত্ব পালন করে থাকেন। তাঁদের পদমর্যাদাও বিভিন্ন স্তরের হয়।

আমার মতে, আল্লামা ইকবালের প্রথমোক্ত অভিমতটি তাঁর মানসিক ক্রমবিকাশের গোড়ার দিকের কথা এবং তা একটি দার্শনিক মতবাদ হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে, যার বস্তুগত অবস্থার সাথে পুরোপুরি মিল নাও থাকতে পারে। অন্য মতটি অবশ্য আমরা সঠিক বলে ধরে নিতে পারি। তার বাস্তব অবস্থার সাথে মিল রয়েছে। কেননা, সমকালীন বিশ্বে ওলী, আবদাল, গাওস ও কুতুব রয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, *'ইনসানে কামেল'* -এর উপর আল্লামা ইকবালের গবেষণা ও চিন্তা-ভাবনা অনেক দিনের। তিনি প্রফেসর নিকলসনের নামে প্রেরিত পত্রে,(যার উল্লেখ ইতিপূর্বেও করা হয়েছে) লিখেছেন যে, *'ইনসানে কামেল'* -এর উপর তিনি একটি দীর্ঘ ইংরেজী প্রবন্ধ রচনা করেন *'আসরারে খুদী'* প্রকাশিত হবারও প্রায় বিশ বছর পূর্বে, যা 'ইণ্ডিয়ান এ্যান্টি কিউরী' নামক একটি পত্রিকায় ছাপা হয় এবং যা তিনি পরবর্তীতে তাঁর গবেষণামূলক 'দী ডেভেলপমেণ্ট ম্যাটাফিজিক্স ইন ফারসীয়া'য় একটি পৃথক অধ্যায় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করেন। তাঁর কাব্যজীবনের পরবর্তী পর্যায়ে আরো পরিপক্কতা লাভ করলে আমরা তাঁকে প্রথমোক্ত অভিমতের উপর অটল থাকতে দেখি না, বরং তাঁর উর্দূ ও ফারসী কাব্য-গ্রন্থ সমূহে দ্বিতীয় মতটিরই অধিক সমর্থন পাওয়া যায়।

আল্লামা ডক্টর মুহাম্মদ ইকবাল

আব্বাস আলী খান

আল্লামা শায়খ মুহাম্মদ ইকবাল ইসলামী বিশ্বের প্রখ্যাত দার্শনিক, চিন্তাবিদ, কবি, সাহিত্যিক ও আইনবিদ ছিলেন। উপমহাদেশে বৃটিশ শাসন আমলের মুসলিম মনীষীদের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান পুরুষ। তাঁর মতো আর কেউ এমন আন্তর্জাতিক খ্যাতি ও সম্মান লাভ করতে পারেননি। কবি হিসাবে দেশে-বিদেশে সুপরিচিত হলেও তিনি ছিলেন প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, দার্শনিক ও গ্রন্থকার। উপরন্তু তিনি ছিলেন পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা এবং পাকিস্তান তাঁরই কল্পনার বাস্তব রূপ।

ইকবালের জন্ম ও শিক্ষা

আল্লামা ইকবালের পূর্বপুরুষ ছিলেন কাশ্মীরের অধিবাসী। তিনি পাঞ্জাবের শিয়ালকোটে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে এক সম্ভ্রান্ত নও-মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন অসাধারণ মেধাশক্তির অধিকারী এবং প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে কলেজ পর্যন্ত প্রত্যেক শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ করার গৌরব অর্জন করেন। তিনি ১৮৯৯ সালে দর্শনশাস্ত্রে এম,এ এবং পরে ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'বার-এট-ল' পাস করেন। অতঃপর জার্মানীর হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট লাভ করেন।

ইকবালের কর্মজীবন

ইউরোপ থেকে দেশে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি লাহোরে আইন ব্যবসা শুরু করেন। তিনি ছিলেন স্বভাবকবি। কাব্যচর্চা এবং আইন ব্যবসার সাথে সাথে তিনি দেশের রাজনীতিতেও অংশগ্রহণ করেন। ১৯৩০ সালে তিনি পাঞ্জাব আইন-সভার সদস্য নির্বাচিত হন। এ বছরেই ডিসেম্বর মাসে এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতির ভাষণ দানকালে তিনি সর্বপ্রথম 'পাকিস্তান' রাষ্ট্রের ধারণা পেশ করেন। তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারা ছিল ইসলাম প্রভাবিত। তিনি ছিলেন বহু দূরদর্শী ইসলামী চিন্তানায়ক এবং তাঁর অদম্য বিশ্বাস ছিল যে, একমাত্র ইসলামই মুসলিম জাতিকে পুনরায় বিশ্ব-নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করতে পারে। উপমহাদেশের মুসলমান সমাজে ইংরেজ ও হিন্দুদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক গোলামীর জীবন যাপন করছিল এবং ইসলাম থেকেও সকল দিক দিয়ে দূরে সরে পড়ছিল। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, তাদেরকে এ অধঃপতন থেকে রক্ষা করতে হলে তাদের জন্য একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের প্রয়োজন– যেখানে তারা তাদের ঈমান-আকীদা অনুযায়ী প্রকৃত ইসলামী জীবন যাপনের সুযোগ পাবে।

মুসলমানদের চরম দুর্ভাগ্য এই যে, পাশ্চাত্যের জড়বাদী ও খোদাহীন চিন্তাধারার প্রভাবে তারা ধর্ম ও রাজনীতিকে দু'টি পৃথক বস্তু মনে করতো। উপমহাদেশে আল্লামা ইকবালই সর্বপ্রথম এভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন করেন। এলাহাবাদ মুসলিম লীগ সম্মেলনে তিনি যে সভাপতির ভাষণ পেশ করেন তাতে তাঁর রাজনৈতিক দর্শনের পূর্ণ বহিঃপ্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়।

তিনি তাঁর ভাষণে বলেন ঃ

ইসলাম মানবীয় ঐক্যকে রূহ এবং বস্তুর দু'টি পৃথক পৃথক বিভাগে বিভক্ত করে না। ইসলামে খোদা ও বিশ্ব প্রকৃতি, রূহ ও বস্তু, ধর্ম ও রাজনীতিতে নখ ও মাংসের ন্যায় অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান। তিনি বলেন ঃ

"ইসলাম এখনো একটি জীবন্ত শক্তি যা মানুষের মনকে বংশ, গোত্র ও জন্মভূমির বন্ধন থেকে মুক্ত করতে পারে, যার আকীদা-বিশ্বাস এই যে, ব্যক্তি ও রাষ্ট্র –এ উভয়ের জীবনে দ্বীন বা ধর্মের অসাধারণ গুরুত্ব রয়েছে।.....ইসলামের যে ধর্মীয় লক্ষ্য তা তার সামাজিক লক্ষ্য থেকে ভিন্নতর নয়। উভয়ে ওতপ্রোত জড়িত। যদি আপনি একটিকে পরিহার করেন, তাহলে অপরটিও পরিহার করতে বাধ্য হবেন। আমি বুঝতে পারি না যে, কোন মুসলমান এক মুহূর্তের জন্যেও এমন এক রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতে প্রস্তুত হবে– যা হবে জন্মভূমি ও জাতীয় মূলনীতির ভিত্তিতে। কারণ, এটা হবে ইসলগামী ঐক্যের পরিপন্থী।........ভারত বিভিন্ন জাতির আবাসভূমি, যাদের বংশ, গোত্র, ভাষা, ধর্ম– সব কিছুই একটি আরেকটি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। তাদের কাজ-কর্মের মধ্যে সে অনুভূতি সৃষ্টি হতে পারে না যা একই বংশের বিভিন্ন লোকের মধ্যে বিদ্যমান থাকে। ভালোভাবে লক্ষ্য করলে জানা যাবে যে, হিন্দুস্তানে একই বংশোদ্ভূত কোন জাতি নেই। অতএব, এটা কিছুতেই অযৌক্তিক নয় যে, বিভিন্ন জাতির অস্তিত্বের ধারণা না করেও আমরা হিন্দুস্তান কায়েম করতে পারি।"

আল্লামা ইকবাল তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে একথাও বলেন ঃ

"হিন্দুস্তান দুনিয়ার মধ্যে সর্ববৃহৎ একটি মুসলিম দেশ। যদি আমরা চাই যে, এদেশে ইসলাম একটি তমদ্দুনিক শক্তি হিসেবে জীবন্ত হোক, তাহলে তার জন্য প্রয়োজন একটি বিশেষ অঞ্চল যেখানে সে তার কেন্দ্রীয় স্থান কায়েম করবে।"

অতঃপর তিনি বলেন ঃ

"আমার অভিলাষ যে,পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু এবং বেলুচিস্তানকে একটি রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করে দেয়া হোক। .... আমার তো মনে হয় আর কিছু না হোক, নিদেনপক্ষে উত্তর হিন্দুস্তানের মুসলমানদের যে অবশেষে একটি সুসংগঠিত ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করতে হবে।"

আল্লামা তাঁর দীর্ঘ সভাপতির ভাষণে তাঁর রাজনৈতিক দর্শন, চিন্তাধারা ও মুসলমানদের ভবিষ্যতে করণীয় বিষয়াদি সব কিছুই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রকাশ করেন। মুসলমানদের জন্য একটি পৃথক ইসলামী রাষ্ট্রের যে অভিলাষ আল্লামা ইকবাল হৃদয়ে পোষণ করতেন তা তিনি বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনায় এবং বন্ধু-বান্ধবদের সাথে আলাপচারিতার সময় ব্যক্ত করতেন। কিন্তু এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত উক্ত মুসলিম লীগ সম্মেলনে তিনি তাঁর উক্ত অভিলাষকে একটি যথারীতি প্রস্তাবের আকারে পেশ করেন। মুসলিম লীগের রাজনীতি অন্যান্য দলের রাজনীতির মতোই ছিল ধর্মবিবর্জিত। হয়তো সে কারণেই আল্লামার প্রস্তাবের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য লীগ নেতৃবৃন্দ উপলব্ধি করতে পারেননি।

পঁয়ত্রিশ সালের ভারত শাসন আইনের *[India Act 1935]* অধীনে সারা দেশে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাতে এগারোটি প্রদেশের মধ্যে ছ'টিতে – (বিহার, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ, রোম্বে, ইউপি ও সিপি) কংগ্রেস নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। মুসলিম লীগ কোথাও নির্বাচনে সুবিধা করতে পারেনি। কারণ, তার সংগঠন ততো মজবুতও ছিল না। আল্লামা ইকবালের আহ্বানে জনাব মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ইংল্যাণ্ড থেকে ভারতে প্রত্যাবর্তন করে ১৯৩৭ সালে মুসলিম লীগের নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন এবং সংগঠনকে শক্তিশালী করতে থাকেন। আল্লামাও এ ব্যাপারে তাঁর গভীর অনুরাগ প্রকাশ করেন এবং মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর জনপ্রিয়তার জন্যেও তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করেন।

এ সময়ে তিনি পাঞ্জাব মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। অতঃপর তিনি বিভিন্ন সময়ে জনাব জিন্নাহর নামে লিখিত পত্রাদিতে একথার উপর বিশেষ জোর দিয়ে বলেন যে, মুসলমানদের সকল সমস্যার একমাত্র সমাধান এই যে, এ উপমহাদেশে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলো নিয়ে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র কায়েম করা হোক যেখানে তারা ইসলামী শিক্ষার আলোকে জীবন যাপন করবে। কিন্তু মুসলিম লীগ তাঁর জীবদ্দশায় এ কথায় কোন কর্ণপাত করেনি।

তিরিশের দশকের শেষদিকে আল্লামা স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে খুব দুর্বল হয়ে পড়েন। এ সময়ে তিনি ইসলামী রেনেসাঁ বা ইসলামী পুনর্জাগরণ সম্পর্কেই বেশী চিন্তা-ভাবনা করছিলেন, বরঞ্চ একে তিনি তাঁর জীবনের লক্ষ্য বানিয়ে নিয়েছিলেন। তাঁর চিন্তা ছিল, উপমহাদেশের কোথাও '*ইসলামী একাডেমী*' অথবা অন্য কোন নামে একটি 'ইসলামী গবেষণা কেন্দ্র' স্থাপন করা এবং ইসলামী বিপ্লবের জন্যে সংগ্রামী লোক তৈরী করা।

উল্লেখ্য, জনৈক অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারী চৌধুরী নিয়ায আলী খান আল্লামার সাথে পরামর্শক্রমে একটি ইসলামী গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার অধীন পাঠানকোটের সন্নিকটে জামালপুরে '*দারুল ইসলাম*' নামে একটি প্রতিষ্ঠানের জন্যে তিনি কয়েক'শ একর জমি ওয়াকফ করেন। এ প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য চৌধুরী নিয়ায আলী খান এবং আল্লামা ইকবাল যোগ্য লোকের সন্ধান করতে থাকেন। এ উদ্দেশ্যে মিসরের আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয় প্রধান শায়খ মুস্তাফা মুরাগীর সাথে আল্লামা পত্র বিনিময় করেও ব্যর্থ হন। অবশেষে তাঁর দৃষ্টি নিপতিত হয় দাক্ষিণাত্যের হায়দারাবাদ থেকে প্রকাশিত মাসিক '*তরজুমানুল কুরআন*'-এর সম্পাদক মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদীর উপর। আল্লামা এ পত্রিকাটি নিয়মিত পড়তেন এবং সম্পাদকের ইসলামী জ্ঞান ও স্বচ্ছ ইসলামী চিন্তাধারার প্রশংসা করতেন।

আল্লামা ইকবাল সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদীকে হায়দারাবাদ থেকে হিজরত করে উক্ত দারুল ইসলামে এসে পরিকল্পিত কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করতে অনুরোধ জানান।

আল্লামার চিন্তাধারা, সাহিত্য ও কাব্যের প্রতি মাওলানা মওদূদী গভীরভাবে আকৃষ্ট ছিলেন। তিনি আল্লামার অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারলেন না। কারণ, এ ধরনের পরিকল্পনা তিনি

নিজেও হৃদয়ে পোষণ করতেন। অবশেষে ১৯৩৮ সালের মার্চ মাসে তিনি আধুনিক সভ্যতামণ্ডিত হায়দারাবাদ শহর থেকে চিরকালের জন্য হিজরত করে এক মহান উদ্দেশ্যে একটি নিভৃত পল্লীতে তাঁর কর্মক্ষেত্র নির্বাচিত করে নেন।

মাওলানা মওদূদী দারুল ইসলামে আসার ক'দিন পরেই আল্লামা তাঁকে শোক, দুঃখ ও হতাশার সাগরে নিক্ষেপ করে ইহলোক ত্যাগ করেন।

সে সময়ে উপমহাদেশের রাজনৈতিক অবস্থা ছিল বড়ো অশান্ত ও উদ্বেগজনক। ছ'টি প্রদেশেই বলতে গেলে প্রায় *'রামরাজ্য'* প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মুসলমানদের জান-মাল, ইজ্জত-আবরু এবং তৎসহ ঈমান-আকীদা বিপন্ন হয়ে পড়েছে।

এক জাতীয়তার ভিত্তিতে কংগ্রেসের স্বাধীনতা আন্দোলন অর্থাৎ ইংরেজের হাত থেকে ক্ষমতালাভের আন্দোলন, এক জাতীয়তার মধ্যে মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্য-স্বকীয়তা একাকার করে দেয়ার জন্যে মুসলিম গণসংযোগ আন্দোলন *[MUSLIM MASS CONTACT MOVEMENT]* এবং যেখানে-সেখানে মাঝে মাঝে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে।

স্বাধীনতা মুসলমানদেরও অবশ্যই কাম্য ছিল। কিন্তু হিন্দু কংগ্রেসের স্বাধীনতা ও মুসলমানদের স্বাধীনতার উদ্দেশ্য ভিন্নতর। আল্লামা ইকবাল তাঁর রোগশয্যা থেকে এ সম্পর্কে বলিষ্ঠ ভাষায় মুসলিম জাতির দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেন। তিনি বলেন ঃ

"মুসলমান হিসাবে আমাদের ফরজ হচ্ছে ইংরেজদের গোলামীর বাঁধ ভেঙে ফেলা এবং তাদের শাসন খতম করা। আর আযাদীর উদ্দেশ্য আমাদের এ নয় যে, আমরা নিছক আযাদ হয়ে যাব। বরঞ্চ আমাদের প্রথম উদ্দেশ্য এই যে, ইসলাম যেন কায়েম থাকে এবং মুসলমান শক্তিশালী হয়ে পড়ে। এ জন্য মুসলমান এমন কোন সরকার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করতে পারে না যার বুনিয়াদ এমন সব মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে যে-সবের উপর ইংরেজ সরকার প্রতিষ্ঠিত। একটি বাতিল উৎখাত করে অন্য একটি বাতিল প্রতিষ্ঠার কি অর্থ হতে পারে ?

আমরাতো এটাই চাই যে, হিন্দুস্তান পুরোপুরি না হলেও যেন অনেকাংশে দারুল ইসলাম হয়ে পড়ে। কিন্তু ভারত স্বাধীনতার অর্থ যদি এই হয় যে, এ যেমন দারুল কুফর আছে তেমনি থাকবে অথবা এর চেয়েও নিকৃষ্টতর হবে। তা হলে এমন স্বাধীনতার জন্যে কলম ধরা, বক্তৃতা-বিবৃতি দেয়া, অর্থ ব্যয় করা, মার খাওয়া, জেলে যাওয়া, গোলা-গুলীর শিকার হওয়া সব কিছুই মুসলমান হারাম– অকাট্য হারাম– মনে করে।"

[আল্লামা ইকবাল ঃ দৈনিক ইহসান, ৯ই মার্চ,১৯৩৮ সাল]

ইসলামের দৃষ্টিতে স্বাধীনতার তাৎপর্য কি তা আল্লামা জানিয়ে দিয়েছেন। স্বাধীনতা সম্পর্কে অবিকল একই রকম দৃষ্টিভঙ্গি মাওলানা মওদূদী ১৯৩৭ সালের এপ্রিল মাসের তরজুমানুল কুরআনে ব্যক্ত করেছেন।

মাওলানা মওদূদী দারুল ইসলামে আসার পর অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসের তরজুমানুল কুরআনের মাধ্যমে তিনটি বিকল্প শাসনতান্ত্রিক প্রস্তাব দেশবাসী ও সরকারের

নিকট পেশ করেন। তার মধ্যে তৃতীয় প্রস্তাবটি ছিল দেশ বিভাগের এবং মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলো নিয়ে একটি মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের। আল্লামা ইকবালের স্বপ্নকে মাওলানা মওদূদী মুসলিম জাতির কাছে পুনরায় তুলে ধরেন।

মুসলিম লীগ মুসলমানদের পৃথক রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব অগ্রহণযোগ্য মনে করলেও দেশের ঘটনাপ্রবাহ, হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক সম্পর্কের চরম অবনতি, উপমহাদেশ থেকে মুসলমানদের নির্মূল করার ষড়যন্ত্র প্রভৃতি শেষ পর্যন্ত এ প্রস্তাব গ্রহণে মুসলিম লীগকে বাধ্য করে। আল্লামার প্রস্তাব উপস্থাপনের দশ বছর এবং মাওলানা মওদূদীর প্রস্তাবের দু'বছর পর ১৯৪০ সালের ২৩ শে মার্চ মুসলিম লীগ পাকিস্তান প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং একটানা প্রায় আট বছর সংগ্রামের পর পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আল্লামা ইকবালের স্বপ্ন বাস্তব রূপ লাভ করে।

ধর্মহীনতা ও নাস্তিকতার বিরুদ্ধে ডঃ ইকবাল

মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী *'ইকবাল ও পাকিস্তান'* শীর্ষক তাঁর এক প্রবন্ধে বলেন ঃ

"বর্তমানকালে মুসলমানদের মধ্যে নাস্তিকতার আন্দোলন শুরু হয়েছে এবং ইসলামের সত্যতার উপর প্রকাশ্যেই আক্রমণ করা হচ্ছে, যেভাবে প্রকাশ্যে খোদাহীনতা ও নাস্তিকতার দিকে আহ্বান জানানো হচ্ছে– ইতিপূর্বে মুসলমানদের ইতিহাসে এরূপ কখনো হয়নি। মুসলমানদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে কমিউনিজমের প্রচার শুরু হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। তাদেরকে প্রকাশ্যে নৈতিক উচ্ছৃংখলতা শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। ক্রমশ অবস্থা এমন হয়ে পড়েছে যে, মানুষের কাছে এ এক বিস্ময় বলে মনে হচ্ছে যে, কেউ শিক্ষালাভ করেছে এবং তারপরও খোদাকে মানে এবং নামায-রোযাও পালন করে। দৃষ্টিভঙ্গির এতোটা পরিবর্তন হয়েছে যে, মানুষ এখন একথা মনে করা শুরু করেছে যে, যে ব্যক্তি নামায পড়ছে তার এতে লজ্জাবোধ করা উচিত।........একদিকেতো মুসলমানদের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আদর্শিক অধঃপতন এমন ছিল এবং সেই সাথে যে বিপদে তারা নিপতিত ছিল তা ছিল এই যে, তাদের কোন নির্ভরযোগ্য নেতৃত্ব এখন পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল না। যাঁরা প্রথম মহাযুদ্ধের আগে এবং যুদ্ধের সময়ে যতোটা সম্ভব ইসলামের পতাকা বুলন্দ করে রেখেছিলেন– তাঁরা নীরবতা অবলম্বন করেছিলেন, অথবা মুসলমানদের মধ্যে তাঁদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিনষ্ট হয়েছিল, অথবা তাঁরা ইসলামী দাওয়াতের পথ পরিহার করে জাতীয়তাবাদ এবং আঞ্চলিকতাবাদের দাওয়াত দেয়া শুরু করেছিলেন। এ অবস্থায় একমাত্র আল্লামা ইকবালই এমন ব্যক্তি ছিলেন, যিনি এ সমগ্র পরিস্থিতির মুকাবিলা করেন। প্রকৃতপক্ষে ১৯২৪ সাল থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত এ চৌদ্দ বছরের সুদীর্ঘ সময়ে ইসলামী আন্দোলন এবং ইসলামী প্রেরণার পুণর্জাগরণের জন্যে মুসলমানদের মধ্যে ইসলামী ও জাতীয় অনুভূতি জাগ্রত রাখার জন্যে যদি সবচেয়ে বিরাট কোন শক্তি কাজ করে থাকে, তাহলে তা ছিল আল্লামা ইকবালের একার শক্তি। যারাই কালামে ইকবাল অধ্যয়ন করেন এবং তাঁর গদ্য ও কবিতা পাঠ করেছেন, তাঁরা একথার সাক্ষ্য দেবেন যে, আল্লামা ইকবাল উপমহাদেশের

মুসলমানদের পতনোন্মুখ মর্যাদা রক্ষা করার জন্যে এবং আপন জাতির স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণের জন্যে কিভাবে তাদেরকে কর্মতৎপর করে তোলেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর গদ্য ও পদ্য উভয় শক্তি ব্যবহার করেছেন। [ইকবাল ও পাকিস্তান ঃ মাওলানা মওদূদী]

ভৌগোলিক ও আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ

আধুনিক যুগের সকল অশান্তি অনাচারের মূল হলো ভৌগোলিক ও আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ। এর পরিণামে মানবজাতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিবদমান দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। বংশীয় এবং আঞ্চলিক অন্ধ বিদ্বেষ ও পক্ষপাতিত্বের কারণে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ হয় এবং অসংখ্য মানুষের জীবন নষ্ট হয়, কোটি কোটি টাকার ধন-সম্পদ, ঘর-বাড়ী, কল-কারখানা এবং লক্ষ লক্ষ একর জমির শস্য-সামগ্রী ধ্বংস হয়। আধুনিক যুগের চিন্তাশীলগণের মধ্যে আল্লামা ইকবালই সর্বপ্রথম অশান্তি-অনাচার সৃষ্টিকারী জাতিপূজার এ ব্যাধির বিরুদ্ধে হুশিয়ারি উচ্চারণ করেন। তিনি বলেন ঃ

আপনি মিল্লাত পর কিয়াস্
আকওয়ামে মাগরিব সে না কর,
খাস্ হ্যায় তারকীব সে
কওমে রসূলে হাশেমী।
উনকি জাম্‌ইয়ত কা হ্যায়
মুল্‌ক ও নসব পর ইন্‌হিসার,
কুয়তে মাযহাব সে
মুস্তাহ্‌কাম হ্যায় জাম্‌ইয়ত তেরী।
দামানে দ্বীন্ হাথ্ সে ছুটা
তো জাম্‌ইয়ত কাহাঁ,
আওর জাম্‌ইয়ত হুয়ী রুখ্‌সৎ
তো মিল্লাত ভি গাঈ।

অর্থঃ

আপন মিল্লাত বা জাতির ধারণা,
পাশ্চাত্যের জাতিগুলোর উপর করোনা।
রসূলে হাশেমীর জাতির
রয়েছে বিশেষ গঠন পদ্ধতি।
তাদের সংঘ-সংগঠন নির্ভরশীল

আল্লামা ডক্টর মুহাম্মদ ইকবাল
দেশ ও বংশের উপর,
তোমার সংঘ-সংগঠন সুদৃঢ় হয়
ধর্মের শক্তিতে।
দ্বীনের আস্তিন হাত থেকে ছুটলে
সংঘ আর থাকে কোথায় ?
সংঘ-সংগঠন যদি বিদায় নিল
তাহলে মিল্লাতও বিদায় নিল।

দেশ পূজার তীব্র প্রতিবাদে ইকবাল বলেন ঃ

উন্ তাজা খোদাওঁ মে
বড়া সব সে ওয়াতান হ্যায়,
জু পিরহান উস্কা হ্যায়,
উ মায্হাব কা কাফন হ্যায়।

অর্থ ঃ

ওসব জীবন্ত খোদার মধ্যে সবচেয়ে বড়ো খোদা জন্মভূমি।
যা তার পিরহান [জামা]
তা-ই ধর্মের কাফন।

জাতীয়তা সম্পর্কে আল্লামা ইকবাল যে ইসলামী ধারণা ব্যক্ত করেন, তার ফলে একদিকে বিশ্ব জুড়ে মুসলমানদের মধ্যে মুসলিম মিল্লাতের ঐক্য এবং ইসলামী ভ্রাতৃত্বের উন্নয়নের জন্যে পৃথক আবাসভূমি লাভ করার অনুভূতি সৃষ্টি হয় এবং অপরদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু জাতির মধ্যে মিশে একাকার হয়ে যাওয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করার বিরাট প্রেরণা সৃষ্টি হয়।

মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদূদী তাঁর *'ইকবাল ও পাকিস্তান'* শীর্ষক প্রবন্ধে বলেনঃ *"আল্লামা ইকবাল জাতির জন্যে যে বিরাট অবদান রেখে গেছেন তা হলো এই যে, তিনি জন্মভূমিভিত্তিক জাতীয়তা এবং জাতিপূজার উপরে দারুণ আঘাত হেনেছেন। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, যদি জাতিপূজা, জাতীয়তাবাদ এবং জন্মভূমিভিত্তিক জাতীয়তার উপর তিনি সময়মত আঘাত না করতেন, তাহলে পরবর্তীকালে কংগ্রেসের মধ্যে মুসলমানদের একাকার করে দেয়ার যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল, তার থেকে মুসলমানদেরকে রক্ষা করা যেতোনা। বিশেষ করে এমন অবস্থায় যখন ওলামায়ে দ্বীন-এরও কেউ কেউ পর্যন্ত মুসলমানদেরকে ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদের দীক্ষা দেয়া শুরু করে দিয়েছিলেন এবং বড়ো বড়ো মুত্তাকী আলেমগণও একথা বলা শুরু করেছিলেন যে, জন্মভূমির ভিত্তিতে যে জাতীয়তাবাদ গড়ে ওঠে তা দ্বীন ইসলামের জন্যে কোনরূপ ক্ষতিকর নয়। এ অবস্থায় ইকবালই একমাত্র ব্যক্তি ছিলেন যিনি সর্বশক্তি দিয়ে এ মারাত্মক ধারণার খণ্ডন করেন এবং মুসলমানদেরকে বলিষ্ঠ ভাষায় একথা*

বলেন যে, জন্মভূমিও এক দেবতা এবং জন্মভূমির পূজাও ঠিক তেমনি শিরক, যেমন কোন দেবতা বা প্রতিমার পূজা করা। যথাসময়ে ইকবাল এ শিক্ষা যদি না দিতেন, তাহলে পরবর্তীকালে কংগ্রেস যে 'Muslim Mass Contact Movement' (মুসলিম গণসংযোগ আন্দোলন) শুরু করেছিল, যে আন্দোলনে ওলামা এবং সমাজতন্ত্রীগণ শামিল ছিলেন, তা হলে সে আন্দোলন মুসলমানদেরকে হিন্দুদের মধ্যে এমনভাবে গলিয়ে-মিশিয়ে দিত যেমন লবণ পানির মধ্যে গলে যায়। কিন্তু ইকবাল মুসলমানদের মধ্যে এ অনুভূতি সৃষ্টি করেন যে, জাতীয়তা দেশ ও ভাষার ভিত্তিতে হয়না, বরঞ্চ দ্বীন ও আকীদা-বিশ্বাসের ভিত্তিতে হয়। তিনি মুসলমানদের মধ্যে এ অনুভূতি জাগ্রত করে দেন যে, মুসলমান এক বিশেষ আকীদা পোষণকারী এবং এক সভ্যতা-সংস্কৃতির ধারক জাতি। যে-সব জাতির ধর্মীয় বিশ্বাস ও পথ মুসলমানদের থেকে ভিন্নতর, তাদের জাতীয়তা থেকে মুসলিম জাতীয়তা সম্পূর্ণ পৃথক।"

হিন্দুদের কুটিল রাজনৈতিক প্রচারণায় পড়ে মুসলমানদের পরম শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী সাহেবও জন্মভূমির ভিত্তিতে জাতীয়তার ধারণাকে সমর্থন করেন। আল্লামা ইকবাল তার তীব্র প্রতিবাদ করে বলেন ঃ

আজম হনুয্ না দানিস্ত রমূযে দ্বীন ওয়ার না,
যে দেওবন্দ হুসাইন আহমদ ইঁচে বুল আজবিস্ত ?
সরূদে বর-সরে মিম্বর কে মিল্লাত আয্ ওয়াতানাস্ত
চে বে-খবর আয্ মাকামে মুহাম্মদে আরাবিস্ত ?
বমুস্তাফা ব-রেসাঁ খেশ্ রা কে দীঁ হামা উস্ত–,
আগার বা-উ না রাসিদী তামামে বুলাহাবিস্ত।

অর্থঃ

বুঝেনি ঐ আজমবাসী
দ্বীনের মর্ম বিহ্বলতা,
দেওবন্দে তাই-তো হুসাইন
আহমদ কন আজব কথা।
'ওয়াতান থেকে মিল্লাত হয়–'
এই কথা ফের গান যে তিনি।
বুঝেননি হায় নবীর মকাম,
আল্-আরাবীর মান যে তিনি।
নবীর কাছে পৌঁছিয়ে দাও
নিজেকে, এই দ্বীনের দাবী
পৌঁছাতে না পার যদি,
সবই হবে বু-লাহাবী।

সিকিউলারিজম ও ইকবাল

আল্লামা ইকবালের আর একটি বড়ো অবদান এই যে, ধর্ম ও রাজনীতির পার্থক্যের যে ভ্রান্ত ধারণা মুসলমানদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে, যে কারণে মানুষ মনে করছে যে, ধার্মিক ও খোদাভীরু লোকের রাজনীতির সাথে কি সম্পর্ক এবং ধর্মকে রাজনীতি ক্ষেত্রে টেনে আনারই বা অর্থ কি – ইকবাল যথাসময়ে এ ভ্রান্ত ধারণার খণ্ডন করেন। রাজনীতিহীন ধর্মেরও যেমন তিনি নিন্দা করেছেন, ঠিক তেমনি ধর্মহীন রাজনীতিরও তীব্র সমালোচনা করেছেন। ধর্মহীন রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর একটি ছত্র এমন যে, সমগ্র দুনিয়ার সাহিত্য একদিকে হলেও তাঁর এ একটি ছত্রই সবচেয়ে মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ। তা হচ্ছেঃ

'জুদা হো দ্বীন্ সিয়াসাত সে তো রাহ্ জাতি হ্যায় চেংগীযি।'

আল্লামা ইকবাল এ একটি বাক্যের দ্বারা যে কথাটি বুঝাতে চেয়েছেন তা এই যে, রাজনীতিকে দ্বীন থেকে দূরে রাখলে তার অনিবার্য পরিণাম বর্বরতা, হিংস্রতা, স্বৈরাচার, অবিচার এবং জুলুম-উৎপীড়ন ছাড়া আর কিছু হয় না। রাজনীতি সঠিকভাবে মানবতার খেদমত করতে পারে যদি দ্বীন বা ধর্ম তাকে সঠিক পথে রাখার জন্যে একটি পথপ্রদর্শক শক্তি হিসাবে তার সাথে বিদ্যমান থাকে।

'সিকিউলারিজম' -এর ধারণা মুসলমানদের মন-মস্তিষ্ক এমনভাবে প্রভাবিত করেছিল যে, তারা মনে করছিল ধার্মিকদের কাজ শুধু *'আল্লাহ্ আল্লাহ'* করা, অথবা মসজিদ-মাদ্রাসায় কুরআন-হাদীস শিক্ষা দেয়া। রাজনীতির সাথে তাদের কোন সম্পর্ক নেই। ইকবাল এ ভ্রান্ত ধারণার উপর চরম আঘাত হেনেছেন। তিনি বলেনঃ

'আসা না হো তো কালিমী হ্যায় কারে বেবুনিয়াদ।' অর্থাৎ আসা বা লাঠি না হলে কালিমী ভিত্তিহীন কাজ হয়ে পড়বে।

এ একটি বাক্যেও ইকবাল ধর্ম ও রাজনীতি দু'টি পৃথক বস্তু- এ ধারণার অন্তঃসারশূন্যতা সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, যদি দ্বীন বা ধর্মের কাছে আকীদা-বিশ্বাসের ভিত্তিতে তার জীবনবিধান কার্যকর করার শক্তি না থাকে, তাহলে এ শক্তি (লাঠি) যে ব্যক্তি, দল অথবা ব্যবস্থার কাছে থাকবে, সে দুনিয়াকে তার নিজের পথেই চালিয়ে নিয়ে যাবে। কালিমী করার অর্থাৎ মূসা (আঃ) -এর দ্বীন প্রতিষ্ঠার সুযোগ আর থাকবে কি করে ?

তিনি এ ধারণাই মুসলমানদের মনে বদ্ধমূল করার চেষ্টা করেছেন যে, ইসলাম নিছক কিছু ধর্মীয় ক্রিয়াকর্মের নাম নয়, নিভৃত স্থানে *'আল্লাহ আল্লাহ'* জপ করা নয়, বরঞ্চ একটি পূর্ণাংগ জীবনবিধান। মানবের গোটা জীবনকে ইসলাম নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। মুসলমানের কাজই হলো আল্লাহর বিধান, তাঁর কর্তৃত্ব, প্রভুত্ব সমাজে কার্যকর করবে। তাই মুসলমানগণ একটি সংগ্রামী দল, তারা আল্লাহর সৈনিক। তারা দুনিয়ায় আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধি। সে জন্যে ইবলীস শয়তান তার জন্যে বিরাট আতংক মনে করে ইসলামকে এবং দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্যে সংগ্রামী মুসলমানকে। আল্লামা ইকবাল তাঁর *'আরমুগানে হেজাজ'* –নামক গ্রন্থে ইবলীসের বার্ষিক মজলিসে শুরার এক ব্যঙ্গচিত্র এঁকেছেন– এ মজলিসে শূরায়– ইবলীস ইসলাম ও

মুসলিম উম্মাহকে চরম উদ্বেগের বিষয় বলে বর্ণনা করেছে। সে বলেঃ

হ্যায় আগার মুঝকো খাতার কুই

তো এস্ উম্মাত সে হ্যায়।

অর্থাৎ কারো পক্ষ থেকে আমার বিপদের আশংকা থাকলে তা হচ্ছে এ মুসলিম উম্মাহ্।

ইবলীস তার মজলিসে শূরার সদস্যদের কাছে তাদের দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলে যে, যারা আল্লাহর দ্বীন বা আইন, শাসন সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে মাঠে-ময়দানে কাজ করছে, জিহাদের প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি করছে, তাদেরকে মাঠ-ময়দান থেকে অর্থাৎ আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম থেকে ফিরিয়ে এনে খানকা বা হুজরায় বসিয়ে দাও। এখানে বসে তারা শুধু *'আল্লাহ আল্লাহ'* যিকির করতে থাকবে এবং খানকার বাইরের বৃহত্তর জগতে আমাদের শাসন চলবে। ইবলীস বলেঃ

মস্ত রাখ্খো যিকর–ফিকরে

সুবাহ গাহী মে উসে ,

পোখ্তা তর কার দো,

মেযাজে খানকাহী মে উসে।

مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے
پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے

অর্থঃ সকাল-সন্ধ্যায় তাদেরকে যিকির-ফিকিরে মত্ত করে রাখ। তাদের খানকাহী মেযাজ পাকাপোক্ত করে দাও।

অর্থাৎ দ্বীনের মুজাহেদিন যারা তাদেরকে জিহাদের ময়দান থেকে টেনে নিয়ে এসে 'খানকার মধ্যে বা কোন সংকীর্ণ কক্ষে' দিন-রাত আল্লাহর যিকিরে মশগুল ও মত্ত করে রাখ এবং এমন সীমিত ও সংকীর্ণ খানকাহী মেযাজসম্পন্ন বানিয়ে দাও যেন তারা খানকার বাইরের জগত সম্পর্কে কোন চিন্তা-ভাবনা করতে না পারে। ফলে, বাইরের জগতে সর্বত্র যেন ইবলীসের রাজত্ব কায়েম হতে পারে।

আল্লামা ইকবালের রাজনৈতিক ও ইসলামী চিন্তাধারার উপরে বিরাট বিরাট গ্রন্থ লিখিত হয়েছে এবং আরও লেখা যেতে পারে। অত্র প্রবন্ধে তাঁর চিন্তাধারার উপরে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ নেই। এখানে সংক্ষেপে কিছু ইংগিত করা মাত্র।

আল্লামা ইকবাল তাঁর জীবনের সূচনা থেকেই কবিতা রচনার প্রতি অদম্য ঝোঁক- প্রবণতা প্রদর্শন করেন। তিনি ছিলেন স্বভাবকবি। কাব্য রচনা তাঁর স্বভাবসুলভ কাজ হলেও তিনি ছিলেন বিরাট ইসলামী চিন্তাবিদ। তবে, একবার তিনি কাব্য রচনাকে সময়ের অপচয় মনে করে তা পরিহার করার ইচ্ছা করেন। তিনি চাচ্ছিলেন যে, কাব্য রচনায় যে সময় নষ্ট হয় তা তিনি কোন মহৎ কাজে লাগাবেন। কিন্তু তাঁর জনৈক বন্ধু শায়খ আবদুল কাদের তাঁকে বললেনঃ

"ইকবাল ! তোমার– কাব্যচর্চা এমন নয় যা পরিত্যাজ্য। তোমার কবিতায় এমন প্রভাব রয়েছে যে, সম্ভবত তা আমাদের দেশ ও জাতির বহুবিধ ব্যাধি নিরাময় করবে। এ জন্যে এমন খোদা প্রদত্ত কল্যাণকর শক্তিকে কাজে না লাগানো ঠিক হবে না। তুমি এ কাজ করতে থাক। আল্লাহ্ তোমার খেদমত গ্রহণ করবেন।"

আল্লামা বন্ধুর পরামর্শ গ্রহণ করেন যার ফলে মিল্লাতে ইসলামিয়া এমন এক কবি লাভ করলো যার তুলনা দুনিয়ায় আজ বিরল। তিনি তাঁর কাব্য শক্তির দ্বারা উপমহাদেশের মুসলমানদেরকে জাগ্রত করেন এবং তাদের মধ্যে নতুন আশার সঞ্চার করেন।

তিনি উর্দু ও ফার্সী উভয় ভাষায় কবিতা রচনা করতেন। উর্দূ ভাষায় তাঁর কাব্য গ্রন্থের মধ্যে 'বাংগে দারা,' 'বালে জিব্রিল' এবং 'যারবে কালীম,' ফার্সী ভাষায় 'আসরারে খুদী,' 'পায়ামে মাশরিক,' 'জাবীদনামা,' ও 'যবুরে আজম' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ 'আরমুগানে হেজায' উর্দূ-ফার্সী কবিতা সংকলন। এর মধ্যে একটি কবিতায় তিনি ইবলীসের মজলিসে শুরার একটি ব্যঙ্গ চিত্র অংকিত করেন। এতে ইবলীস তার আপন সত্তার জন্যে ইসলামী জীবন বিধানকেই সবচেয়ে আশংকাজনক বলে উল্লেখ করে।

তাঁর রচিত 'শিক্ওয়া' এবং 'জওয়াবে শিকওয়া' মানুষের মনে বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছে। শিকওয়ার মধ্যে ইকবাল খোদার কাছে এ অভিযোগ করে বলেন ঃ "হে খোদা! মুসলমান তোমার নাম স্মরণ করে, তোমার দ্বীন মেনে চলে,তারপরও তারা কেন লাঞ্ছিত-পদদলিত ?" জওয়াবে শিকওয়ায় তিনি আবার খোদার পক্ষ থেকে স্বয়ং এ অভিযোগের জবাবে বলেনঃ "একথা মিথ্যা যে, তোমরা মুসলমানরা দ্বীন মেনে চলছ। তোমাদের বাপ-দাদা তো অবশ্যই দ্বীন মেনে চলতো। তার জন্যে খোদা তাদের মদদ করেছেন। কিন্তু তোমরা দ্বীন পরিত্যাগ করেছ এবং খোদাও তোমাদেরকে পরিত্যাগ করেছেন। তোমরা শুধু কথা বল, কাজ করো না। আমল করো না, এমন মুসলমানের জন্যে খোদার কোন ওয়াদা নেই। আসল বস্তু হচ্ছে নেক আমল।"

ইকবালের কবিতা মানুষকে আমলের পয়গাম পৌঁছে দেয়। অর্থাৎ ঈমানকে বাস্তব জীবনে কার্যকর করার প্রেরণাই দান করে। তিনি বলতেন, চেষ্টা-চরিত্র ও কুরবানী ব্যতীত আমরা কিছুই করতে পারবোনা। উন্নতি-অগ্রগতি ক্রমাগত চেষ্টা-সাধনারই নাম। কর্মতৎপরতা ও আন্দোলনই বিপ্লবের ভূমিকাস্বরূপ। স্থবিরতা মৃত্যুর আলামত। তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে, একটি দুনিয়ার পুনর্গঠনের জন্যে খোদার পথে চলা অত্যাবশ্যক। দ্বীন ও নৈতিকতা পরিহার করলে মানুষ পশুতে পরিণত হয়।

আল্লামা ইকবালের বাস্তব জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে সহজেই অনুমান করা যায় যে, মানুষ হিসেবে তিনি কত বিরাট মহত্ত্বের অধিকারী ছিলেন। ফজরের নামাযের পর কুরআন পাক অধ্যয়ন ছিল তাঁর প্রাত্যহিক রুটিনভুক্ত। তিনি কুরআন পাঠে এতো নিমগ্ন হতেন যে, তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রুধারা প্রবাহিত হতো।

আল্লামা এক সময়ে ম্যাকলাউড রোডের একটি পুরাতন জরাজীর্ণ বাড়িতে ভাড়াটিয়া হিসেবে

বাস করতেন। মাসিক ভাড়া দিতেন পৌনে দু'শ টাকা– যা সে সময়ের জন্যে ছিল অত্যন্ত বেশী। লোকে বলতো, এতো অধিক ভাড়ায় এমন একটি জরাজীর্ণ বাড়ীতে আপনি কেন থাকেন। তিনি বলতেন, বাড়ীটি একজন বিধবার। তার সন্তানদের ভরণ-পোষণ এতেই হয়ে যায়। ভাড়া কমাবার কথা বলতে আমার বড়ো লজ্জা হয়।

একবার তাঁর চাকর আলী বখ্শ ছুটিতে যাবার সময় অন্য একজনকে তার স্থানে রেখে গেল। ছুটি শেষে যখন আলী বখ্শ ফিরে এলো তখন চাকরটি তার বেকারত্বের কথা ভেবে অস্থির হয়ে পড়লো। আল্লামা বললেন, ঠিক আছে তুমিও থেকে যাও।

এ দ্বিতীয় চাকরটি এক সময় অন্য একজনকে তাঁর স্থলে রেখে ছুটিতে গেল। সে ছুটি থেকে ফিরে এলে তার স্থলাভিষিক্ত এখন কোথায় যাবে এই বলে দুঃখপ্রকাশ করতে থাকলে আল্লামা তাকেও রেখে দিলেন।

লোকে বলে, তিন তিনটি চাকরের আপনার দরকার কি ? তিনি জবাবে বলেন ঃ সবেরই তো আল্লাহ মালিক।

শেষ পর্যন্ত এ তিনজনই তাঁর সাথে ছিল।

মোটকথা, আল্লামা ইকবাল মিল্লাতে মুসলিমার বড়ো অমূল্য সম্পদ ছিলেন। তিনি উপমহাদেশের মুসলমানদেরকে তাঁর কবিতার জাদুর কাঠি দিয়ে জাগ্রত করেন। তাঁর চিন্তাধারা তাদেরকে *সিরাতে মুস্তাকীম* প্রদর্শন করে। তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা তাদেরকে পাকিস্তানের ধারণা দান করে। তাঁর দ্বীনদারী ও ইসলামপ্রিয়তা তাদেরকে ইসলামের পথযাত্রী বানিয়ে দেয়। তাঁর নবীপ্রেম তাদের মধ্যে ইসলামী জীবনব্যবস্থার প্রতি অদম্য প্রেরণা সৃষ্টি করে। তিনি তাদের মধ্যে তৌহীদের পতাকাবাহী হিসেবে দুনিয়ায় শির উঁচু করে দাঁড়াবার জযবা সৃষ্টি করেন। ইকবাল মুসলিম মিল্লাতের অমর কবি, ইসলামী রেনেসাঁর নকীব। তিনি ছিলেন মানবতার কবি, বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও বিশ্বপ্রেমের কবি।

ইকবাল সাহিত্যের আদর্শ

আবদুল মান্নান তালিব

মানুষ নিজে সৃষ্টি হয়নি। তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। মানুষের স্রষ্টা তাঁর ইচ্ছামতো মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই তাকে এই দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। এই বিশ্বজাহানের সমস্ত জিনিস মানুষ ব্যবহার করছে এবং এগুলো ব্যবহার করার ক্ষমতা ও মানুষের আছে। এ থেকে বুঝা যাচ্ছে, এগুলোও সেই একই স্রষ্টার সৃষ্টি। সেই একজন স্রষ্টা মানুষকে দুনিয়ায় চলার জন্য জীবনবিধানও দিয়েছেন। মানুষের নিজের প্রকৃতি এবং বিশ্বজাহানের সমস্ত জিনিসের প্রকৃতির শক্তি, প্রবণতা ও চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে এই জীবনবিধান তৈরি করা হয়েছে। তাই এর নাম ইসলাম অর্থাৎ সেই স্রষ্টার কাছে আত্মসমর্পণ তথা যেভাবে তিনি চলার বিধান দিয়েছেন সেভাবে চলা। জীবনের কোনো ক্ষেত্রকে তিনি এই বিধানের বাইরে রাখেননি। অর্থাৎ কোনো ক্ষেত্রে মানুষকে স্বাধীনভাবে চলার অনুমতি দেননি। কারণ, সকল ক্ষেত্রে যদি এই বিধান মেনে চলা হয় এবং একটি ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে চলা হয় তাহলে সমস্ত জীবনে বিশৃংখলা দেখা দেবে। জীবনের একটি ক্ষেত্রে অসামঞ্জস্য কার্যকলাপ অন্যান্য সকল ক্ষেত্রের সামঞ্জস্য বিনষ্ট করবে।

এ বিষয়টি বিবেচনা করলে বুঝা যায়, মহান ও সর্বশক্তিমান স্রষ্টা আল্লাহ মানুষের মধ্যে যে সাহিত্যপ্রবণতা সৃষ্টি করেছেন তার চাহিদা পূরণ করার জন্যও বিধান দিয়েছেন। কুরআনে যেমন তিনি এই সাহিত্যপ্রবণতাকে সঠিক পথে চলার দিকনির্দেশনা দিয়েছেন তেমনি শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই এই প্রবণতাকে সঠিক পথে চলার ব্যবস্থা করেছেন। নবী তাঁর যুগের এক জাহিলী কবির কবিতার একটি চরণ "*আলা কুল্লু শাইয়িন মা খালাল্লাহু বাতিলু*" জেনে রাখো, আল্লাহ ছাড়া বাকি সবই মিথ্যা – উদ্ধৃতি দিয়ে বলতেন, এই কবির এই চরণটি সত্য। একদিন সাহাবী শারীদ (রা:)নবীর পেছনে সওয়ার ছিলেন। নবী তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি উমাইয়া ইবনে আবিসসাল্‌তের কোনো কবিতা জানো ? তিনি বললেন, জানি। আদেশ দিলেন, তাহলে একটি শোনাও। শারীদ (রা:) উমাইয়ার একটি কবিতা শোনালেন। বললেন, আর একটি শোনাও। তিনি আর একটি শোনালেন। বললেন, আর একটি। এভাবে একটি একটি করে একশ'টি কবিতা শোনালেন। অন্য একদিন সাহাবী আবু সাঈদ খুদরী(রা:)সাথে তিনি যাচ্ছিলেন '*আরজ*' এলাকা দিয়ে। পথে এক কবি তার (অশ্লীল) কবিতা আবৃত্তি করতে করতে চলছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেন, ধরো শয়তানটাকে অথবা আটক করো শয়তানটাকে। তারপর বললেন ঃ "*লাআঁই ইয়াম্‌তালিয়া জওফু রাজুলিন কাইহা খাইরুন লাহু মিন আইঁ ইয়াম্‌তালিয়া শি'রান*" অর্থাৎ মানুষের পেট কবিতায় ভর্তি থাকার চাইতে পুঁজে ভর্তি থাকা ভালো।

এভাবে নবী (সঃ) নিজেই সাহিত্যের দিক নির্দেশ করেছেন। বিগত চৌদ্দ'শ বছর ধরে মুসলমানরা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষায় যে সাহিত্যচর্চা করছেন সেখানে রাসূলের এই

দিকনির্দেশনাই মোটামুটি তাদের সামনে থাকে। এটাই তাদের জন্য আলোকবর্তিকা। তাই বিশ্বাসহীনতা, অনাচার, নৈরাজ্য তাদের সাহিত্যে আদর্শ হতে পারেনি। এদিক দিয়ে বিশ শতকের পৃথিবীতে সাহিত্য অঙ্গনে ইকবালই ইসলামী আদর্শের সবচেয়ে বেশী প্রতিনিধিত্ব করতে সক্ষম হয়েছেন।

এক. ইকবালের সাহিত্য পৃথিবীর সব দেশের সব মানুষের জন্য। তিনি কোনো বিশেষ দেশের বা বিশেষ গোষ্ঠীর ও জাতির জন্য সাহিত্য সৃষ্টি করেননি। মর্দে মুমিন তাঁর আদর্শ, মুসলমান জাতির একজন সদস্য হিসাবে নয়; বরং আল্লাহর নিষ্ঠাবান ও ন্যায়পরায়ণ বান্দা হিসাবে। জাতি বা ন্যাশান বর্তমান বিশ্বে যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, বিশেষ অঞ্চল, ভাষা, বর্ণ ও ট্রাডিশনের সাথে তাকে যেভাবে সংযুক্ত করা হয়, মুসলমান আসলে সে অর্থে কোনো জাতির নাম নয়। মুসলমান শব্দটিও এসেছে '*ইসলাম*' ও '*সালাম*' শব্দ থেকে, যার অর্থ হয় মহান সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা, তাঁর অনুগত হওয়া এবং তাঁর নির্দেশমতো জীবনের পথপরিক্রমা করা। এদিক দিয়ে বিচার করলে মুসলমানও সংকীর্ণ '*জাতি*' শব্দের গণ্ডির আওতায় পড়ে না। আর মুমিনের তো কোনো বিশেষ গোষ্ঠীভুক্ত হবার কোনো প্রশ্নই আসে না।

দুই. ইকবালের সাহিত্যে বিশ্বাসকে মানুষের সমাজ ও সভ্যতার মূল চালিকাশক্তি হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। জীবনের সৃষ্টি, প্রতিপালন ও লয় তিনটিই আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও ঈমানেরই ফল। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ছাড়া এ তিনটির কোনো অস্তিত্বই নেই।

তিন. মানুষ যে সভ্যতা গড়ে তুলেছে, যে সংস্কৃতির প্রাসাদ নির্মাণ করেছে, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনে যে শোষণ ও নিপীড়নের ধারাকে মানবিক মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে এবং সমাজব্যবস্থায় যে বৈষম্য, জুলুম, বিদ্বেষ ও স্বার্থপূজার প্রচলন করেছে ইকবাল তার পুনর্মূল্যায়ন করতে চান এবং তাকে নেকী, সততা, ইনসাফ ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে পুনর্গঠিত করার পরামর্শ দেন।

চার. ইকবাল ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে একটি ভারসাম্য বজায় রাখতে চান। ব্যক্তি যেন এত বেশী ক্ষমতার অধিকারী না হয়ে যায় যা তাকে ডিক্টেটরের আসনে বসিয়ে দেয় ; আবার সমাজ যেন ব্যক্তিস্বাধীনতার মূলোচ্ছেদ করে ব্যক্তিকে সমাজের একান্ত দাসে পরিণত করতে না পারে এদিকেও ইকবাল দৃষ্টি রেখেছেন।

পাঁচ. প্রত্যেক ব্যক্তি মূলত একটি স্বাধীন ও পূর্ণাঙ্গ সত্তা। তাকে সৃষ্টিই করা হয়েছে একটি উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য। এই লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে তার নিজস্ব গুণাবলীর বিকাশের মাধ্যমে তাকে উত্তরোত্তর অধিকতর যোগ্যতার অধিকারী হতে হবে। আল্লাহর দুনিয়ার কারোর সে বান্দা নয়। সে একমাত্র আল্লাহর গোলাম, আল্লাহ ছাড়া আর কারোর কাছে সে মাথা নত করে না। আল্লাহ ছাড়া দুনিয়ার সব কিছুর গোলামী অস্বীকার করার ব্যক্তিত্ব-ক্ষমতা ব্যক্তিকে পূর্ণাঙ্গ মানবিক গুণাবলীতে ভূষিত করে এবং এভাবেই সে দুনিয়ায় ও আখেরাতে সফলকাম হয়।

বলা যায়, সাহিত্য ক্ষেত্রে ইসলামী আদর্শ ও ভাবধারাকে ইকবাল কেবল পুনরুজ্জীবিতই নয়

প্রতিষ্ঠিতও করেছেন। আধুনিক বিশ্বে ফরাসী বিপ্লব ও রাশিয়ার কম্যুনিস্ট বিপ্লব সাহিত্যকে যে ভাবধারা সরবরাহ করেছে তা মানবতার জন্য কল্যাণকর হয়নি। সারা বিশ্বব্যাপী তা এক বিশ্বাসহীনতা এবং তা থেকে সৃষ্ট নৈরাজ্যের প্লাবন ডেকে এনেছে। সে ক্ষেত্রে ইকবালের সাহিত্যের আদর্শ মানুষকে বিশ্বাসী, সৎ, ন্যায়নিষ্ঠ ও কর্মঠ হবার প্রেরণা যোগাচ্ছে। তাই বিশ্বব্যাপী ইকবালের কদর বেড়ে যাচ্ছে। এই উপমহাদেশ ও এশিয়া-আফ্রিকার মুসলিম দেশগুলোর সীমানা পেরিয়ে শুধু ইংল্যাণ্ডে ও জার্মানীতেই নয়–ফ্রান্স ও রাশিয়াতেও ইকবালের সাহিত্য জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। কবির সমকালীন বিশ্ব তাঁর কবিতাকে যথার্থ মর্যাদা দেয়নি বলে কবি মোটেই ক্ষুব্ধ ছিলেন না ; বরং তিনি আশা প্রকাশ করেছিলেন যে, আগামী বিশ্ব তাঁর কবিতার মর্ম বুঝতে সক্ষম হবে এবং তাঁকে যথাযথ মর্যাদা দেবে। কবির এ আশা আজ পূরণ হয়েছে এবং হচ্ছে।

এক্ষেত্রে দুঃখের সাথে বলতে হয়, আমাদের দেশে ইকবাল সাহিত্যের বিশেষ কোনো চর্চা হয়নি। মনে হয় ইকবালের রাজনৈতিক আদর্শের একটা বাহ্যিক খোলসকে এখানে অনর্থক বড় করে দেখাবার প্রবণতা কাজ করেছে। কালের গতিময়তা ও চিরন্তনতায় তাঁকে বোঝবার চেষ্টা করা হয়নি। তাঁর সাহিত্যের আদর্শ যেখানে আজ বিশ্বসাহিত্যের আদর্শ হবার যোগ্যতায় অভিষিক্ত হতে চলেছে সেখানে আমরা তা থেকে দূরে থেকে শুধু নিজেদের ক্ষতির পসরা বাড়িয়েই চলবো।

সব শেষে বলবো, বাংলা ভাষায় ইকবাল চর্চা আমাদের সাহিত্যের কল্যাণ ও শ্রীবৃদ্ধিই করবে।

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইকবালের চিন্তাধারা

প্রফেসর এ. এফ. এম. হোসাইন আহমদ

একথা স্বল্পসংখ্যক লোকেরই জানা আছে যে, বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও কবি আল্লামা ইকবাল একমাত্র ব্যক্তি যিনি অর্থনীতির উপর উর্দূ ভাষায় সর্বপ্রথম বই লিখেছেন এবং প্রকাশ করেছেন। ইকবাল ১৮৯৯ সালে দর্শনশাস্ত্রে এম. এ. পাস করার পর প্রথমে লাহোর ওরিয়েন্টাল কলেজে এবং পরে লাহোর সরকারী কলেজে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত অধ্যাপনা করেন। ঠিক ঐ সময়ের মধ্যে তিনি ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে *'হিমালা'*, *'তারানায়ে-হিন্দী'*, *'নয়া শেওলা'*, *'অসবীরে দরদ'*সহ বহু কবিতা রচনা করে সর্বস্তরের জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অল্প সময়ের মধ্যে তিনি কবি হিসেবে পরিচিতি লাভ করে সকলের প্রশংসা অর্জন করেন। তৎকালীন ভারত উপমহাদেশের সর্বত্র এবং সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে যখন তাঁর কাব্য সাহিত্য নিয়ে বিশেষভাবে আলোচনা-পর্যালোচনা চলছিল, ঠিক সে সময় (১৯০৩ সালে)ইকবাল অর্থনীতির উপর উর্দূ ভাষায় লেখা তাঁর প্রথম বই প্রকাশ করেন। বইটির নাম দিয়েছিলেন *"ইলমুল ইকতিছাদ"* (অর্থনৈতিক দর্শন)। তাঁর শিক্ষক অধ্যাপক আরনল্ড এবং মাওলানা শিবলী নোমানীসহ বহু বন্ধু-বান্ধব ও গুণগ্রাহী ব্যক্তিত্ব এ বই লিখতে ইকবালকে শুধু উৎসাহিতই করেননি বরং বইয়ের মৌলিক বিষয়ের উপর প্রয়োজনীয় সহায়তা করে তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। ইকবাল নিজেও এ বইকে তাঁর জ্ঞানচর্চা ও চিন্তা-চেতনার অন্যতম ফসল বলে উল্লেখ করেছেন।

এ বই প্রকাশের অল্প দিনের মধ্যে বইয়ের সব কপি বিক্রি হয়ে যায় এবং বাজারে এর কোনো কপি আর পাওয়া গেল না। এমনকি ইকবাল নিজেও পরবর্তী সময়ে এর কোনো কপি পাননি। তিনি নিজে যদি এ বইয়ের আলোচনা না করতেন তা হলে সম্ভবতঃ কেউ তাঁর এ মূল্যবান গ্রন্থের খবরই পেতো না। ইকবাল একাডেমী, লাহোর এ মূল্যবান গ্রন্থের একটি কপি বহু চেষ্টা-সাধনার পর বের করতে সক্ষম হয় এবং পরে সুন্দরভাবে নতুন সংস্করণ প্রকাশ করে। এটা সত্যিই গৌরবের বিষয় যে, ইকবাল তাঁর জীবনের প্রথম পর্যায়ে কাব্যচর্চা এবং অধ্যাপনার মাঝেও মানব-জীবনের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক *"অর্থনীতির"* উপর বই লিখে দেশ ও জাতিকে মূল্যবান উপহার দিয়ে গেছেন।

এ বইর নতুন সংস্করণ বিভিন্ন দিক দিয়ে গুরুত্বের দাবী রাখে। *প্রথমতঃ* চলতি শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ দার্শনিক, কবি ও চিন্তাবিদের অর্থনীতি সম্পর্কে আলোচনা থেকে আমরা যে বঞ্চিত ছিলাম তা পূরণ করা সম্ভব হয়েছে। *দ্বিতীয়তঃ* - যে সব সুধীজন ইকবালের জীবন, দর্শন ও চিন্তা-চেতনা সম্পর্কে লিখবেন, গবেষণা করবেন, তারা এ বই থেকে ইকবালের ব্যক্তিত্ব, জ্ঞান-দর্শন ও চিন্তাধারা সম্পর্কে এক ব্যাপক অভিজ্ঞতা লাভ করতে সক্ষম হবেন। *তৃতীয়তঃ* ইকবাল শুধু যে কাব্য ও সাহিত্যচর্চা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন তা নয়, বরং মানব-জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগ সম্পর্কে চিন্তা করেছেন, গবেষণা করেছেন এবং প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের বিভিন্ন

আমেরিকার অনেক অর্থনীতিবিদই চ্যালেঞ্জ করে এই ভ্রান্ত মতবাদ প্রত্যাখ্যান করেছেন। কার্ল মার্কসসহ তার অনুসারী আরো অনেকেই এ চিন্তাধারার ঘোর বিরোধিতা করেছেন। তবুও বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত ঐ মতবাদই কার্যত কার্যকর ছিল।

আল্লামা ইকবাল নিজেও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ঐ ইউরোপীয় চিন্তাধারার চরম বিরোধিতা করে একে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তবে, তাঁর এ বিরোধিতা ও অন্যদের বিরোধিতার মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য বিদ্যমান। কার্লমার্কস তো এই বলে ঐ মতবাদ প্রত্যাখ্যান করেছেন যে, অর্থনীতির ঐ চিন্তাধারা ধনীগোষ্ঠী ও সম্পদশালীদের স্বার্থ রক্ষার একটা গোপন ষড়যন্ত্রমাত্র। এটা ব্যক্তিস্বার্থ রক্ষা করা এবং অন্যদেরকে দুর্বল করে লুটপাট করার একটা সহজ অপকৌশল ছাড়া আর কিছু নয়। অবশ্য, মানবতার দরদ ও সহানুভূতির বিষয় চিন্তা করে অনেকেই এ *Free Economy* (অবাধ-অর্থনীতি)–এর বিরোধিতাও করেছেন।

তবে, এ বিষয়ে ইকবালের চিন্তা-চেতনা আরো ব্যাপক ও সুসংগঠিত। মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব। এক মহান আদর্শকে সমাজজীবনে প্রতিষ্ঠা করাই তার একমাত্র উদ্দেশ্য এবং বিশ্ব মানবতার কল্যাণসাধন তার জীবনের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত। কাজেই, অর্থনীতি ও মানব-জীবনের অন্যান্য অধ্যায়ের মতো মানব কল্যাণের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হতে হবে। অর্থ-সম্পদ যদি এ উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ হয় তবে ঐ সম্পদ থাকার চেয়ে না থাকাই শ্রেয়। সম্পদ উৎপাদন, ভোগ, বণ্টন--- সবই মানব কল্যাণ ও তার সংস্কৃতির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ইকবাল বলেন, "*কোন সম্পদ যদি মানব-জীবনের কল্যাণ নিশ্চিত করতে না পারে বা তার সাংস্কৃতিক জীবনকে প্রভাবিত করতে ব্যর্থ হয় সে সম্পদের কোন গুরুত্ব নেই।*" ইকবালের এ অকৃত্রিম চিন্তাধারার মূল লক্ষ্য ছিল পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার অধীনে ব্যক্তিস্বার্থ রক্ষা এবং অহেতুক আমোদ-প্রমোদের উদ্দেশ্যে অঢেল অর্থ ব্যয় করার প্রবণতা থেকে নতুন প্রজন্মকে সতর্ক করে দেয়া। ইকবাল বলেন ঃ "*এমন কিছু সম্পদ আছে যেগুলো মানুষকে কিছুটা কল্যাণ বা স্বার্থ দিয়ে ক্ষণস্থায়ী আনন্দ দান করতে পারে। তবে ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, এ ক্ষণস্থায়ী আনন্দের উদ্দেশ্যে সম্পদের লোভ-লালসা বহু পুরাতন সভ্যতাকে ধ্বংস করে দিয়েছে। আমাদের বর্তমান সভ্যতাও দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে যদি আমরা বিশ্ব মানবতার কল্যাণের উদ্দেশ্যেই সম্পদের উৎপাদন, ভোগ ও বণ্টন নিশ্চিত করতে পারি।*" ইকবালের অর্থনৈতিক দর্শনের মূল কথাই হচ্ছে সম্পদ ও এর বণ্টন মানব কল্যাণের উদ্দেশ্যেই হতে হবে। দ্বিতীয় যে বিষয়ের প্রতি ইকবাল গুরুত্ব দিয়েছেন তা হলো দারিদ্য। প্রকৃতপক্ষে ইকবাল দারিদ্র্যের বড় দুশমন ছিলেন। তাঁর অন্তরের কথা এটাই ছিল যে, মানুষকে দারিদ্র্যের ছোবল থেকে রক্ষা করতেই হবে। প্রাচ্যে এবং পাশ্চাত্যে, শেখ সাদী এবং সেক্সপীয়রের মতো বহু কবি-সাহিত্যিক দারিদ্র্যকে সৃষ্টিকর্তার আশীর্বাদ হিসেবেই গণ্য

করেছেন। ইকবাল যদিও আধ্যাত্মিকতার পূজারী ছিলেন, কিন্তু সম্পদ ও দারিদ্র্য সম্পর্কে তাঁর এক বৈজ্ঞানিক ও বাস্তব দর্শন ছিল। 'সম্পদ যদিও মানুষের চরম উদ্দেশ্য নয় তবুও দারিদ্র্যকে আশীর্বাদ হিসেবে গ্রহণ করতে ইকবাল প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁর মতে, দারিদ্র্য মনুষ্যত্ব ও বিশ্ব মানবতার চরম শত্রু। স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ ছাড়া ব্যক্তিসত্তার বিকাশ যেমন সম্ভব নয়,তেমনি আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা ছাড়া মানবতার পূর্ণতা লাভও সম্ভব নয়। দার্শনিক এরিস্টটল মানবসভ্যতার জন্য মানুষের উপর মানুষের প্রভুত্ব ও কর্তৃত্বের পক্ষে ওকালতি করেন। অথচ বিশ্ব মানবতা পরাধীনতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে চায়। প্রকৃতপক্ষে মানবসভ্যতার ক্রমবর্ধমান উৎকর্ষতার জন্য বিশ্বের জনগণকে অবশ্যই দারিদ্র্য থেকে মুক্ত করতে হবে। ইকবাল বলেন, *দারিদ্র্য মানুষের ইচ্ছাশক্তি, কর্মপ্রেরণা এবং আত্মিক শক্তির উপর এমনভাবে প্রভাব বিস্তার করে যে, ধীরে ধীরে তার চরিত্র, সভ্যতা-সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে দেয় এবং পরিশেষে তার অস্তিত্বও হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়ে।*" বিংশ শতাব্দীর মানুষ দার্শনিক এরিস্টটলের ভ্রান্ত মতাদর্শকে উপেক্ষা করে এ ধরাপৃষ্ঠ থেকে দারিদ্র্যকে দূর করার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছে। ইকবাল দারিদ্র্যকে "*উম্মুল খাবায়েছ*" (অনাসৃষ্টির মূল) বলে উল্লেখ করে বলেন, এ দারিদ্র্যই সকল দুর্নীতি ও অন্যায়ের কেন্দ্রবিন্দু। ফলে দারিদ্র্য দূরীকরণের মাধ্যমে সমাজ থেকে চুরি, ডাকাতি, হাইজ্যাক, জুয়া, সুদ, ঘুষসহ অন্য সকল অপরাধ বন্ধ হবে এবং এ পৃথিবী বেহেশতের বাগিচায় রূপান্তরিত হয়ে শান্তি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত হবে।

আল্লামা ইকবাল ভারতবর্ষ ও ইংল্যাণ্ডের মধ্যেকার তৎকালীন অসম বাণিজ্যের পর্যালোচনা করে ভারতবাসীকে এই বলে হুশিয়ার করে দিয়েছিলেন যে, শুধু রাজনৈতিক শাসন নয়; বরং ইংরেজদের অর্থনৈতিক শোষণ হতেও তোমাদের (ভারতবাসী)-কে সতর্ক হতে হবে। কারণ, এ অসম বাণিজ্যের ফলে ভারতবর্ষকে ক্রমশ দুর্বল ও পঙ্গু করে দেয়া হচ্ছে। অসম বাণিজ্যের ফলে একটা জাতিকে সহজে করতলগত বা অধীনে রাখা সম্ভব হয়। ভারতবর্ষে প্রয়োজনীয় শিল্প গড়ে উঠেনি, ফলে ভারতবর্ষের রফতানীর চেয়ে আমদানী করতে হয় অনেক বেশী। এ জন্য ভারতবাসী নিজ প্রয়োজন মেটাতে ইংরেজদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। ফলে, তারা প্রতিনিয়তই আরো দরিদ্র হয়ে চলছে। ইকবাল ভারতের শিক্ষা, সভ্যতা, সংস্কৃতি, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও রাজনৈতিক দর্শনের সাথে অর্থনৈতিক জীবন সম্পর্কে যে স্পষ্ট ও নির্ভুল চিন্তা করেছেন তা তাঁর উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যায়। ইকবাল আরো বলেন, ভারতের ইংরেজ শাসক, তাদের কর্মচারী এবং দেশ রক্ষাবাহিনীর জন্য যে খরচ হয় তা এদেশের মানুষকেই বহন করতে হয়। ফলে, ভারতবাসীর উপরই অর্থনৈতিক চাপ আরো বেশী বেশী করে পড়ছে। অধিকন্তু বারবার বিদেশীদের হামলায় আমাদের সম্পদ লুটপাট, মোগল রাজা-বাদশাহদের বিলাসিতা, অশিক্ষিত জনগোষ্ঠী এবং অর্থনৈতিক জীবন সম্পর্কে উদাসীনতার কারণে আমাদের সম্পদ পর্যাপ্ত ছিল না। যা আছে তারও সিংহভাগ ইংরেজরা তাদের দেশে নিয়ে যাচ্ছে।

ভূমি ও তার উৎপাদনের উপর পর্যালোচনা করে ইকবাল বলেনঃ "*কোন ব্যক্তি, পরিবার,*

গোষ্ঠী বা তথাকথিত জমিদার ভূমি বা তার উৎপাদনের মালিক হতে পারে না। বরং সমগ্র জাতি অথবা সেই ব্যক্তি এ জমি ও তার উৎপাদনের মালিক যে কষ্ট করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উৎপাদন করে থাকে।" মূলত ইকবাল সম্পদের ব্যক্তিমালিকানার বিরোধী ছিলেন না। কিন্তু জমির মালিকানার সুবাদে জমিদার-জোতদারগণ কৃষকদের উপর যে জুলুম-অবিচার করছে, ইকবাল তাকে সমর্থন করতে পারেননি। এ জন্য তিনি আকবর ইলাহাবাদীর মতো তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ *'বাঙ্গে দারা'* ও *'জাবেদনামায়'* (জমিন আল্লাহর), এই বলে জমিনে ব্যক্তিমালিকানার বিরুদ্ধে অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে তাকে প্রত্যাখ্যান করার পক্ষে মতামত পেশ করেছেন। এভাবে "বালে জিবরীলে"-ও তিনি বলেন ঃ

ده خدایا! یہ زمین تیری نہیں میری نہیں
تیرے آبا کی نہیں - تیری نہیں - میری نہیں

(আল্লাহর শপথ, এ জমিন তোমার আমার কারো নয়। তোমার পিতামহসহ অন্য কারো নয়)। এককথায়,ইকবাল জমিদারী প্রথার চরম বিরোধী ছিলেন। এ প্রসংগে তিনি বলেন, মানবসভ্যতার আদিকালে সম্পদ বা জমিনের ব্যক্তিমালিকানার কোন অস্তিত্বই ছিল না। শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী সকলে মিলে উৎপাদন করে প্রত্যেকে প্রয়োজনমতো বণ্টন করে নিতো, *"এটা আমার ওটা তোমার"* এ ধরনের কোন বণ্টন ব্যবস্থাই ছিল না। সে সময় অভাব বলতেও কিছু ছিল না। চুরি, ডাকাতি ছিল না। প্রত্যেক সম্প্রদায় ও গোত্র বন্ধুত্বের পরিবেশে নিরাপত্তার মধ্যেই দিন যাপন করতো। এ ধরনের পরিবেশ ভারত উপমহাদেশের কোন কোন অঞ্চলে আজও পরিলক্ষিত হচ্ছে। বর্তমান যুগের বহু দার্শনিক ও চিন্তাবিদ মানব ইতিহাসের এ প্রাচীন সভ্যতাকে আজও উত্তম, অকৃত্রিম বলে বিশ্বাস করছেন। সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে সকলেই সমান। সুতরাং সম্পদেও সকলের সম-অধিকার থাকবে। কেউ কারো অধীন হবে না। জমিদার ও কৃষক, প্রভু ও দাস---- এ পার্থক্য সত্যই মানবসভ্যতার জন্য অপমানজনক। সম্পদের ব্যক্তিমালিকানা যেহেতু সকল দুর্নীতি ও অপরাধের কেন্দ্রবিন্দু, সেহেতু মানবসভ্যতার ক্রমবর্ধমান উৎকর্ষতার জন্য ব্যক্তিমালিকানার ধারণা থেকে ব্যক্তি, সমাজ ও জাতিকে উদ্ধার করতে হবে। অন্তত জমিনের বেলায় তো নিশ্চয়ই। কারণ, এটা আল্লাহর দান। এতে কোন মানুষের অবদান নেই। সুতরাং এতে সমাজের সকলের সমান অধিকার বিদ্যমান।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে : "জমিন আল্লাহর"1 সুতরাং এ নিয়ে কারো মতদ্বৈততা বা মতবিরোধ থাকতে পারে না। কুরআনে আরো বলা হয়েছে যে,...ليس للانسان মানুষ যার জন্য কষ্ট করেনি, শ্রম দেয়নি সেখানে তার কোন হক নেই। এ পর্যায়ে ইকবাল বলেন, কৃষক-মজুর কষ্ট করে যে উৎপাদন করে তার সিংহভাগ জোতদার-জমিদার নিয়ে নেবে--- এটা হতে পারে না। তারা তো উৎপাদনে শ্রম দেয়নি, কষ্ট করেনি। ফলে, উৎপাদনে তাদের দাবী অবৈধ। তদুপরি জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত কারণে বাড়তি চাহিদা পূরণ ও অভাব দূর করার জন্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা দরকার। এক্ষেত্রে কৃষক-মজুর অনাবাদী জমি আবাদ করে এবং আবাদী জমিতে আরো বেশী উৎপাদনের আপ্রাণ চেষ্টা করে। এখানেও জোতদার-জমিদার অতিরিক্ত উৎপাদন দাবী করে যা সম্পূর্ণ বে-ইনসাফী ছাড়া আর কিছু নয়। এভাবে জমিদাররা

কৃষক-মজুরদের উপর জুলুম ও অন্যায় হস্তক্ষেপ করে সহজেই সম্পদশালী হয়ে উঠে। ফলে, সমাজে ধন-বৈষম্য সৃষ্টি হয় এবং বিশৃংখলার জন্ম নেয়। এ জন্য সমাজের বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর একটি সচেতন অংশ জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করে জমিতে সামাজিক মালিকানার পক্ষে তাদের মতামত দিয়ে থাকেন। কারণ বাস্তবে দেখা গেছে যে, এ জমিদারী ও ব্যক্তিমালিকানার কারণেই সমাজে যতসব বে-ইনসাফী মাথাছাড়া দিয়ে উঠে--- যা দেশ ও জাতির জন্য মোটেই মঙ্গলজনক হতে পারে না।

এভাবে ইকবাল শিল্প-শ্রমিকদের দুঃখ-দুর্দশা দেখে উর্দূ ও ফার্সী ভাষায় অনেক কবিতা রচনা করেন। ইকবাল শ্রমজীবী মানুষকে ভালবাসতেন এবং তাদের প্রতি জুলুম-নির্যাতন ও অর্থনৈতিক শোষণ দেখে ব্যথিত হতেন। তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ বাঙ্গে দারায় শিরোনামে শ্রমজীবী মানুষের দুঃখ-দুর্দশা তুলে ধরে পুঁজিবাদীদের জুলুম-নির্যাতনের কাহিনী বর্ণনা করেছেন। ইকবাল শিল্প-শ্রমিক ও অন্যান্য শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থ রক্ষার পক্ষে জোরালো ভাষায় বক্তব্য রেখেছেন, প্রতিকারের জন্য কলম ধরেছেন। অন্যদিকে শিল্পপতি ও পুঁজিবাদীদের বিরুদ্ধে সমালোচনা করেছেন। তাদেরকে জুলুম-অত্যাচার থেকে নিবৃত্ত করারও চেষ্টা করেছেন।

পাশ্চাত্যের কোন কোন অর্থনীতিবিদ একটা অদ্ভুত-ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করতেন। তাদের মতে একটা শিল্প প্রতিষ্ঠানে মুনাফা যা-ই হোক না কেন, এতে শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধির কোন যুক্তি নেই। কারণ, শিল্প প্রতিষ্ঠানে যে মুনাফা বৃদ্ধি পায় তা শিল্পপতির প্রশাসনিক যোগ্যতার ফল। শ্রমিকদের মজুরী যেহেতু পুর্ব থেকেই নির্ধারিত, কাজেই মুনাফা বৃদ্ধিজনিত কারণে শ্রমিকদের মজুরীবৃদ্ধির দাবী সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধির জন্য তো মুনাফা বাড়েনি। কাজেই শ্রমিকদের মজুরী বৃদ্ধির প্রশ্ন অর্থশাস্ত্রের নীতিবিরোধী। আমেরিকার অর্থনীতিবিদ ওয়াকার ইংরেজ অর্থনীতিবিদদের উপরোক্ত মতামতের যেমন বিরোধিতা করেছেন তেমনি ইকবালও কৃষক-শ্রমিকদের স্বার্থবিরোধী ঐ মতবাদকে প্রত্যাখ্যান করে বলেন : "*অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত রেখে শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি করা সাধারণত শ্রমিকদের শ্রম দক্ষতা বৃদ্ধি এবং অধিক কৃষিজাত কাঁচামাল সরবরাহ দ্বারাই সম্ভব। শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে মুনাফা বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু এ অতিরিক্ত মুনাফার অংশ জমিদার, শিল্পপতি এবং পুঁজিপতি কেউই পাওয়ার যোগ্য নয়। কারণ কৃষিজাত দ্রব্য বৃদ্ধিতে জমিদারদের কোন অবদান নেই; বরং কৃষকরা অধিক পরিশ্রম করেই এ অতিরিক্ত উৎপাদন করেছে। অন্যদিকে, যেহেতু মূলধন বা মূলধনী দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায়নি । সেহেতু, সুদ বৃদ্ধি করে পুঁজিপতিদেরকে অতিরিক্ত মুনাফার অংশ দেয়াও যুক্তিসঙ্গত নয়। আবার শিল্পপতি যেহেতু অন্য কোন শিল্প-কারখানা প্রতিষ্ঠা করেনি; বরং পুরাতন শিল্প প্রতিষ্ঠানেই শ্রমিকদের দক্ষতা, যোগ্যতা ও অধিক সময় ব্যয় করার ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে মুনাফা বৃদ্ধি পেয়েছে। কাজেই এ অতিরিক্ত মুনাফায় শিল্পপতিদের দাবী ন্যায্য হতে পারে না। অবশ্য, শিল্পপতিগণ যদি শিল্প প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধি করে উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে মুনাফা বৃদ্ধি করে তবেই তারা ঐ অতিরিক্ত মুনাফার দাবী করতে পারে। অন্যথায়, যেহেতু শ্রমিক-মজুরদের অধিক পরিশ্রমের ফলে*

উৎপাদন বৃদ্ধিজনিত কারণে মুনাফা বৃদ্ধি পেয়েছে সেহেতু এ মুনাফায় শ্রমিক-মজুরদের দাবীই অগ্রগণ্য। এতে জমিদার, পুঁজিপতি ও শিল্পপতিদের কোন দাবী চলতে পারে না।"

আল্লামা ইকবালের "ইলমুল ইকতিছাদ" (অর্থনৈতিক দর্শন) বইটি প্রকাশিত হবার পর গত ৭০–৮০ বছরের মধ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অর্থনীতিতে এক ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর চীনসহ পৃথিবীর অনেক দেশ এই ভ্রান্ত নীতি গ্রহণ করে। আবার বহু দেশ চাপের মুখে এ নীতি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। ইকবালের চিন্তাধারা ও সমাজতন্ত্রের নীতির মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে মিল খুঁজে পাওয়া যায় বলে অনেকেই ইকবালকে সমাজতন্ত্রী বলে আখ্যায়িত করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে শিল্পপতি, পুঁজিপতি এবং জমিদারদের অন্যায়-অত্যাচার, শাসন-শোষণের মোকাবেলায় কৃষক-শ্রমিক ও মজুরদের ইনসাফ ও ন্যায়ভিত্তিক স্বার্থ রক্ষা করাই ছিল ইকবালের অর্থনৈতিক দর্শনের মূল লক্ষ্য। তৎকালীন ভারত উপমহাদেশের কৃষক-শ্রমিক-মজুরদের অর্থনৈতিক দুরবস্থা দূরীকরণ ও বেকারত্বের অবসানকল্পে ইকবাল তাঁর অর্থনৈতিক দর্শনকে এমনভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন, যা বিভিন্ন সময়ে দুনিয়ার বিভিন্ন দেশেও প্রযোজ্য হতে পারে। তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন যে, দু'চারটি উন্নত দেশ ছাড়া দুনিয়ার বাকী দেশগুলোতে যদি কোন শ্রমিক-কৃষক বেকার হয়ে পড়ে। তবে, তার সচ্ছলতা ফিরিয়ে আনতে বা তার রুজী-রোজগারের জন্য কেউই এগিয়ে আসে না। সরকার বা অন্য কোন সংস্থা তার ছেলেমেয়ে, পরিবার-পরিজনের জন্য সহানুভূতির হাত সম্প্রসারিত করে এগিয়ে আসে না। কোন কৃষক যদি একবার বিপদের সম্মুখীন হয়, কোন শ্রমিক বেকার হয়ে পড়ে তবে তারা মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে; আর আত্মিকভাবে খুদীর অন্তর্নিহিত শক্তি হারিয়ে ফেলে। সাথে সাথে নৈরাশ্য, অলসতা, দুশ্চিন্তা তাদের জীবনকে দুর্বিষহ করে তোলে। বস্তুত দারিদ্র্য মানুষের রূহানী শক্তির চরম দুশমন। তদুপরি শ্রমিক-কৃষকদেরকে ন্যূনতম মজুরী দেয়া না হলে তারা কাজের প্রতি আগ্রহী হয় না, কাজে ফাঁকি দেয়ার চেষ্টা করে, সময় ক্ষেপণ করে। অবশেষে অলসতার কারণে কর্ম-উদ্যম হারিয়ে ফেলে, যার কারণে কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে চরম বিশৃংখলা, অরাজকতা এমনকি ধ্বংসও টেনে আনে। এমনিভাবে গোটা সমাজব্যবস্থায় অর্থনৈতিক বিপর্যয় নেমে আসে।

ইকবালের দৃষ্টিতে কৃষক-শ্রমিকের আর্থিক উন্নতি মানে শিল্প ও কৃষির উন্নতি তথা গোটা সমাজের অর্থনৈতিক অগ্রগতি। সুতরাং কিভাবে কৃষক-শ্রমিকের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়--- এ সম্পর্কে ইকবাল বিভিন্ন মতামত তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। এক দল বিশেষজ্ঞের মতে, শিল্প ও কৃষি আইন এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যাতে সর্বমহলের স্বার্থ ও অধিকার সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়। অন্য দলের অভিমত হচ্ছে এই যে, শ্রমিক-কৃষক নিজেদের মধ্যে সাহায্য- সহানুভূতির হাত সম্প্রসারিত করবে এবং সমবায়ের ভিত্তিতে শিল্প প্রতিষ্ঠান ও কৃষি সমবায় খামার সৃষ্টি করবে, যাতে লাভ বা মুনাফা, পুঁজিপতি, শিল্পপতি বা জমিদারদের পকেটে না গিয়ে তাদের হাতেই আসবে। তৃতীয় মতামত হচ্ছে পুঁজিপতি, শিল্পপতি ও জমিদারদের সাথে কৃষক-শ্রমিকদের সম্পর্ক উন্নত করতে হবে। পরস্পরের

মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ এবং সহানুভূতির ভাব সৃষ্টি করতে হবে। উভয়ের কাছে একথা স্পষ্ট করে তুলে ধরতে হবে যে, সর্বস্তরের জনগণের উন্নতির উপরই সমাজের উন্নতি নির্ভর করে এবং সমাজে কোন শ্রেণীর বা গোষ্ঠীর দুর্বলতা বা অধঃপতনের কারণে গোটা সমাজে বিপর্যয় নেমে আসতে পারে। চতুর্থ মতামত হচ্ছে কৃষক-শ্রমিকদের বিদেশে পাঠানো হবে। এতেকরে তারা পেশাগত দক্ষতা অর্জন করে তাদের অবস্থার উন্নতি করতে সক্ষম হবে।

কৃষক-শ্রমিক ও মজুরের স্বার্থ রক্ষা এবং আর্থিক উন্নতির জন্য উপরোক্ত চারটি মতামতকে সামনে রেখে ইকবাল যে বিষয়ের প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন তা হচ্ছে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা। ইকবালের মতে, কোন দেশ বা জাতির দুঃখ-দুর্দশা ও আর্থিক দেউলিয়াপনার মূল কারণ হচ্ছে শিক্ষার অভাব। এ জন্য সার্বজনীন সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থা চালু করতে হবে– বিশেষ করে দেশের অবহেলিত কৃষক-শ্রমিকদের তাদের স্বীয় কর্মকাণ্ডে প্রয়োজনীয় শিক্ষাদানের সুব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। এভাবে কৃষক-শ্রমিকদের বিদ্যা-বুদ্ধি, চিন্তা-ভাবনা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে। ফলে, তারা যন্ত্রের ব্যবহার সহজ করে তুলবে এবং নতুন নতুন যন্ত্রের আবিষ্কার করতেও সক্ষম হবে এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাবে এবং দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নতি লাভ করাও সহজতর হয়ে উঠবে। অন্যদিকে শিক্ষালাভের ফলে তারা মদ্যপানসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজ থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রেখে চারিত্রিক উন্নতিও লাভ করতে পারবে।

রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হবার ১৪–১৫ বছর পূর্বে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ধারণা খুবই ক্ষীণ ছিল– অন্যদিকে ইউরোপ-আমেরিকার বহু অর্থনীতিবিদের চিন্তায়ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের কোন ধারণাই জন্মলাভ করতে পারেনি। ঠিক তখন ১৯০৩ সালে নওজওয়ান ইকবাল সম্পদ ও তার বণ্টন সম্পর্কে তাঁর মতামত সুস্পষ্ট করে তুলে ধরে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন, সম্পদ ব্যবহারের মূল লক্ষ্য হলো সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভিত্তি মজবুত করা। এতে করে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি উপকৃত হবে এবং সমাজও সামগ্রিকভাবে উন্নত হবে। এটাই হচ্ছে "*ইলমুল ইকতিছাদ*" বইয়ের মূল বক্তব্য। ইকবালের ভাষায়ঃ "বর্তমান যুগের প্রত্যেক বিজ্ঞ অর্থনীতিবিদের অবশ্যই খুঁজে বের করতে হবে যে, কোন্ পন্থায় ও নীতিতে সম্পদ ব্যবহার করলে সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভিত্তি মজবুত হবে, জনগণের দৈহিক ও চারিত্রিক উন্নতি লাভ সম্ভব হবে এবং সামগ্রিকভাবে দেশের রাজনীতি ও অর্থনীতি স্থিতিশীল হয়ে জাতীয় সমৃদ্ধি নিশ্চিত হবে। এসব বিজ্ঞ অর্থনীতিবিদের অবশ্যই ঐ সব পন্থা ও নীতি বর্জন করতে হবে যেগুলো সম্পদ উৎপাদনে বাধা সৃষ্টি করে এবং যা সভ্যতা-সংস্কৃতি ও উন্নত চরিত্রের পরিপন্থী।" ইংল্যাণ্ডে এই সময় (১৯০৩ সাল) মদ্যপানে বাৎসরিক ২ মিলিয়ন ৬০ কোটি টাকা খরচ হয়। এ টাকা যদি অন্যভাবে কোন ভাল শিল্পে ব্যবহার হতো, তবে দেশের আর্থিক উন্নতিতে প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়তো। বর্তমান যুগে এমন একজন দার্শনিকের প্রয়োজন যিনি বিচক্ষণতার সাথে "*ইলমুল ইকতিছাদ*"-এর উপরোক্ত দাবী পূরণ করতে পারেন।

ইকবালঃ ক্ষণজন্মা দার্শনিক, এক বিরল ব্যক্তিত্ব

অধ্যাপক আবু বকর রফীক

ইকবাল মুসলিম উম্মাহর এক বিরল ব্যক্তিত্ব। যিনি বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে শুধু যে ভারতবর্ষের মুসলমানদেরকে অধঃপতনের নিদ্রা থেকে জাগ্রত হওয়ার আহবান জানিয়ে তাদের অন্তরে স্বাধীন ব্যক্তিসত্তা ও স্বাধীন জাতিসত্তার বিরল অনুভূতি জাগ্রত করেছিলেন তা নয়, বরং স্থান-কাল-ভাষা ও বর্ণ নির্বিশেষে সকল মুসলিম ব্যক্তির জন্য রেখে গেছেন এক অনুপম আদর্শের সন্ধান এবং এক সঠিক দিকনির্দেশনা। আল্লামা ইকবাল ইহলোক ত্যাগ করেছেন সুদীর্ঘ ৫০ বছরেরও অধিক সময় অতিবাহিত হয়ে গেল, তবুও তাঁর কাব্য এবং দর্শনকে কেন্দ্র করে প্রাচ্য-প্রতীচ্যে পরিচালিত গবেষণা প্রকল্প ও গবেষকদের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চল্‌ছে এবং তার সাথে সাথে বেড়ে চলেছে তাঁর গুণগ্রাহীর সংখ্যাও। অন্য সব কবি-সাহিত্যিকের ক্ষেত্রে এ প্রশ্ন উত্থাপনের অবকাশ থাকে যে, তাঁর কাব্য ও সাহিত্যের উপজীব্য কি ? জীবন ও জগত *[Art for life's sake]* না সাহিত্যের জন্য সাহিত্যচর্চা *[Art for art's sake]*। কিন্তু আল্লামা ইকবালের সাহিত্যকে নিয়ে এহেন প্রশ্ন অবান্তর। কারণ,মূলতঃ তিনি একজন কবি হলেও তিনি কাব্যকে বাহন বা অবলম্বন করে পেশ করেছেন একটি অমূল্য দর্শন। যে দর্শনের মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে, আসলে *'মুমিন' বা 'মুসলিম'*।

তাঁর কাব্যের বিশাল মহাসমুদ্র জুড়ে বিভিন্ন আঙ্গিকে তিনি যে বিষয়টি প্রত্যেক মুমিনের নিকট তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছেন তা হচ্ছে তুমি কে তা জানার চেষ্টা কর। তোমার মর্যাদা ও দায়িত্ব কি ? তুমি আগে কি ছিলে, এখন কি হয়ে গেলে এবং কেন ? এসব কারণে আল্লামা ইকবালকে আখ্যায়িত করা হয়েছে একজন দার্শনিক হিসেবে। তবে তিনি ছিলেন এক ভিন্নধর্মী দার্শনিক। তাঁর বিরল কাব্য প্রতিভা ও কাব্যভাণ্ডার তাঁকে অভিষিক্ত করেছে *"শায়েরে মাশরিক"* প্রাচ্যের কবি -এর মহাসম্মানিত আসনে। কিন্তু তিনি ছিলেন এক ভিন্নধর্মী কবি। এখানে স্মর্তব্য যে, *"প্রাচ্য"* পরিভাষাটি সাধারণ ইসলামী জগতেরই সমার্থক। সে হিসেবে গোটা মুসলিম বিশ্বের কবি হিসেবে তাঁর উপাধিটি যথার্থই হয়েছে। তাঁর বাস্তবধর্মী দর্শন যা মানুষকে সত্যের দিশা দান করেছে—তাঁকে ভূষিত করেছে *"হাকীমুল উম্মত"* উপাধিতে এবং মুসলমানদের জন্য একটি স্বাধীন আবাসভূমি গঠনের পরিকল্পক হিসেবে। তাঁর মৃত্যুর এক দশক পর যখন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তখন তিনি আখ্যায়িত হয়েছিলেন *"পাকিস্তানের স্বপ্ন দ্রষ্টা"* হিসেবে। এসব উপাধি তাঁর জন্য যথার্থ এবং অতিশয়োক্তি বিবর্জিত স্বতঃস্ফূর্ত জাতীয় স্বীকৃতি।

ইকবাল চিন্তাধারার মৌলিক দিক

আল্লামা ইকবালের দর্শনের প্রধান ও উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে তিনি সকল মুমিনের কাছে আত্মপরিচয়, আত্মোপলব্ধি ও আত্মবিশ্বাসের এক অমোঘ আহবান তুলে ধরেছেন। এ আহবানের পারিভাষিক নাম দিয়েছেন *'খুদী'* বা আত্মদর্শন। তিনি বিভিন্নভাবে এ কথাটি

তুলে ধরেছেন যে, এ খুদীই হচ্ছে একজন মুমিনের মূল চালিকাশক্তি। মানুষ এবং অন্যান্য জীব–বিশেষ করে একজন মুমিন ও সাধারণ মানুষের মধ্যেকার পার্থক্য বিধায়ক প্রধান চরিত্রই হচ্ছে "*খুদী*"। প্রকৃতপক্ষে ইকবালের "*খুদী*" দর্শন ছিল মুসলিম কবি-সাহিত্যিকদের দীর্ঘ দিনের ধারণার মধ্যে এক বিপ্লবের তুল্য। কেননা, সুফীদের প্রভাবে এতদিন ধরে মুসলিম সমাজে একটি জঘন্য ভুল চিন্তাধারা বিস্তার লাভ করেছিল– যা সূফীবাদের পরিভাষায় '*ফানা*' অর্থাৎ নিজের সর্বস্ব বিলিয়ে দেয়ার মধ্যেই প্রকৃত কল্যাণ ও মুক্তি নিহিত। যা না-কি কবি ও তাত্ত্বিকদের নিকটও একটি জনপ্রিয় আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আর এ চিন্তাধারার পেছনে সম্ভবত প্রধানতম কারণ ছিল ইসলামী দুনিয়ায় রাজতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্রের প্রবর্তন। খোলাফায়ে রাশেদার পরবর্তী যুগে মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হয় বংশীয় রাজতন্ত্র। এসব রাজা-বাদশাহর অধিকাংশই ছিল বিলাসী, ইন্দ্রিয়পূজারী, অমিতব্যয়ী ও উচ্চাভিলাষী। তখন তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার কোন বাস্তব উদ্যোগও জাতীয়ভাবে গ্রহণ করা হয়নি। এমতাবস্থায় একদিকে সত্যপন্থী উলামাদের একটি দল তাদের চরম নির্যাতন সহ্য করে সত্যিকার ইসলামী জ্ঞানচর্চা ও ইসলামের মৌলিক গবেষণা কার্যে নিয়োজিত ছিলেন, অন্যদিকে সূফীদের আরেকটি দল পার্থিব-জীবনের কলুষতা থেকে মুক্ত থাকার জন্য বৈরাগ্যবাদের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এদের প্রভাবেই জন্মলাভ করে "*ফানা*" দর্শন, যা অনেকটা বৈরাগ্যবাদের সমার্থক। বৈরাগ্যবাদের আহবায়ক হিসেবে নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে ঃ

১. উমাইয়া যুগের প্রখ্যাত কবি '*আবুল আতাহিয়্যা*' তাঁর প্রকাণ্ড কাব্যভাণ্ডারের অধিকাংশ জুড়ে নৈরাশ্যের বাণীই প্রচার করে গেছেন। নিম্নে উদ্ধৃত তাঁর একটি পংক্তি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য ঃ

জন্ম দাও মৃত্যুর জন্য ।। আর নির্মাণ করো ধ্বংসের তরে,
যারাই এসেছে ধরার বুকে ।। মৃত্যু তাদের ডাকছে বারে বারে।

২. আব্বাসী যুগের স্বনামধন্য দার্শনিক কবি '*আবুল-আলা আল-মাআররী*' তো এ নৈরাশ্যবাদী দর্শনে আরো এক কদম এগিয়ে গিয়ে বলেন ঃ

আমার জন্মই তো একটি পাপের ফলশ্রুতি
যে পাপ করেছে আমার জনক,
আমার প্রতি
আর তাই
আমি করিনি এর পুনরাবৃত্তি
কাহারো প্রতি।

৩. নাম না জানা একজন কবির একটি পংক্তি উপমহাদেশে প্রবাদের মর্যাদা লাভ করেছে।

তাঁর ভাষায় ঃ

যদি চাও তুমি মর্যাদা কিছু পেতে
মিটিয়ে দাও তবে নিজের পরিচয়
আপন সত্তা হতে।
ভেবে দেখ বীজ কিভাবে
পরিণত হয় সুশোভিত কাননে
নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে
ধুলোর সাথে।

পক্ষান্তরে আল্লামা ইকবালের আহবান কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি উদাত্ত কণ্ঠে আহবান জানান প্রতিটি মুসলিমকে জাগ্রত হওয়ার, নিজেকে চেনার, আত্মোপলব্ধির এবং আপন ব্যক্তিসত্তাকে সকল সৃষ্টির উর্ধে তুলে ধরার। তাঁর ভাষায় ঃ

খুদী কো কর বুলন্দ ইতনা, কে হার তক্‌দীর সে পহলে
খোদা বন্দে সে খোদ পুছে বাতা তে-রী রেজা কেয়া হ্যায় ?

'খুদী'কে তোমার সমুন্নত কর
উর্ধ গগন পরে,
বিধাতা তব ভাগ্য লিখেন তোমায় জিজ্ঞেস করে।

লক্ষণীয় যে, ইকবালের "খুদী" দর্শন একদিকে যেমন প্রচলিত সূফী দর্শনের বিপরীত, তদ্রূপ তা পাশ্চাত্য জগতের ভাগ্য দর্শনেরও বিরোধী। নৈরাশ্যবাদী সূফীদের দৃষ্টিতে মানুষের নিজস্ব কোন সত্তা ও স্বাধীনতা নেই, তাই আল্লাহকে চেনার অর্থই হচ্ছে তা বিলীন করে দেয়া। আবার পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী দর্শনে স্রষ্টা বা বিধাতার কোন স্থান নেই। মানুষ নিজেই আপন ভাগ্যবিধাতা *"Man is the architect of his own fortune"* কিন্তু ইকবালের দৃষ্টিতে মানুষ আল্লাহর খলীফা, তাঁর সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ জীব এবং স্বাধীন ইচ্ছাশক্তির অধিকারী। তাই, আল্লাহর খলীফা হিসেবে অবশ্যই সৃষ্টি জগতের সকল উপায়-উপকরণ কাজে লাগিয়ে নিজের মধ্যে স্রষ্টা যে শক্তি-সামর্থ্য প্রদান করেছেন তার সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার করতে হবে। মানুষ নিজের কল্যাণ-অকল্যাণের ধারক কিন্তু রচয়িতা বা বিধাতা নয়। অর্থাৎ, মানুষ নিজের প্রচেষ্টায় সে সর্বোচ্চ কল্যাণ লাভের যোগ্য হতে পারে অথবা চূড়ান্ত অকল্যাণও ডেকে আনতে পারে, কিন্তু কল্যাণ-অকল্যাণ আল্লাহই প্রদান করেন—তবে মানুষের প্রচেষ্টার আলোকে।

ইকবালের দৃষ্টিতে একজন মুসলিমের সবচাইতে বড় কর্তব্য এ খুদী দর্শনে নিজেকে সমৃদ্ধ করা। কারণ, তার মুসলিম পরিচয় একথারই সাক্ষ্যদান করে যে, মহান আল্লাহ যে তাকে তাঁর খলীফা বা প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত করার উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছেন তা সে নীতিগতভাবে স্বীকার করে নিয়েছে। তাই, একজন মুমিনের চিন্তা ও চেতনা, কথা ও কাজ, আচার ও আচরণ সব কিছুতেই এ দৃষ্টিভঙ্গির বহিঃপ্রকাশ অবশ্যই থাকতে হবে। মুসলমানদের দীর্ঘ

দিনের পতনোন্মুখ অবস্থার পেছনে এ চেতনার অনুপস্থিতিই প্রধানত দায়ী।

ইকবাল কাব্যে *'শাহীন'*-এর তাৎপর্য

ইকবালের ভাষায় একজন মুসলিম হচ্ছে *"শাহীন"* (বাজ পাখী) তুল্য। তিনি *"শাহীন"* শব্দটি তাঁর কাব্যে এক বিশেষ তাৎপর্যবহ *[Symbolic]* অর্থে প্রয়োগ করেছেন। সম্ভবতঃ তিনি মুসলিমকে একারণেই *"শাহীন"* তথা বাজ পাখীর সাথে তুলনা করেছেন যে, বাজ পাখীর এমন তিনটি চরিত্র রয়েছে যা প্রতিটি মুসলিমেরই অনুশীলন করা উচিত। অন্যথায় **তার মুসলিম হওয়ার দাবী অর্থহীন ঃ**

এক।। বাজ পাখী কোথাও বাসা তৈরী করে না, যখনই বিশ্রামের প্রয়োজন পড়ে কোন বৃক্ষের ডালে বসে প্রয়োজনমত জিরিয়ে নেয় মাত্র। বংশ বৃদ্ধির জন্য ডিম দেয়ার প্রয়োজন পড়লে কাক বা চিলের বাসায় গিয়ে ডিম দিয়ে সরে পড়ে।

দুই।। যে কারো শিকার গ্রহণ করে না। নিজের শিকার দিয়েই জীবিকানির্বাহ করে।

তিন।। তার গন্তব্যস্থল হচ্ছে অনন্ত মহাশূন্য। সে আকাশকে সামনে রেখে শুধু উড়তেই থাকে। পরিশ্রান্ত হলে একটু বিশ্রাম করে নেয় মাত্র। কাজেই প্রত্যেক মুসলিমেরই উচিত সে যেন দুনিয়াকে স্থায়ী নিবাস হিসেবে গ্রহণ করে আত্মপ্রতিষ্ঠার কাজে মগ্ন না হয়ে পড়ে এবং প্রত্যেক মুসলিম যেন স্বাবলম্বী হয়, কখনও যেন অন্যের কল্যাণে বা অনুগ্রহে বেঁচে থাকার কোন আকাঙ্ক্ষা নিজের মনে পোষণ না করে এবং প্রত্যেক মুসলিম যেন নিজের লক্ষ্য হিসেবে কোন বস্তুকে জাগতিক গন্তব্য নির্ধারণ না করে মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভকেই নিজের জীবনের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করে। নিম্নোক্ত পংক্তিতে তিনি প্রত্যেক মুসলিমের নিকট এ আহবানই জানিয়েছেন ঃ

তু শাহীন হ্যায়, পরওয়াজ হ্যায় কা-ম তেরা
তেরে সা-মনে আ-সমান আওর ভী হায়।
তুমি যে বাজ পাখী–পঙখীরাজ,
উড্ডয়নই তোমার কাজ।
পথ পানে চেয়ে দেখ
বাকী আছে সম্মুখে তোমার
এখনও বিশাল আকাশ।

ইকবাল নিজেই বলেছেন ঃ

চুঁ মী গোয়াম্ মুসলমানাম্ বলার থাম্।
দে দানাম মুশকিলা-তে লা-ইলাহ্ রা।

আমি নিজেকে মুসলিম বলে পরিচয় দিতে রীতিমত প্রকম্পিত হয়ে পড়ি। কারণ, আমার জানা আছে একজন মুসলিমের কাছে ইসলামের দাবী কত কঠিন।

ইকবাল ও স্বাধীনতার প্রেরণা

জিন্নাহকে যদি মুসলমানদের জন্য একটি স্বাধীন আবাসভূমির জনক বলা হয় তাহলে ইকবালকে বলা হবে মুসলিম জাতির মধ্যে স্বাধীনতার প্রেরণার জনক। তিনি উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন ঃ কোন মুসলিম পরাধীনতার শৃংখলাবদ্ধ থাকতে পারেনা– এ পরাধীনতার মধ্যে যত বেশী সুযোগ-সুবিধাই থাক না কেন। তাই তাকে বলতে শুনি ঃ

আয় ত্বায়েরে লাহুতী উস রিয্‌কসে মওত আচ্ছী,
জিস্ রিয্‌ক সে আতী হো পরওয়াজ মে কোতাহী।
ওহে উর্ধ জগতের পাখী শোন মোর কথা
ঐ রিয্‌ক পাবার চাইতে মৃত্যুই শ্রেয়।
যে রিয্‌ক সীমিত করে তব দিগন্ত,
খর্ব করে তোর স্বাধীনতা।

ইকবাল ও অর্থ-বৈভব

সমসাময়িককালের উপমহাদেশের শীর্ষে অবস্থানকারী শিক্ষিত, একজন বিশ্ববিশ্রুত পণ্ডিত, দার্শনিক ও সফল আইনজীবী হওয়া সত্ত্বেও কখনও তিনি অর্থোপার্জনকে জীবনের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করেননি, অথবা নিজের শিক্ষা ও পাণ্ডিত্যকে অর্থোপার্জনের হাতিয়ারেও পরিণত হতে দেননি। ন্যূনতম জীবনধারণের জন্য যে পরিমাণ অর্থ তাঁর প্রয়োজন হত শুধু ঐ পরিমাণ অর্থোপার্জনের জন্যই আইন ব্যবসায় সময় দিতেন। তাই, আজীবন ঐশ্বর্যশালী ও ধনী বলতে যা বোঝায় সে স্তরে তিনি পৌঁছতে চেষ্টাই করেননি। যেন *'ধনী'* বিশেষণে ভূষিত হওয়াটাই ছিল তাঁর জন্য অধিকতর পীড়াদায়ক। এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন তিনি নিম্নোক্ত পংক্তিতে ঃ

ইয়ে রোতবা জু মুঝে মিলা, কালান্দারী সে মিলা তাওয়াঙ্গারী সে নেহী
এই যে মর্যাদা-সম্মান লভেছি আমি
কালান্দারের মুকুট পরেই লভেছি।
ধনীর পরিচয়ে নহে।

বিদেশে ইকবাল চর্চা

ইকবাল যদিও মূলতঃ একজন ইসলামী জাগৃতির কবি ছিলেন কিন্তু তবুও তাঁর আবেদন ছিল ইসলামেরই মত আন্তর্জাতিক। তাই তিনি দেশ, কাল ও পাত্রের গণ্ডিতে সীমিত হননি কখনও। তাঁর অধিকাংশ কাব্যগ্রন্থ উর্দু-ফার্সীতে রচিত হওয়া সত্ত্বেও এ দু'ভাষাভাষী ছাড়া অন্যান্যদের জন্য এর পথ কখনও রুদ্ধ ছিল না। তাঁর কাব্যগ্রন্থসমূহ তাঁর জীবদ্দশাতেই অন্য ভাষাতে অনূদিত হতে শুরু করে।

মুসলিম দেশের অনেকখানেই 'ইকবাল একাডেমী', *'ইকবাল ইন্সটিটিউট'*, *'আল্লামা ইকবাল সংসদ'*, *'ইকবাল অধ্যয়ন পরিষদ'* ইত্যাদি বিভিন্ন নামে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহে ইকবাল

দর্শন ও ইকবালের কাব্যসমূহের অনুবাদ ও অধ্যয়ন চলছে। এমনকি ইউরোপীয় দেশসমূহের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়েও ইকবাল গবেষণার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব অর্পিত হয়েছে। অধ্যাপক *A. J. Arberry* ইকবালের কিছু কবিতার ইংরেজী কাব্যানুবাদ করেছেন। বিখ্যাত প্রাবন্ধিক *E. M. Forster* তার একটি প্রবন্ধ সংকলনে আল্লামা ইকবালের স্মৃতিচারণ করে একটি প্রবন্ধ লিখেন। তার অংশবিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত হলো ঃ

"All the same he was a fighter. He believed in the Self. The Self as a fighting unit– and his philosophy is not an enquiry into truth but a recommendataion as to how the fight should be carried on. Fight we must, for man is the viceregent of God upon earth. We must fortify our personalities. We must be hard. We must always be in a state of tension and try to be supermen................. Iqbal never identifies hardness with oppression, or the self with selfishness. The superman he seeks may come from any class of society............................

He is one of the two great cultural figures of modern India and our ignorance about him is extraordinary."

পরিশেষে উক্ত প্রবন্ধকারের প্রবন্ধের শেষাংশটুকুর পুনরাবৃত্তি করে আমাদেরকেও অকপটে স্বীকার করতে হবে যে, আল্লামা ইকবালের ব্যাপারে আমাদের কিছু জানার আগ্রহ থাকলেও তাঁর সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতা ও জ্ঞানের দৈন্য লজ্জাষ্কর।

বি ঃদ্র ঃ ইকবালের কবিতাসমূহের কাব্যানুবাদ প্রবন্ধকারের

ইকবালের নাম মুছে ফেলা সহজ নয়
সৈয়দ তোসারফ আলী

১৯২৩ সালের ৭-ই ফেব্রুয়ারী। ঐ দিন ছিল আলীগড় ন্যাশনাল মুসলিম ইউনিভার্সিটির দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠান। প্রধান অতিথি ছিলেন বিজ্ঞানাচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। প্রধান অতিথির ভাষণের বিষয় ছিল *'ইসলামিক কালচার এ্যাণ্ড ন্যাশনাল এডুকেশন'*। ইসলামী সংস্কৃতি ও জাতীয় শিক্ষার উপর ভাষণ দিতে গিয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় ও উৎকর্ষ সাধনে মুসলমানদের অবদানকে তিনি ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে উপস্থিত করেন অকৃপণভাবে। ইসলামের উন্মেষ যুগে নবী মুহাম্মাদ (সঃ) এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ সঙ্গীরা জ্ঞানের চর্চাকে কি ভাবে উৎসাহিত করেছিলেন তার সবিস্তার উল্লেখ আছে ঐ ভাষণে। এখানে প্রসঙ্গটি উত্থাপনের কারণ অবশ্য ভিন্ন। আর সে কারণটি হলো, ঐ ভাষণে বিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্র রায় মুসলমানদের কাব্য সাধনা সম্পর্কে এমন একটি তথ্য পেশ করেছিলেন যা আমাদের অনেকের অজানা ছিল। তিনি বলেছিলেন ঃ *'মুসলমানগণ জ্ঞানের প্রতিটি বিষয় ও মানসিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে দরকারী প্রতিটি নৈতিক শিক্ষাকেই স্বাগত জানিয়েছে। এটা মুসলমানদের গর্বের বিষয় যে, তাঁদের মধ্য থেকে যত কবি জন্মগ্রহণ করেছেন, অন্য জাতিগুলো সব মিলে একযোগেও তা' জন্ম দিতে পারেননি।'*

[আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ঃ জীবন ও সাধনা, অধ্যাপক কে. আলী, পৃঃ ৮৩]

সমকালের একজন অধ্যাপক কবি আবু হেনা মোস্তফা কামাল তাঁর মৃত্যুর কয়েক মাস আগে দৈনিক ইত্তেফাকের সাহিত্য পাতায় প্রকাশিত তাঁর একটি কবিতায় আমাদের আর একটি নতুন খবর দেন। তিনি বিদ্রুপের সুরে বলেন ঃ *'তৃতীয় বিশ্বে এমনিতেই কবির ফলন অঢেল'*। পি. সি. রায় এবং আবু হেনা মোস্তফা কামালের পর্যবেক্ষণ থেকে যে সত্যটি বেরিয়ে এসেছে তা হলো ঃ মুসলিম বিশ্বেএবং তৃতীয় বিশ্বে অন্য অনেক কিছুর অভাব থাকলেও কাব্য প্রতিভার কোনো অভাব নেই, বরং যথেষ্ট প্রাচুর্য রয়েছে। এই প্রাচুর্যই হয়েছে কবিদের জন্য কাল। এটা তো সবাই স্বীকার করবেন যে, যেখানে যেই জিনিসের প্রাচুর্য থাকে সেখানে সেই জিনিসের কদর হ্রাস পায়। এ যেন সেই অর্থনীতির চাহিদা-সরবরাহের সঙ্গে দামের উঠা-নামার ব্যাপার। মুসলিম বিশ্ব বলুন আর তৃতীয় বিশ্ব বলুন এই ছকেই এখানকার কবিদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হয়ে আসছে। কাব্য প্রতিভার প্রাচুর্যের কারণে মুসলিম বিশ্বে ও তৃতীয় বিশ্বে কবিরা মারাত্মকভাবে উপেক্ষিত এবং অবহেলিত হচ্ছেন।

কবি— তিনি যে ভাষার হোন, যে দেশের হোন, যে সম্প্রদায়ের হোন, যে বিশ্বাসের হোন, তিনি তো সত্য-সুন্দরকে ভালোবাসেন। ছন্দময় ভাষায় তিনি তো মানুষের সঙ্গে মানুষের একটা আত্মিক লেন-দেন করতে চান। আত্মিক লেন-দেনের এ কারবার যুগভেদে, দেশভেদে, সম্প্রদায়ভেদে এমনকি বিশ্বাসভেদে একই বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল থাকে। কবিরাও মানুষ। আর

মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মিক লেন-দেন চলে ভাবনা-চিন্তা, স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষাকে অবলম্বন করে। মৌলিক আবেগ-অনুভূতি দেশভেদে, ভাষাভেদে, সম্প্রদায়ভেদে বিশেষ কোনো পার্থক্যের সৃষ্টি করে না। মানুষের মনে এবং হৃদয়ে প্রতিনিয়ত যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত চলছে, জীবন ও জগত সম্পর্কে যে আবেগ এবং প্রতিক্রিয়া দেখা দিচ্ছে সেটাই কাব্যে অভিব্যক্তি পাচ্ছে। অথচ আমরা নির্বোধের মত কবিদের দেহে নানা লেবেল এঁটে তাঁদের ছোট করছি, অবজ্ঞা করছি, বর্জন করছি। আমরা ভুলে যাই, কবিরা বিভিন্ন সূত্রে আমাদের চিত্ত জয় করেন। যদি এমন দেখা যায় যে, কবি কোনো বিশেষ মতবাদের সঙ্গে, বিশেষ দলের সঙ্গে যুক্ত, তাহলে কি সেই মতবাদ, সেই দলের বিরোধীদের কাছে তাঁর কাব্যমূল্য নিঃশেষ হয়ে যায় ? এ ব্যাপারে সাহিত্য সমালোচকদের রায় হলো ঃ না, এতে বরং কবির কাব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়, যদি শিল্পীর বিশ্বাস নিখাদ হয়, বিশ্বাসের সঙ্গে জীবন যাপন সঙ্গতিপূর্ণ থাকে। কাব্য-রস আস্বাদনে কিংবা শিল্প সম্ভোগে কবি বা শিল্পীর বিশ্বাসে শরীক হতেই হবে– এমন কোনো কথা নেই। যদি তা-ই হতো তাহলে এক ভাষার কবিকে নিয়ে অন্য ভাষার মানুষ, এক দেশের কবিকে নিয়ে অন্য দেশের মানুষ, এক মতবাদের কবিকে নিয়ে অন্য মতবাদের মানুষ বিশেষ আগ্রহ দেখাতো না, মাথা ঘামাতো না।

এসব মীমাংসিত বিষয় নতুন করে আলোচনা করতে হচ্ছে এ কারণে যে, এখনও এদেশে কোনো কোনো কবিকে তাঁর বিশ্বাসের জন্য, মতবাদের জন্য কোণঠাঁসা করে রাখার হীন চেষ্টা দেখা যায়। যারা অসাম্প্রদায়িকতার কথা, উদার মানবিকতার কথা– এমনকি সাহিত্যের মাধ্যমে সকল বিভেদ-বিদ্বেষ অতিক্রম করার কথা বলেন, তাদের কারও কারও মধ্যে যখন এই সংকীর্ণতার ব্যাধি দেখি তখন দুঃখ পাই। এটা সবাই জানেন যে, ইকবাল আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কবি। পৃথিবীর প্রধান প্রধান ভাষায় তাঁর কাব্য অনূদিত হয়েছে। ইকবালের ভাবনা-চিন্তা ও বিশ্বাসের ধরনকে বিশ্বের ভাবুক সমাজ যথাসাধ্য বোঝার চেষ্টা করছেন। কিন্তু আমাদের এখানে সাধারণভাবে ইকবালকে বর্জন করার প্রবণতাই প্রবল। নতুন প্রজন্মের কবি ও সাহিত্যকর্মীদের কাছে ইকবাল বিস্মৃতপ্রায়। ইকবাল চর্চার ক্ষেত্রে এই অনীহার প্রধান কারণ তাঁর ইসলাম প্রীতি। ইসলামকে যাঁরা এদেশের সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে দুর্বল দেখতে চায় তারা ইকবালকে এড়িয়ে চলতে ভালোবাসেন। ইকবালের স্মৃতিকে তাঁরা মুছে ফেলতে চান। কিন্তু মুছে ফেলতে চাইলেই কি মুছে ফেলা যায় ? ইকবালের ভাষায় বলা যায় ঃ

'তওহিদ্ কি আমানত সিনোঁ মেঁ হ্যায় হামারে
আসাঁ নেহি মিটানা নাম ও নিশাঁ হামারা।'

অর্থাৎ তওহিদের (আল্লাহ্‌র একত্ববাদের) আমানত আমার বক্ষে, সহজ নয় আমার নাম-নিশান মিটিয়ে ফেলা।

নজরুল ইসলাম এদেশের জাতীয় কবি। এই জাতীয় কবিকেও ইসলাম থেকে বিযুক্ত রাখতে একটি মহলের চেষ্টার অন্ত নেই। অথচ সবাই জানেন, পরিণত বয়সে এই বিদ্রোহী কবির

কণ্ঠেই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উচ্চারিত হয়েছে ইসলামী নব-জাগরণে সামিল হবার উদাত্ত আহ্বান। নজরুলের ভাষায়ঃ

দিকে দিকে পুনঃ জ্বলিয়া উঠিছে/দ্বীন ইসলামী লাল মশাল/ওরে বেখবর/তুইও ওঠ জেগে/তুইও তোর প্রাণ প্রদীপ জ্বাল।'

নজরুল ইসলাম তাঁর সমকালের ইসলামী নব-জাগরণকে সাগ্রহে স্বাগত জানিয়েছেন। এই জাগরণের খবর জানিয়ে তিনি বাংলার তৎকালীন ঘুমন্ত মুসলমানকে জেগে উঠার তাকিদ দিয়েছেন। ইকবাল-নজরুলের এই চিন্তাধারার অনুসারী আর একজন শক্তিমান কবি ফররুখ আহমদ। ইসলামী আদর্শের প্রতি সুকঠোর আনুগত্যের কারণেই তিনি এদেশের মুসলমানদের কাছে অত্যন্ত প্রিয় কবি। ইসলামী জীবন ও মূল্যবোধকে ফররুখ আহমদ তাঁর ছন্দময় কাব্যদেহে মূর্ত করে তোলার দক্ষতায় বড় মাপের কবি। তাঁর বিশ্বাস, তাঁর অভিজ্ঞতা-অনুভূতি এবং জীবন যাপনের মধ্যে কোনো বৈপরিত্য ছিল না। ছিল না বিন্দুমাত্র মোনাফেকী। যে কারণে ভিন্ন আদর্শে বিশ্বাসীরাও তাঁকে শ্রদ্ধা করে। যদিও *'মৌলবাদী'* বলে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করার প্রবণতা বর্তমানে প্রবল। এটা সত্যিই দুঃখজনক।

আজ মুসলিম বিশ্বে একটা নবজাগরণের জোয়ার সৃষ্টি হয়েছে। এই জাগরণকে ভীতির চোখে দেখছে পাশ্চাত্য। ভারতীয় লেখক সৈয়দ মুস্তফা সিরাজের মতেঃ পাশ্চাত্যের *'অর্ধশিক্ষিত সাংবাদিকরা'*ই এই জাগরণকে *'ফাণ্ডামেন্টালিজম'* নাম দিয়েছে এবং আমরা বাংলায় তাকে *'মৌলবাদ'* বলছি। আসলে এই জাগরণের মূলে রয়েছে আত্মিক ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের দেউলিয়াপনা এবং জীবন সমস্যার সমাধানে মার্কসবাদী দর্শনের ব্যর্থতা। কমিউনিজমের ব্যর্থতা এবং পাশ্চাত্যে কনজ্যুমারিজমের দাপটে ব্যক্তিসত্তার শোচনীয় অবক্ষয়ের পটভূমিতে মুসলিম ভাবুকরা মানবজাতিকে ইসলামের দিকে প্রত্যাবর্তনের আহ্বান জানাচ্ছেন। তাঁরা বলছেনঃ ইসলামেই আছে সাম্য, ভ্রাতৃত্ব, ব্যক্তির মুক্তি এবং সত্যিকার গণতন্ত্র। রাজতন্ত্র কিংবা যাজকতন্ত্রের স্থান নেই ইসলামে। সত্যপন্থী খলীফা হযরত আলী (রাঃ)-এর মৃত্যুর পর ইসলামী রাষ্ট্রে রাজতন্ত্রের উদ্ভব ঘটেছে এবং দীর্ঘ প্রায় তেরশ' বছর ধরে রাজতন্ত্র এবং সামরিক একনায়কতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর রূপ-চরিত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর থেকে মুক্তি পেতে হলে মুসলমানদের ইসলামের মূল কাঠামোয় প্রত্যাবর্তন ছাড়া উপায় নেই। এ কারণেই বলা হচ্ছে, উন্মেষ যুগের ইসলামে ফিরে চলো। এই আহ্বানকে *'মৌলবাদ'* বলে সনাক্ত করা হচ্ছে।

আমরা ইতিহাসের এমন এক পর্বে প্রবেশ করেছি যখন কেউ কোনো ধর্মের বা আদর্শের মূলনীতির অনুসারী হলে তাঁকে প্রশংসা করার পরিবর্তে *'মৌলবাদী'* বলে গালি দেয়া হয়। কোনো সম্প্রদায়কে তার আদর্শ ও বিশ্বাসের আলোকে পরিচালিত করতে চাইলে *'সাম্প্রদায়িক'* বলে চিত্রিত হতে হয়। এ রকম একটা পরিস্থিতি সত্যিকার আদর্শবাদীদের জন্য দুঃসময়। সন্দেহ নেই, সময়টা মোনাফেকদের জন্য উত্তম। মূলের প্রতি অনুগতদের যারা *'মৌলবাদী'* বলে গালি দিচ্ছেন তারা নিজেদের ভীষণ বিজ্ঞান মনস্ক, যুক্তিবাদী এবং

পরিবর্তনকামী মনে করছেন। তাঁরা ভুলে যাচ্ছেন, বিজ্ঞানও কিছু মৌল বিশ্বাসের উপর দাঁড়িয়ে আছে এবং পরিবর্তনই একমাত্র বৈজ্ঞানিক সত্য নয়, শাশ্বতের অস্তিত্বও বিজ্ঞান স্বীকার করতে বাধ্য। এ প্রসঙ্গে আমি দু'জন খ্যাতিমান সেকুলার লেখকের বক্তব্য উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। একজন বলছেন ঃ *"বিজ্ঞানীর কিছু মূল বিশ্বাস আছে যেমন বিশ্বজগত নিয়মের ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই বিশ্বাস থেকে বিজ্ঞানী সহজে সরবেন না। কিন্তু এর ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে-সব তত্ত্ব তৈরী হচ্ছে, তাদের ক্রমাগত বিচার চলছে এবং সংশোধন হচ্ছে। ধর্মবিশ্বাসীর কিছু মূল প্রত্যয় আছে, অহিংসা প্রেম এইসব নিয়ে। তার ওপর ভিত্তি করে শাস্ত্র ও সামাজিক বিধান তৈরী হচ্ছে; অন্তত শাস্ত্রকারদের দাবী এই রকম। ধর্মের মূল প্রত্যয় সহজে বদলাবার নয়। কিন্তু সামাজিক বিধানগুলোর বিচার ও পরিবর্তন প্রয়োজন।"* [ধর্ম ও যুক্তি, অম্লান দত্ত, দেশ, ৭ জানুয়ারী, ১৯৮৯]।

অপরজন বলছেন ঃ *"বৈজ্ঞানিক মতে কিন্তু পরিবর্তনই সর্বেসর্বা নয়, ধ্রুবতার অস্তিত্বও আমরা স্বীকার করতে বাধ্য। ইলেকট্রন-প্রোটনের স্থান ও গতিমাত্রা সর্বক্ষণ বদলায়, কিন্তু তাদের বৈদ্যুতিক চার্জ ও ম্যাস থাকে অক্ষুন্ন।.... বিজ্ঞান গতিও মানে, স্থিতিও অস্বীকার করে না এবং দু'য়েরই অনুধাবনযোগ্য পদ্ধতি উদ্‌ভাবন করেছে।* [পথের শেষ কোথায়, আবু সয়ীদ আইয়ুব, পৃঃ ৩৯]।

বস্তুত, এই শতকের প্রতিভাধর দার্শনিক কবি ইকবাল আধুনিক মানুষের জীবন সমস্যার সমাধান খুঁজে পাবার জন্য একদিকে পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান ও দর্শন চিন্তার সঙ্গে, অন্যদিকে প্রাচ্যের মধ্যযুগীয় মরমী ধর্ম-ভাবনার সঙ্গে নিরন্তর বোঝা-পড়া করেছেন। নাস্তিক্যবাদী সমাজবাদী চিন্তার মধ্যে নব-উদ্দীপনা তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। কিন্তু মার্কসবাদ জীবন সমস্যার সমাধানে ব্যর্থ হবে– এ ভবিষ্যদ্বাণী তিনি করেছিলেন দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে। সময়ের সংকট উত্তরণের জন্য তিনি ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠনে ব্রতী হয়েছিলেন এবং ইসলামী ব্যবস্থায় যে মূল সত্যের প্রতি অনুগত থেকে গতিশীল জীবনধারা অব্যাহত রাখা সম্ভব– এই ধারণাকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার ব্যাপারে তাঁর সাধনা ছিল জীবনব্যাপী এবং অক্লান্ত। ইকবাল তাঁর সমকালীন সংকটের স্বরূপ তুলে ধরেছিলেন এভাবে ঃ *'Modern atheistic socialism, which possesses all the fervour of a new religion, has a broader out-look; but having received its philosophical basis from the Hegelians of the left wing, it risies in revolt against the very source which could have given it strength and purpose. Both nationalism and atheistic socialism, at least in the present state of human adjustments, must draw upon the psychological forces of hate, suspicion, and resentment which tend to impoverish the soul of man and close up his hidden sources of spiritual energy. Neither the technique of medieval mysticism or nationalism nor atheistic socialism can cure*

the ills of a despairing humanity. Surely the present moment is one of great crisis in the history of modern culture. [The Reconstruction of Religious Thought in Islam, Allama Muhammad Iqbal, P. 188, 189.]

বাংলায় এর ভাবানুবাদ করলে দাঁড়ায়ঃ *"আধুনিক নাস্তিক্যপুষ্ট সমাজবাদে একটি নব ধর্মের উদ্যম আছে এবং এ ব্যাপারে তা উদারতর দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু উগ্র হেগেলবাদের আদর্শে যে ভাবে এর দার্শনিক ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে, তাতে যে মানসিকতা, শক্তি, উদ্দেশ্য ও মাহাত্ম্য একে সমুন্নত করে তুলতে পারতো তারই বিরুদ্ধে এ বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। সকলেই স্বীকার করবেন যে, ঘৃণা, সন্দিগ্ধতা, ক্রোধ ইত্যাদি মানবাত্মাকে কলুষিত করে এবং তার অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ পথ রুদ্ধ করে। কিন্তু জাতীয়তাবাদ ও নাস্তিক্যপুষ্ট সমাজবাদের যতই প্রশংসা করুন না কেন, একথা অনস্বীকার্য যে, এসব 'গুণাগুণ'ই ওই শ্রেণীর মতবাদের মূল উপজীব্য। মানুষ আজ হতাশার সম্মুখীন। মধ্যযুগীয় আধ্যাত্ম-রীতি যেমন আজ তাকে কোন আশার বাণী শোনাতে পারছে না, তেমনি আধুনিক জাতীয়তাবাদ বা নাস্তিক্যপুষ্ট সমাজবাদও তার অন্তরে নবতর প্রেরণা যোগাতে অক্ষম হয়েছে। আধুনিক সংস্কৃতির ইতিহাসে আজকের দিন বাস্তবিকই একটি সংকটের দিন।"*

[ইসলামে ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন, ডক্টর মুহাম্মদ ইকবাল, ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ '৮১, পৃষ্ঠা -২৩৭]

ইকবাল তার সমকালীন চিন্তা জগতের সঙ্কটকে উপলব্ধি করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার অগ্রগতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মুসলিম ধর্মীয় দর্শনকে পুনর্গঠনের চেষ্টা করেছিলেন। যা শুধু মুসলিম ভাবুকদের জন্যই নয়, অন্যদের জন্যেও ভাবনা-চিন্তার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছিল। দার্শনিক ইকবাল ১৯২৮ সালের শেষ দিকে সভ্যতার সঙ্কট প্রত্যক্ষ করে যে বক্তব্য রেখেছিলেন তারপর ছয় দশকেরও বেশী সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। সমাজবাদ সম্পর্কে তাঁর পর্যবেক্ষণ যথার্থ প্রমাণিত হয়েছে। খোদ সোভিয়েট ইউনিয়নসহ পূর্ব-ইউরোপীয় দেশসমূহে আজ নতুন হাওয়া বইতে শুরু করেছে। আজকের এই পটভূমিতে ধর্মীয় চিন্তার নবতর পুনর্গঠনের প্রয়োজন আরও বেশী জরুরী হয়ে পড়েছে। একাজ করতে হলে মুসলিম ভাবুকদের মানুষের ভাবনা-চিন্তার অগ্রগতির প্রতি তীক্ষ্ম দৃষ্টি এবং সে সম্পর্কে একটি স্বাধীন সমালোচনামূলক মনোভাব রক্ষা করে চলতে হবে। যার তাকিদ ইকবালই দিয়ে গেছেন।

ইকবাল ও গণতন্ত্র

কানিজ-ই-বাতুল

ডঃ ইকবাল ছিলেন যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক, মহৎ ধর্ম-সংস্কারক, প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, আইনবিদ ও রাজনীতিক। তিনি ছিলেন প্রথমে কবি এবং পরে রাজনীতিক। তিনি বেশ কিছুকাল রাজনীতিও করেছিলেন।

ডঃ ইকবাল ছিলেন কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর পথপ্রদর্শক, আর কায়েদে আজম মুহম্মদ আলী আলী জিন্নাহ ছিলেন ইকবালের *"মরদে মুমিন"*। ইকবাল কায়েদে আজমের মাধ্যমে স্বীয় উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করতে চেয়েছেন। যুক্তি ও বুদ্ধি দিয়ে, লেখনী ও বক্তৃতা দিয়ে তিনি কায়েদে আজমের হস্তকে সুদৃঢ় করেন। ইকবালের ইন্তেকালের পর কায়েদে আজমের সৌজন্যেই তাঁর চিঠিগুলো প্রকাশিত হয় (১৯৪৩)। তাঁর ইন্তেকালে কায়েদে আজম এক শোকবার্তায় লেখেন ঃ

"তিনি ছিলেন আমার বন্ধু, পথপ্রদর্শক এবং একজন দার্শনিক। মুসলিম লীগের সংকটময় মুহূর্তে তিনি পাহাড়ের ন্যায় এ প্রতিষ্ঠানের পাশে এসে দাঁড়াতেন এবং এক মুহূর্তের জন্যেও আপন জায়গা থেকে পিছু হটতেন না।"[১]

ডঃ ইকবালের গণতন্ত্র সংক্রান্ত সব লেখা অনুধাবন করার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, তিনি পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের পক্ষপাতি ছিলেন না। তিনি তাঁর *'পায়াম-ই-মাশরিক'* *ফার্সী* গ্রন্থে বলেন ঃ

গোরেয্ আয্ তারয-এ-জামহুরী গুলাম-এ-পুখ্তাকার-এ-শও
কে-আয় ম্গয-এ-দু-স্দ খর ফিকর-এ-ইনসান-এ-নামী আয়দ

অনুবাদ ঃ *"দূরে থাক গণতন্ত্রের পদ্ধতি থেকে*
অনুসরণ কর জ্ঞানী-গুণীর,
দুইশ' গাধার মস্তিষ্ক হতে পারেনা
একটি মানুষের চিন্তাসম।"

ডঃ ইকবাল ছিলেন সত্যসন্ধানী। জীবনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও তাৎপর্যকে তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করে দর্শন ও কাব্যের মাধ্যমে তা জাতির নিকট পরিবেশন করতে চেয়েছিলেন। জীবনকে সুস্থ এবং সুন্দরতর করাই ছিল তাঁর কাব্য ও দর্শন-চর্চার উদ্দেশ্য।

প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে ছিল তাঁর গভীর পরিচয়। তিনি তাঁর সময়ের জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধর্ম ও দর্শনে খুঁজেছিলেন আধুনিক জীবন সমস্যার সমাধান। কিন্তু পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শনের ফলিত রূপ দেখে তিনি নিরাশ হন। একইভাবে নিরাশ হন প্রাচ্যের ব্যক্তিত্ব বিনাশী ধর্ম-সাধনা এবং পাশ্চাত্যের অবাধ গণতন্ত্র প্রত্যক্ষ করে। আল্লামা ইকবালের দৃষ্টিতে ইউরোপের অবাধ গণতন্ত্র ছিল একটি প্রহসন মাত্র। তিনি তাঁর *'বাংগ-ই-দারা'*

গ্রন্থে বলেনঃ

হ্যায় ওয়াহী সায়-এ-কুহান মাগরিব কা জামহুরী নিযাম
জিসকে পারদোঁ মেঁ নাহীঁ গায়ের আয় নাত্তায়ে কায়সারী
দেয়েও-এ-ইস্তিবদাদ জামহুরী কারা মেঁ পায়ে কোব্
তু সামাঝতা হায় ইয়ে আযাদী কী হায় নীলাম পারী। [২]

অনুবাদ ঃ "*এটা সেই পাশ্চাত্যের গণতন্ত্র ফল, মূল ও তত্ত্ব*
ঐ পুরানো সুর (স্বৈরতন্ত্র)
এর অভ্যন্তরে সাম্রাজ্যবাদ ছাড়া আর কিছুই নেই।
গণতন্ত্রের ছদ্মবেশে জুলুমের দৈত্য নৃত্য করছে,
তুমি তাকে মনে করছ আযাদীর ভূষিতা পরী।"

তিনি "যরব-ই-কালীম" গ্রন্থে *জামহুরিয়াত* শীর্ষক কবিতায় গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য বুঝাতে গিয়ে বলেনঃ

ইস রায কো এক মারদ-ই-ফিরাঙ্গী নে কিয়া ফাশ্
হারচান্দ কে দানাঁ এসে খোলা নাহীঁ কারতে
জামহুরিয়াত এক তরযে হুকুমাত হায় কে জিস্ মেঁ
বান্দুঁ-কো-গিনা করতে হাঁয়, তওলা নাহীঁ করতে। [৩]

অনুবাদ ঃ *এই গোপন বারতাকে এক ফিরিঙ্গী ফাঁস করেছে*
যদিও এসব বলেনা কোন দানেশমন্দ,
গণতন্ত্র এমন একটি পদ্ধতি যেখানে শুধু গণনা
করা হয় মানুষের সংখ্যা
সেখানে থাকেনা মেধা বিকাশের সুযোগ।

ডঃ ইকবাল মনে করতেন, প্রাপ্তবয়স্ক সব লোক দেশের রাজনীতির হাল-হাকিকত না বুঝে ভোট প্রয়োগ করে গণপ্রতিনিধি নির্বাচিত করবে–এটা দেশ ও জাতির জন্য ক্ষতিকর।

যারা সত্যিকারভাবে দেশের রাজনীতি বুঝে ঠিকভাবে ভোট প্রয়োগ করতে পারে, কেবল তাদেরকেই তিনি ভোটের অধিকারী বলে মনে করতেন।

তিনি ছিলেন জাতীয় জাগরণের কবি, মানসিক বিপ্লবের পতাকাবাহী। তিনি জাতির মনে আত্মবিশ্বাস ও স্বাতন্ত্র্যবোধ জাগাতে চেয়েছিলেন। তাঁর অন্তর ছিল ইসলামী জোশ ও জাতির বেদনায় ভরা। তিনি গরীবদের দুঃখ-দৈন্য দেখে জালিমদের বিরুদ্ধে ক্ষেপে উঠেছিলেন। তিনি তাঁর কাব্যে ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর আদেশ-নির্দেশ স্মরণ করিয়ে দেন এবং তাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালানোর পয়গাম দেন। তিনি পুরনো রাজনৈতিক পৃথিবীর কাঠামো ভেঙ্গে সত্যিকার কল্যাণধর্মী সরকার গঠনের দাবী জানিয়েছেন। [৪]

তিনি আরও বলেছেন ঃ 'কৃষক জমিন চাষ করেও যদি তার ফল ভোগ করতে না পারে, তবে ঐ ক্ষেতের ফসল পুড়িয়ে ফেলাই শ্রেয়।'

তিনি 'বাল-ই-জিবরীলে –এ বলেছেন ঃ

উঠো মেরী দুনয়াকে গরীবুঁ কো জাগা দো
কাখ-এ-উমরা-কে দর-ও-দীওয়ার হেলা দো
সুল্‌তানী-এ-জাম্‌হুরী-কা- আতা হায় যামানা
জো নক্‌শ-এ-কুহন্‌ তুমকো নজব আয়ে, মিটা দো
জিস্‌ ক্ষেত সে দেহকাঁ কো মাইয়াসসার নাহী রূযী
উস ক্ষেতকে-হর্‌ খোশা-এ-গনদুম-কো-জ্বালা দো।[৫]

(আল্লাহ ফেরশতাগণের প্রতি আদেশ জারি করলেন ঃ)

"তোমরা উঠো এবং আমার পৃথিবীর গরীবদের জাগিয়ে দাও। আমীর-কবীরদের প্রাসাদ উপড়ে ফেল। সত্যিকার জমহুরিয়তের (গণতন্ত্র) যুগ আসন্ন।

পৃথিবীর চিহ্নমাত্রই মুছে ফেল। যে ক্ষেতের ফসল কৃষক ভোগ করতে পারে না, তার প্রত্যেকটি গমের খোসা পুড়িয়ে পেল।"

ডঃ ইকবাল মনে করতেন যে, ঢালাও গণতন্ত্রে শুধু গণতন্ত্রের অপব্যবহারই করা হয়। তিনি ভাবতেন ভোট প্রয়োগের জন্য বিশেষ যোগ্যতার প্রয়োজন, ভোটদাতাকে শিক্ষিত হতে হবে, প্রতিনিধিত্ব ও দেশ পরিচালনা সম্পর্কে জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। তা-না হলে দেশের ধনশালী ও শাসকরা দেশের জনসাধারণের নিকট দেশপ্রেমের দোহাই দিয়ে শাসন ক্ষমতায় উপবিষ্ট হবে। কিন্তু, কাজের বেলায় গরীবের অপকার করবে, আর নিজের মতলবসিদ্ধি করবে। এ জন্যেই তিনি অবাধ গণতন্ত্রের পক্ষপাতি ছিলেন না।

তিনি বাংগ-ই-দারায় *'জাওয়াব-ই-খিযির'* (১৯২২) নামক কবিতায় বলেছেন ঃ

দাস্ত-এ-দৌলত আফিরীঁ-কো মুযদযুঁ মিলতি রাহী
আহল-এ-সারওয়াত জায়সে দেতে হাঁয় গরীবোঁ কো যাকাত।[৬]

"ধন-উৎপাদনকারীরা মালিকদের নিকট থেকে এই সামান্য পারিশ্রমিক পেয়ে থাকে, যেমন গরীবরা ধনশালীদের নিকট থেকে যাকাত পেয়ে থাকে।"

এখানে তিনি আসলে অবাধ গণতন্ত্রের অপব্যবহার বোঝাতে চেষ্টা করেছেন।

মোদ্দাকথা, তিনি গণতন্ত্রের বিরোধী ছিলেন না। তবে, দেশে শিক্ষিত লোকের হার কম বলেই তিনি শর্তসাপেক্ষে গণতন্ত্র চেয়েছিলেন।

তথ্য নির্দেশ

১. ডঃ মুহম্মদ আবদুল্লাহ ঃ মুসলিম জাগরণে কয়েকজন কবি-সাহিত্যিক
প্রকাশক ঃ ঢাকা ঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন ১৯৮০, পৃঃ ২৫৮
২. ইকবাল মুহম্মদ ডঃ (উর্দু) বাংগ-ই-দারা।।
প্রকাশক, লাহোর ঃ শেখ গোলাম আলী এণ্ড সন্স ১৯৬৭, পৃঃ ২৯৬
৩. ইকবাল মুহাম্মদ ডঃ যারব-ই-কলীম।।
প্রকাশক, লাহোর ঃ শেখ মুবারক আলী তাজের, পৃঃ ১৫০
৪. আবদুর রহমান তারেক ঃ জাহান-এ-ইকবাল।। (উর্দু)
লাহোর ঃ মালিক দীন মুহাম্মদ এণ্ড সন্স ১৯৪৯, পৃঃ ৩৮৭
৫. ইকবাল মুহাম্মদ ডঃ (উর্দু), বাল-ই-জিবরীল।।
লাহোর ঃ শেখ গোলাম আলী এণ্ড সন্স ১৯৬২, পৃঃ ১৪৯
৬. ঐ ঃ বাংগ-ই-দারা।। পূর্বোক্ত, পৃঃ ২৯৭

ইকবাল সাহিত্যে নও-মুসলিম প্রসঙ্গ

মুহাম্মদ সাখী মিঞা

লেডী বার্লস ছিলেন এক নও-মুসলিম ইংরেজের স্ত্রী। আগে এই ইংরেজ দম্পতি এক মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়েছিলেন। এ ব্যাপারে তারা আমার নিকট এসেছিলেন। যেহেতু অভিযোগ মিথ্যা ছিলো। তাই, সামান্য হয়রানির পর আদালত তাদেরকে সম্মানের সাথে রেহাই দিয়েছিল। এর কিছুদিন পর আমাকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার জন্য লেডী বার্লস আমার কাছে আসলেন।

আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ "মেম সাহেব ! আপনার ইসলাম গ্রহণ করার কারণটা কি জানতে পারি"?

মেম সাহেব জবাব দিলেন ঃ মুসলমানদের ঈমানের পরিপক্কতা !

ডঃ সাহেব বললেন ঃ আমি একথার মর্ম বুঝতে পারলাম না।

মেম সাহেব বললেন ঃ "ডঃ সাহেব ! আমি পৃথিবীতে বিচরণ করে দেখেছি যে, সমস্ত ভূখণ্ডে এমন কোন জাতি নেই— যাদের মুসলমানদের মত ঈমান পাকা। ব্যস, এই জিনিসটিই আমার মনকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করেছে। কিছুক্ষণ থেমে মেম সাহেব আবার বলতে আরম্ভ করলেন ঃ আমি এক হোটেলের মালিক ছিলাম। একদিন সেখানে এক মেমের সাহেব খানা খেতে আসলো। আমি জানতে পারলাম, তিনি একজন মুসলমান। সেখানে তার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। এভাবে আমাদের মধ্যে কথাবার্তা আরম্ভ হলো। কিছুদিন পর আমরা পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হই। আমার হোটেলে একজন সত্তর বছর বয়স্ক বৃদ্ধ কাজ করতো। তার একমাত্র সুদর্শন যুবক ছেলে গেলো বছর মারা যায়। আমি যারপরনাই ব্যথিত হলাম। আমি সেই বৃদ্ধ লোকের নিকট সমবেদনা প্রকাশ করতে গেলাম। তাকে সান্ত্বনা দিলাম এবং আন্তরিক দুঃখ ও সহানুভূতি প্রকাশ করলাম। আমি লক্ষ্য করলাম, বৃদ্ধ অটলভাবে আমার বাক্যাবলী শ্রবণ করতে লাগলো, আর যখন আমি বিষাদের বাক্য শেষ করলাম, তখন তিনি কৃতজ্ঞতার ভঙ্গিতে আকাশের দিকে তর্জনী উত্তোলন করে বললেন ঃ "মেম সাহেব ! এটা আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত— নিয়তি। তিনি আমানত দিয়েছেন, আবার নিয়েছেন— এতে বিষাদগ্রস্ত হবার কোন কারণ নেই। আমাদেরকে সর্বাবস্থায় ক্ষমাশীল ও করুণাময়ের শুকরিয়া আদায় করাই উচিত"।

এটা বলে লেডী বার্লস কিছুক্ষণ থামলেন, মনে হলো যেন বড় একটি অলৌকিক ঘটনা বর্ণনা করলেন এবং আমার নিকট হতে প্রত্যাশা করছিলেন আমি যেন তার কথায় বিস্ময় প্রকাশ করি।

আমি বললাম, মেম সাহেব ! অতঃপর ?

মেম সাহেব পুনরায় তার কাহিনী আরম্ভ করলেন ঃ "ডঃ সাহেব ! সেই বৃদ্ধের তর্জনী উত্তোলন আমার মনে চিরদিনের জন্যে একটি রেখা কাটলো। আমি বৃদ্ধের কথার উপর বার বার চিন্তা

করতে লাগলাম এবং আশ্চর্যান্বিত হলাম এই ভেবে যে, ওগো খোদা ! এই দুনিয়ায় এরকম ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ ও অবিচলিত ব্যক্তিত্ব কি এখনো আছে ? আমি বিস্মিত হলাম যে, বৃদ্ধ মনের এ ধরনের দৃঢ়তা কোথায় পেল ? এ জন্য তাকে আমি জিজ্ঞেস করলামঃ মৃত ব্যক্তির কি ওয়ারিসান (উত্তরাধিকারী) আছে ? —একটি ছোট বাচ্চা এবং তার মা রয়েছে– এই উত্তরে আমি কিছুটা আশ্বস্ত হলাম। আমি মনে করলাম যেহেতু তার পৌত্র বিদ্যমান, এটাই একমাত্র তার মনকে শান্ত করবার জন্য যথেষ্ট। এই পৌত্রই তার জীবন ও ভালোবাসার একমাত্র সম্বল। কিন্তু, ডঃ সাহেব ! এই ধারণা কিছুদিনের মধ্যে বদলে গেল, যখন দেখলাম— বুড়ো মিয়ার মনের শান্তির উৎস অন্য কোথাও নিহিত।

একদিন খবর পেলাম সেই এতিম বাচ্চার মাও ইহলোক ত্যাগ করেছে। আমি মনে আরও দুঃখ পেলাম। বুড়োর পুত্রবধুর বিরহের যাতনায় আমি হতবুদ্ধি হয়ে যাই। এই সময় আমার মনে সেই পুরনো চেতনাবোধ জেগে উঠলো। আমি ভাবলাম, এবার বুড়ো মিয়ার পরীক্ষার সময় এসেছে। বুড়োর যুবক ছেলের মৃত্যু এবং তার পুত্রবধুর মৃত্যু ; উপরন্তু, শিশুটির অসহায় অবস্থা আমার মনকে অভিভূত করলো। অন্যদিকে, বুড়ো মিয়ার দীর্ঘ সেবার পেছনে কি রহস্য থাকতে পারে তা জানার জন্য আমি উদগ্রীব। তাই, স্বাভাবিক সহানুভূতি ও লৌকিক ভালবাসা ছাড়াও বুড়োর অন্তরের সেই বাস্তব অবস্থা অনুমান করার জন্য আমি মানসিকভাবে তৈরী হলাম।

পরদিন আমি বুড়ো মিয়ার গ্রামের বাড়ীতে রওয়ানা হলাম। সে সময় এক অদম্য আবেগ ও ভাব আমার হৃদয়ে আশ্রিত ছিলো। আমি প্রতিবারই অনুমান করছিলাম যে, সাম্প্রতিক ঘটনা বৃদ্ধকে কাহিল করে দেবে। হয়তো সে নিজের বার্ধক্য ও দারিদ্র্যের উপর চিন্তা করছে কিংবা এতিম পৌত্রের অপ্রাপ্ত বয়সের কথা চিন্তা করছে। এই মুহূর্তে তার হৃদয় হয়তো দুঃখের সাগরে মুহ্যমান। অপরদিকে, আমি এও ভাবলাম—এই নিষ্পাপ পিতৃ-মাতৃহীন পৌত্রের কথা তিনি যখন চিন্তা করবেন তখন নিজেকে কিভাবে সামাল দেবেন ? তিনি তার অশ্রুকে কিভাবে নিবারণ করবেন ? বার্ধক্য ও পৌত্রের অন্ধকারময় ভবিষ্যতের উপর কিভাবে প্রলেপ দেবেন ? এই ধরনের সহস্র প্রশ্ন আমার মনে দানা বাঁধতে লাগলো। আমার মনে এই সংশয়বোধ জাগলো ; হয়তো এবার বুড়ো মিয়ার সেই প্রথমবারের মত সহিষ্ণুতা ও দৃঢ়তা কিছুটা লোপ পাবে। এ ধারণার বশবর্তী হয়ে আমি বুড়ো মিয়ার ঘরে প্রবেশ করলাম। তার সদ্য ঘটে যাওয়া দুঃখের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করতে লাগলাম। কিন্তু, বুড়ো মিয়া শান্ত-নিশ্চলভাবে আমার বেদনাপূর্ণ কথা শ্রবণ করে উত্তর দিলেন। উত্তর দেয়ার সময় তর্জনী আকাশের দিকে উত্তোলন করে বলতে লাগলেন ঃ মেম সাহেব ! খোদার সিদ্ধান্তে কারো কোন হস্তক্ষেপ চলে না। তার মাল তিনি নিয়ে গেলেন, আমার বলার কিছুই নেই। আমাদের সব সময় সেই মালিকের কৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করা উচিত।

লেডী বার্লস এই কথা বলে আবার থামলেন। মনে হচ্ছিল, তিনি (লেডী বার্লস) আমার প্রতিক্রিয়া জানতে আগ্রহী। কিছুক্ষণ পর আবার বলতে আরম্ভ করলেন ! ডঃ সাহেব ! আমি যতক্ষণ সেই বুড়ো মিয়ার কাছে বসেছিলাম—না তার চোখে পানি দেখলাম, না তার মুখ

হতে 'আহ' শব্দটি পর্যন্ত শুনলাম। এমনকি, তার মুখমণ্ডল হতে অনুশোচনার ভাব প্রকাশ পেতেও দেখলাম না। বৃদ্ধ এমন নিশ্চিন্ত মনে কথা বলছিলেন যে, মনে হলো—তার একমাত্র পুত্র ও পুত্রবধুকে দাফন করেননি; তার জীবনের অনেক বড় ফরজ কাজ সম্পাদন করেছেন। কিছুক্ষণ পর আমি সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করলাম। আমি বুড়ো মিয়ার ঈমানের পরিপক্কতার উপর আশ্চর্যান্বিত হচ্ছিলাম এবং বার বার চিন্তা করতে করতে পরিশ্রান্ত হচ্ছিলাম। কিন্তু, এর কোন সমাধান খুঁজে পেতাম না। বুঝতে পারলামনা, এত কষ্টেও কোন লোক কিভাবে ঈমানের দৃঢ়তা বজায় রাখতে পারে।

কিছুদিন পর বৃদ্ধের একমাত্র মাসুম পৌত্রও অকালে প্রাণ হারালো। এ খবর পাওয়ার পর আমি আমার সমস্ত অনুমানের গ্রন্থিগুলোকে সংযুক্ত করে বিচলিত মনে তার গ্রামে গিয়ে পৌঁছলাম। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, এতক্ষণে হয়তো বৃদ্ধ নিঃসঙ্গতায় তার জীবন শেষ করে ফেলেছে। হয়তো নিজেকে সামলে রাখতে পারবে না। তার স্মৃতিশক্তি, জ্ঞানশক্তি হারিয়ে ফেলবে। তার হৃদয় ও মস্তিষ্ক অকর্মণ্য হয়ে যাবে। তার আশার সমগ্র রজ্জু ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাবে। এমনি উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠচিত্ত নিয়ে আমি বৃদ্ধের গৃহে প্রবেশ করে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে সমবেদনা প্রকাশ করতে লাগলাম। কিন্তু এটা দেখে অভিভূত হলাম যে, আমার বিস্ময় প্রকাশ বৃদ্ধের উপর কোন কার্যকর প্রভাব ফেলেনি। তিনি বসেছিলেন এবং সহজ-স্বাভাবিকভাবে আমার বক্তব্য শ্রবণ করছিলেন। আমার বক্তব্য শেষ হওয়ার পর বৃদ্ধ মুখ খুললেন। তিনি পূর্বের ন্যায় তর্জনী আকাশের দিকে উত্তোলন করে বলতে শুরু করলেনঃ "মেম সাহেব ! সবই খোদা তা'আলার লীলাখেলা। তিনি প্রদান করেছেন আবার নিয়ে গেছেন। এতে আমার আপত্তির কী আছে। আমার মন ভারি করার অবকাশ নেই। বান্দাকে সর্বাবস্থায় নিজের প্রভুর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। আমাদের মুসলমানদের উপর এই হুকুম ধার্য করা হলোঃ আমরা যেন ধৈর্যধারণ করতে পারি।"

এই সময় লেডী বার্লস আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লেন। তিনি নিজের দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করতঃ কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলেনঃ "ডঃ সাহেব ! বুড়ো মিয়ার এই জবাব ছিল আমার জন্য মৃত্যুর পয়গামস্বরূপ। বৃদ্ধের আকাশের দিকে উত্তোলিত তর্জনী তীরের ন্যায় আমার বুকে বিদ্ধ হচ্ছিল। তখনই আমি সেই দুর্বল বৃদ্ধের ঈমানের পরিপক্কতার সামনে চিরদিনের জন্য আত্মসমর্পণ করি। আমি বিশ্বাস করলাম, এই তৃপ্তিময় আত্মার শান্তি কৃত্রিম নয়; বরং, বাস্তব। তখনই আমি বললামঃ "ওগো বৃদ্ধ পিতা ! এখন আপনি একা গ্রামে থেকে কি করবেন ? আমার সঙ্গে হোটেলে চলুন এবং স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনটা কাটিয়ে দিন। বুড়ো মিয়া আমার আহ্বানে সম্মতি জানালেন এবং নির্দ্বিধায় আমার সঙ্গে চলে আসলেন। এখানে তিনি সমস্ত দিন কাজ করতেন এবং রাত্রে ইবাদতে মশগুল থাকতেন।

কয়েকদিন পর বৃদ্ধ বললেন ঃ আমি আজ কবরস্তানে যাবো। আমার মনে আবার সেই পরীক্ষাটি নেয়ার বাসনা জাগ্রত হলো। আমার মন বলছিলো যে, এটা জানা উচিত যে, এই বৃদ্ধের কাছে এত সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য কোথা হতে আসলো ? বুড়ো হোটেল হতে বের হয়ে সেই নির্জন-নিস্তব্ধ কবরস্তানে এসে পৌঁছলো, যেখানে তার তিন জন নিকটাত্মীয় শায়িত।

আমিও তাকে অনুসরণ করে একপাশে দাঁড়িয়ে গেলাম। বৃদ্ধ কবরস্তানে পৌঁছামাত্র দ্রুততার সাথে বিক্ষিপ্ত মাটিগুলো ঠিক করতে লাগলেন। কবর ঠিক হওয়ার পর অজু করে দোয়াতে নিমগ্ন হলেন। অবশেষে হোটেলে প্রত্যাবর্তন করলেন। আমি এতক্ষণ নিখুঁতভাবে তার প্রতিটি আচরণ অবলোকন করলাম। অনুভব করলাম, তার প্রতিটি কার্যে ঈমানের আলো ও দৃঢ়তা এবং মনের গভীরে শান্তির রশ্মি ও দৃঢ়তা বিদ্যমান। এখন আমার মনে একটি আলোড়ন সৃষ্টি হলো। মনে হলো, আমি কোন অদৃশ্য সঞ্চালক শক্তির দ্বারা চিন্তার সাগরে ডুবে গেলাম। এটা বুঝলাম, এটা বুড়ো মিয়ার সৌন্দর্য নয়, বরঞ্চ এটা সেই সত্য ধর্মের সৌন্দর্য, যা বৃদ্ধ বাল্যকাল হতে লালন করে আসছেন। বুড়োকে বললাম ঃ "আমি মুসলমান হবো"। কোন মুসলিম মহিলা আলেমকে নিয়ে আসতে বললাম– যিনি আমাকে শিক্ষা দেবেন। তৎক্ষণাৎ বুড়ো মিয়া স্থানীয় মৌলভী সাহেবের কন্যাকে ডেকে আনলেন। তাঁর কাছ থেকে আমি "লা ইলাহার ....সবক নিলাম।"

ডঃ সাহেব ! "এখন আমি খোদা তা'আলার অসীম রহমতে পুরোপুরি মুসলমান"। মেম সাহেব বললেন ! সেই সৌভাগ্য, পূর্ণ ঈমানের শক্তি–যার দ্বারা সেই বুড়ো মিয়ার মন পরিপূর্ণ ছিল তা এখন আমার বুকে পূর্ণরূপে বিদ্যমান। এখন খোদার উপর আমার এমন অগাধ বিশ্বাস যে, যতবড় বিপদই আসুক না কেন তা আমার পদযুগলকে এ পথ হতে কিছুতেই বিচ্যুত করতে পারবে না।

এই ঘটনা প্রসঙ্গে ডঃ ইকবাল বললেন, কেউ কেউ মনে করেন যে, প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর দ্বীনের তাবলীগ অধুনাকালে আর প্রয়োজন নেই– এ ধারণা নিতান্ত ভুল। রাসূল (সঃ)-এর তাবলীগ ক্ষণস্থায়ী বা সাময়িক ছিল না। যা হোক, হুজুর পাক (সঃ) কিয়ামত পর্যন্ত বিশ্বনবী এবং জগতবরেণ্য নেতা হিসেবেই চিরভাস্বর থাকবেন। তাঁর সমস্ত শক্তি, প্রতাপ-প্রভাব কিয়ামত পর্যন্ত অটুট ও বলবৎ থাকবেই।

মুহাম্মাদ (সঃ)-এর কঠোরতা, নম্রতা ও সৌন্দর্য স্পৃহা চিরঞ্জীব—চির জাগরুক। কিয়ামত পর্যন্ত তিনি মুজাহিদ, মুবাল্লিগ, মুছাল্লি ও রাহমাতুল্লিল আ'লামীন। তাঁর রূহানী ফায়েজ মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ ও কার্যকর। এটা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, আমাদের আধ্যাত্মিক যোগ্যতা এত সূক্ষ্ম নয় যে, নবী-জীবনের প্রতিটি কর্ম ও আমলকে আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুধাবন করতে বা নিজ জীবনে বাস্তবায়িত করতে পারি। কিন্তু এরপরও বলা যায়—কোন অন্ধ ব্যক্তি যদি দিন-রাত অনুভব করতে নাও পারে, তবুও সে সূর্যের আলো বা রাতের নিস্তব্ধতা থেকে বঞ্চিত নয়। নবী করীম (সঃ)-এর রূহানী ফায়েজ যার উপর বর্ষিত হয় তিনি তা সাথে সাথেই অনুভব করতে পারেন এবং এটাও অনুধাবন করতে পারেন যে, পৃথিবী থেকে নবী করীম (সঃ) বিদায় নিলেও তাঁর রূহানী ফায়েজ পৃথিবীতে সার্বক্ষণিক ভাস্বর, তিনি হায়াতুন্নবী। নবী জীবনে আমরা দেখতে পাই, একদিকে তিনি জিহাদে শরীক হয়েছেন, অনাথ-এতীম বিধবার সাহায্য করেছেন, আবার দ্বীনি তাবলীগের মাধ্যমে পথহারাদের সত্যের সন্ধান দিয়েছেন।

ডঃ ইকবাল বলেছেন, কিছু দিন আগে এক ধনাঢ্য, উচ্চ শিক্ষিত হিন্দু ব্যবসায়ী মাওলানা

আসগর আলী সাহেবের দরবারে উপস্থিত হলেন। মাওলানা সাহেব তখন লাহোরে ইসলামিয়া কলেজের প্রফেসর। তিনি মাওলানা সাহেবকে নির্জনে আলাপ করার কথা বললে মাওলানা তাকে খাস কামরায় নিয়ে গেলে হিন্দু ভদ্রলোক তার ইসলাম গ্রহণের আগ্রহের কথা মাওলানাকে জানালেন। মাওলানা সাহেব তাকে ইসলামের শিক্ষা, গুণাবলী, একত্ববাদ, রিসালাত ও নবুওয়ত সম্পর্কে অবহিত করলেন। হিন্দু ভদ্রলোককে ইসলামে দীক্ষিত করানোর পর মাওলানা সাহেব তাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ আপনি এভাবে একাকী, গোপনে মুসলমান হলেন কেন ? জবাবে তিনি জানালেন, আমি ইসলাম সম্পর্কে কোন বই পড়িনি বা কখনোই কোন আলেম-সুফী বা পীর-মাশায়েখের শরণাপন্ন হইনি। আজ রাতে আমার হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর যিয়ারত নসীব হয়েছে। এতদূর থেকে লাহোরে আসার কারণ জিজ্ঞেস করায় তিনি জানান, আমার চাকরি এবং বিষয়-সম্পত্তির কারণে প্রকাশ্যে ঘোষণা দেয়া সম্ভব নয়; অথচ আমার ইসলাম গ্রহণে সাক্ষীর প্রয়োজন; আমি আপনাকেই আমার সাক্ষী হিসেবে গ্রহণ করলাম। বহুদিন থেকেই আমি একজনকে সাক্ষী রেখে ইসলাম গ্রহণের আকাঙ্খা মনে লালন করে আসছিলাম। আমার সে আকাঙ্খা আজ পূর্ণ হলো। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ পাকের দরবারে আমার ইসলাম গ্রহণের পক্ষে আপনাকেই সাক্ষ্যরূপে উপস্থাপন করবো।

ডঃ সাহেব বললেনঃ এসব ঘটনার প্রেক্ষিতে অনায়াসে উপলব্ধি করা যায় যে, আল্লাহ্ তা'য়ালা কিভাবে, কাকে, কখন তাঁর দিকে আকৃষ্ট করেন। এই বিশেষ দুটো ঘটনাই আমার জানা ছিলো। কিন্তু পৃথিবীর অপরাপর দেশে এমনকি এদেশের আনাচে-কানাচে এ ধরনের অসংখ্য ঘটনা অহরহই ঘটছে। এসব ঘটনা যদি সংকলন করে পুস্তকাকারে প্রচার করা হয় তা হলে ইসলাম প্রচার–প্রসারে তা হতো আরেকটি উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা।

বিশ্ব-গৌরব ইকবাল

আবদুল ওয়াহিদ

"ধূলার ধরণী ছেড়ে চলিনু যেদিন
বল্লে সবাই—ছিলেন তিনি
মোদের আপনজন।
কিন্তু কেহ চিনেনিক এই মুসাফিরে
বল্লে কী বা কাহার কাছে,
এলো কোথা থেকে"।

(তরজমা ঃ মীজানুর রহমান)

মহাকবি আল্লামা মুহাম্মাদ ইকবাল তাঁর স্বরচিত কাব্যখণ্ড কবরে লেখার জন্য অছিয়ৎ করে গেছেন।

ইকবাল মহাকবি, আধ্যাত্মবাদী দার্শনিক, উদারপন্থী সংস্কারক—তাঁর খ্যাতি বিশ্বজোড়া। বিশ্বজনীন আবেদনকুশল এ কবি ১৮৭৭ সালের ৯ই নবেম্বর পাঞ্জাবের শিয়ালকোটে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন ইতিহাসের চরম অশান্ত সন্ধিক্ষণে। ইকবাল প্রতিভার মূল্যায়নে এযাবত যে গবেষণা অব্যাহত রয়েছে বিশ্বের অন্য কোন মনীষী সম্পর্কে তেমনটি হয়েছে বলে অন্তত এ প্রবন্ধকারের জানা নেই।

ইকবাল শিয়ালকোটে লেখা-পড়া শেষ করে ২২ বছর বয়সে লাহোরে চলে আসেন লেখা-পড়া করার অদম্য স্পৃহা নিয়ে। হতাশাদীর্ণ মিল্লাত, অশান্ত প্রেক্ষাপটের করুণ পরিস্থিতি নিরীক্ষণ করে তিনিও অনুভূতিপ্রবণ আর সব তরুণের মত হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। তদানীন্তন বিশ্বপরিস্থিতে মুসলিম জগতের শোচনীয় অধঃপতন সম্পর্কে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ সজাগ। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে লক্ষ করলে দেখা যায়, তুর্কী সাম্রাজ্য তখন নামেমাত্র ইসলামী রাষ্ট্র ছিলো। পূর্ব ইউরোপ থেকে ইসলাম হচ্ছিলো ক্রমে নির্বাসিত। দক্ষিণ রাশিয়ার মুসলিম রাষ্ট্রগুলো একে একে রুশ-সম্রাট গ্রাস করছিলো। চীনের মুসলমানরাও নিজেদের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা হারিয়ে হতাশাদীর্ণ হয়ে পড়েছিল। মিসর করায়ত্ত করে রেখেছিল বৃটিশ। মরক্কো দখল করার ফন্দিতে ছিলো ফ্রান্স। *প্রাচ্যের জেনেভা ইরান* মুমূর্ষু অবস্থায় দিন গুজরান করছিলো। ওলন্দাজদের উৎপীড়নে ইন্দোনেশিয়ার মুসলিমরাও পারছিলো না মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে।

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লবের পর হতে পাক-ভারতীয় মুসলামানদের ভাগ্যেও নেমে

এসেছিল চরম দুর্দিন।

এমনি পরাজয় ও নিঃসহায় অবস্থার মধ্যে পাক-ভারতীয় মুসলমানদের আশা-ভরসার উৎস ছিলো ওসমানিয়া (অটোমান) সাম্রাজ্য। তুর্কীরাই তখন সংকীর্ণ পরিসরে কিছুটা নিজেদের স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখতে সক্ষম হয়েছিল। অবশ্য, পাশ্চাত্য হায়েনার লোলুপদৃষ্টি সেখানেও গিয়ে পড়েছিল; মুসলমানদের এই শেষ সম্বল—স্বাধীন রাষ্ট্রকেও তারা গ্রাস করতে থাবা উত্তোলন করে বসলো। বৃটিশ শক্তি তুর্কীর বিরুদ্ধে গ্রীকদের দিলো লেলিয়ে। এতে পাক-ভারতীয় মুসলিম মাত্রেই বৃটিশ বেনিয়াদের উপর রূঢ় হয়ে উঠেছিলেন।

স্যার সৈয়দ আহমদ ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লবের কঠোর বাস্তবতার কথা তখনো বিস্মৃত হতে পারেননি। তিনি ভাবলেন, তুর্কীর প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে বৃটিশকে ক্ষেপিয়ে তুললে পাক-ভারতীয় মুসলমানরাও বৃটিশের রূঢ়তার শিকার হবে। ফলে, বৃটিশের সাথে ভারতীয় মুসলমানদের মিতালীর সম্ভাবনাময় যে সৌধ রচিত হতে যাচ্ছিলো তা ব্যাহত হয়ে যেতে পারে। সেহেতু, তিনি দক্ষিণ এশিয়া উপমহাদেশের মুসলমানদের মুসলিম জাহানের রাজনীতিতে কোনরূপ সক্রিয় অংশগ্রহণ করা হতে বিরত থাকতে উপদেশ প্রদান করেন। অনুরূপভাবে ১৮৮২ সালে বৃটিশ যখন *প্রাচ্যের অগ্নিপুরুষ বীর মুজাহিদ জামালউদ্দীন আফগানীকে* মিসর থেকে নির্বাসিত করে পাক-ভারতে আটক করে রাখে, তখনো স্যার সৈয়দ আহমদ ও তাঁর অনুসারীরা জামালউদ্দীন আফগানীকে একই কারণে কোনরূপ সাহায্য করেননি। জামালউদ্দীন আফগানী মুসলিম বিশ্বে *'প্যান ইসলাম'* বা বিশ্ব মুসলিম ঐক্য আন্দোলন চালাচ্ছিলেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো, বিশ্বব্যাপী মুসলিম জাতির এই পতন রোধ করতে হলে সব মুসলমানকে এক কাতারে এসে দাঁড়াতে হবে। তা না হলে ইউরোপের বিশ্বগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদের নাগপাশ হতে মুসলমানদের রক্ষা করার দ্বিতীয় কোন পথ নেই। ইসলামের এ বীরসেনানী শুধু মুখেই ঐক্যের বাণী প্রচার করেননি, কার্যতও বিভিন্ন দেশে মুক্তি আন্দোলন দাঁড় করাতে সমর্থ হয়েছেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো, এ পথেই মুসলিম জাহানের আযাদীর সোনালী সূর্য উদিত হবে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, স্যার সৈয়দের উপদেশ সত্ত্বেও পাক-ভারতের একদল মুক্তিকামী মুসলিম তরুণ জামালউদ্দীনের অকৃত্রিম বলিষ্ঠ ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠেন। এই তরুণ দলের পুরোভাগে ছিলেন আধুনিক বিশ্বে ইসলামের মর্মবাণীর সার্থক ব্যাখ্যাকার, ইসলামী রেনেসাঁস আন্দোলনের সফল মুজাহিদ, মানবতার মুক্তিকামী বিদ্রোহী সেনানী আল্লামা ইকবাল।

এখানে বলা দরকার যে, ১৮৮৯ থেকে ১৯০৪ সাল পর্যন্ত ইকবাল কাব্যে ধ্বনিত হয়েছে ব্যর্থতার সুর। নিরাশার একটা করুণ আর্তি তখন যেনো মুসলিম-ভারতের আকাশ-বাতাসকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

১৯০৫ থেকে ১৯০৮ সাল পর্যন্ত ইকবাল ছিলেন ইউরোপে। প্রাচ্য-প্রতীচ্যের শিক্ষা-দীক্ষা, কৃষ্টি-কালচার হজম করে— নিরীক্ষণ করে দেশে ফিরে প্রেক্ষাপটের করুণ দৃশ্য দেখে তিনি পরিষ্কার এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, *ঐক্য ও সংহতি* ব্যতীত মুসলমানদের বাঁচার দ্বিতীয় কোন পথ নেই। এবার তিনি বলিষ্ঠ কণ্ঠে মুসলিম মিল্লাতকে কাব্যের মাধ্যমে আহবান

জানালেন এভাবেঃ

توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے
آساں نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا

শক্তিমন্ত্র তৌহিদ আছে লুকানো আমার হৃদয় তলে,
সহজ নহেক মিটানো আমার নাম ও নিশানা ছলে কি বলে।

تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے ہیں
خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا

শিশুকাল হতে হয়েছি জোয়ান তরবারি ছায়া শিরেতে ধরে,
নতুন চাঁদের খঞ্জর শোভে আমার জাতীয় পতাকা পরে।

مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری
تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا

ইয়োরোপ-ভূমে গিরি-প্রচ্ছায় ধ্বনিয়া তুলেছি আজান সুর,
কিছুতে পারেনি ধাবমান গতি রুখিতে আমার লক্ষ্য দূর।

باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم
سو بار کر چکا ہے تو امتحاں ہمارا

মিথ্যার কাছে পরাজিত হব ? দৈববিপাক, আমি যে নই,
শতবার তুমি পরখ নিরিখ করিয়াছ যারে, আমি সে হই।

اے گلستان اندلس وہ دن ہیں یاد تجھ کو
تھا تیری ڈالیوں میں جب آشیاں ہمارا"

আন্দালুসের ফুল বন ওগো, সেদিন কি তব মনেতে পড়ে ?
যেদিন তোমার শাখায় শাখায় নীড়গুলি মোর আছিল ভরে।

اے موج دجلہ! تو بھی پہچانتی ہے ہم کو
اب تک ہے تیرا دریا افسانہ خواں ہمارا

দজলার ওগো অধীর উর্মি, দেখ তো চাহিয়া চেন কি মোরে ?
তোমারি প্রবাহে শোন কান পাতি, আজো কে আমারে স্মরণ করে।

(তরজমাঃ মনির উদ্দীন ইউসূফ)

১৯১০-১১ সালের কথা। বলকান রণক্ষেত্র হতে তখন মুসলিমরা বিতাড়িত হচ্ছিলো। ইরান মরণাপন্ন। ত্রিপলী মুসলিম শোণিতে রঞ্জিত। ইসলামী আযাদ রাষ্ট্রের যে স্বপ্ন ইকবালকে কুরে কুরে খাচ্ছিলো—সেই ইসলামী খেলাফতের নির্বাণোন্মুখ প্রদীপ চিরতরে নির্বাপিত হবার এবং ইসলামের .রাষ্ট্র ক্ষমতা ও সার্বভৌমত্ব নির্মূল হবার উপক্রম হতে দেখে ইকবাল গেয়ে

উঠলেন ঃ

دیارِ عشق میں اپنا مقام پیدا کر
نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر

প্রেম দুয়ারে নীড় বাঁধো হে
তৈরী করো যুগ নবীন
সৃষ্টি করো নতুন সকাল
নতুন সন্ধ্যা ক্লান্তহীন

(তরজমাঃ মতিউর রহমান মল্লিক)

এমনিভাবে ইকবাল-কাব্যে ধ্বনিত হতে লাগলো অগ্নিসুর—যার স্পর্শে মুসলিম মনে প্রচণ্ড দোলা লাগলো। যুব সম্প্রদায়কে স্মরণ করিয়ে দিয়ে ইকবাল মারলেন কাব্যের চাবুক ঃ

کبھی اے نوجواں مسلم! تدبر بھی کیا تو نے
وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے اک ٹوٹا ہوا تارا"

দেখেছো কি চিন্তা করে
হে মুসলমান নওজোয়ান
কোন আকাশের বিচ্ছুরিত
তারা তুমি জ্যোতিষ্মান

(তরজমাঃ মতিউর রহমান মল্লিক)

وضع میں تم ہو نصاریٰ تو تمدن میں ہنود
یہ مسلماں ہیں! جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود!

চলন তোমার খৃষ্টানী, আর হিন্দুয়ানী সে তমদ্দুন,
ইহুদীও আজ শরম পাইবে দেখিলে তোমার এসব গুণ।

(তরজমাঃ গোলাম মোস্তফা)

یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو
تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو"

হতে পার তুমি সৈয়দ মির্জা, হতে পার তুমি সে আফগান।
সব কিছু হও, কিন্তু শুধাই বলত তুমি কি মুসলমান ?

(তরজমাঃ গোলাম মোস্তফা)

অশান্ত এই পরিবেশ-পরিস্থিতির মধ্যেই ইকবাল রচনা করেন *শেকোয়া-জওয়াবে শেকোয়ার* মতো আবেদনকুশল, ইতিহাস-ঐতিহ্যে মণ্ডিত, অনিন্দ্যসুন্দর কাব্য। তিনি আরো উপহার দিলেন বীর মুজাহিদীনকে *'তারাবালুস কি শহীদুঁ কা লহু'*— ত্রিপলীর বীর শহীদানের রক্ত। ১৯১১ সালের ৬ই অক্টোবর তিনি লাহোরের শাহী মসজিদে *'খুনে শহীদাঁ কি নাম'*—শহীদদের

রক্তের নামে— শীর্ষক যে কবিতা পাঠ করে শুনিয়ে ছিলেন তাতে সভাস্থলে সবাই বুকফাটা কান্নায় মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলো,বাঁধ ভাঙা অশ্রু বন্যায় দু'চোখ ভাসিয়ে ছিলো। তাদের হৃদয় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিলো। *জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর* যে আহবান ইকবাল জানিয়েছেন তাঁর কাব্যের মাধ্যমে তাতে দল-মত নির্বিশেষে সবাই আল্লাহর সার্বভৌমত্ব রক্ষাকল্পে, আযাদ রাষ্ট্র ছিনিয়ে আনার লক্ষ্যে, কোরআনের শাসন প্রতিষ্ঠার অদম্য স্পৃহায় বাতিলের তাগু তি জিঞ্জির ভেঙে চুরমার করে খান খান করার দৃপ্ত কঠিন শপথে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠলেন, শহিদী শারাব পান করার জন্য বজ্র-কঠিন শপথ নিলেন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। ইকবাল হতাশাদীর্ণ মুসলিম জাতিকে একজন নকীব ও দ্রষ্টার ন্যায় সঠিক পথ-নির্দেশ দিয়ে নিয়ে আসলেন মানযিলে মাকছুদের দিকে। উপর্যুপরি দিলেন অমীয় কাব্য উপহার ঃ

ماسوا اللہ کے لئے آگ ہے تکبیر تری
تو مسلماں ہو تو تقدیر ہے تدبیر تری

অগ্নিবাণী—সে তকবীর তব উজল করিবে সারা জাহান,
মুসলিম হলে তদবীরই তব হইবে তকদীরের সমান।

(তরজমাঃ গোলাম মোস্তফা)

کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسا
مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی

সব কাফেরই যুদ্ধ করে
ভরসা তার তলোয়ার
মোমিন সে তো ঝাঁপিয়ে পড়ে
হোক না খালি হাত তাহার

(তরজমাঃ মতিউর রহমান মল্লিক)

اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی
تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن!

যাও ডুবে আজি আপন মাঝে তুলতে গোপন রত্ন বিভব,
আমার যদি না হও তুমি, হওনা কেন নিজের আপন

(তরজমাঃ ফররুখ আহমদ)

মুসলিম সমাজ ইকবালের কাব্য শ্রবণে ইতিহাস-ঐতিহ্য, হৃৎগৌরবের কথা স্মরণ করে আফসোস করলো। আবেদনকুশল ইকবালের কাব্য সার্বিকভাবে সমাদৃত হবার পেছনে যে কার্যকারণটি ছিলো তা হলো ঃ

শব্দ-সংগীতে, দার্শনিকতায়, চিন্তার মৌলিকতায়, অনুভূতির গভীরতায়, উপমার চমৎকারিতায়, কাহিনী সৃষ্টির নিপুণতায় এবং ঐতিহ্যের প্রয়োগ কৌশলে তাঁর গোটা কাব্যসম্ভার এক অনবদ্য সৃষ্টি।

মূলত তিনি সাংস্কৃতিক জগতের মহান নেতা, মুসলিম রেনেসাঁস আন্দোলনের নিশানবরদার, জ্ঞান-বিজ্ঞান-চিন্তা ও গবেষণার উচ্চতম মার্গে অবস্থিত এক বিশেষ মর্যাদার অধিকারী।

ইকবাল-চিন্তার বুনিয়াদ হলো মহাগ্রন্থ আল-কুরআন এবং হাদীস শরীফ। ইসলামকে তিনি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। এর জন্য তাঁকে অধ্যয়ন করতে হয়েছে জীবনব্যাপী। ১৯৩০ সালের ২৯শে ডিসেম্বর নিখিল-ভারত মুসলিম লীগের এলাহাবাদ অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে তিনি বলেছিলেন ঃ

*"আমি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ ব্যয় করেছি ইসলামের সযত্ন অধ্যয়ন—ইসলামের কানুন ও রাষ্ট্রব্যবস্থা, তার তমদ্দুন, তার ইতিহাস ও সাহিত্য অধ্যয়নে। আমার মনে হয় ইসলামের প্রাণবস্তুর সাথে এই অবিরাম সংযোগের ফলে তা আমার উপলব্ধিতে যেভাবে প্রকাশ লাভ করেছে তার ফলে বিশ্বজনীন সত্য হিসেবে ইসলামের তাৎপর্য সম্পর্কে আমি এক ধরনের **অন্তর্দৃষ্টির** অধিকার লাভ করেছি।"*

এখানে তাঁর নিম্নোক্ত পংক্তি উদ্ধৃত করা সংগত মনে করি ঃ

تماشا محروم کو دیدہ بینا دے
ہیں جو کچھ دیکھا اوروں کو دکھلا دے

দৃষ্টিশক্তি দাওগো প্রভু
ভাগ্যাহত মানুষদের
দেখেছি হায় এই আমি যা
দাও দেখিয়ে তা তাদের

خدایا آرزو میری یہی ہے
مرا نور بصیرت عام کر دے

হে খোদা মোর প্রার্থনা এই
তোমার দুয়ারে
খুব সাধারণ অন্তর-চোখ
দাওগো আমারে

(তরজমাঃ মতিউর রহমান মল্লিক)

কুরআনুল করীমের *'তাফাক্কুহ ফিদ্দীন'*-এর যে বার্তা ঘোষিত হয়েছে তা ইকবালের বেলায় প্রযোজ্য বলেই বিশ্বাস। ইলমে দ্বীন-এর যে ফরজিয়াতের কথা ঘোষিত হয়েছে কুরআনে, ইরশাদ হয়েছে হাদীস শরীফে— তার পাক্কা অনুসারী হয়েছিলেন তিনি। অনেকটা সফল হয়েছেন বললেও অত্যুক্তি হবে না। তবে, তাঁর শৈল্পিক ভঙ্গিতে তিনি আবেদন রেখেছেন, উছূলে তাফসীর, উছূলে হাদীস, উছূলে ফিক্‌হ ইত্যাদির প্রতি তিনি তেমন গুরুত্ব দেননি। তবে তিনি ইমাম আজম হযরত আবু হানীফা (রঃ)-এর ছিলেন একনিষ্ঠ মুকাল্লিদ। তথাপিও তিনি ইজতিহাদের ব্যাপারে ছিলেন পাগলপারা। ইজতিহাদ যে পরিবর্তনশীল— এটা প্রত্যয়ের সাথে তিনি ব্যক্ত করে *'দ্য রিকনস্ট্রাকশন অব রিলিজিয়াস থট ইন ইসলাম'* সংকলন

গ্রন্থের ভূমিকার শেষে তিনি লিখেছেন ঃ

"একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, দার্শনিক চিন্তাজগতে পরিপূর্ণতা কখনই আসতে পারে না। জ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে চিন্তাধারার নতুন পথ যখন খুলে যাবে, তখন আজ আমি যা বলছি তার থেকে ভিন্ন এমনকি তার চেয়ে অধিকতর যুক্তিগ্রাহ্য মতামত উদ্‌ভাসিত হওয়া কিছুই বিচিত্র নয়। আমাদের কর্তব্য হচ্ছে মানুষের চিন্তাধারার প্রতি সযত্ন দৃষ্টি এবং তার সম্বন্ধে একটি স্বাধীন সমালোচনামূলক মনোভাব রক্ষা করে চলা।"

ইজতিহাদ প্রসঙ্গে তাঁর মতামত হলো ঃ

''যে ব্যক্তি আল-কুরআনের নিয়ম-নীতির উপর মানুষের নির্ভেজাল কল্যাণের জন্য সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও খেয়াল এবং বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ইজতিহাদ করবে সে-ই প্রকৃত অর্থে ইসলামের খাদেম"।

১৯২৮ সালে হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ আনোয়ার শাহ্ কাশ্মীরী (রঃ) দেওবন্দ দারুল উলুম মাদ্রাসার মুহতামিমের পদ থেকে ইস্তফা দিলে ইকবাল তাঁকে লাহোরে আসার আমন্ত্রণ জানিয়ে ইসলামী আইন প্রণয়নের কাজে তাঁকে সহযোগিতা করার আবেদন করে বলেন ঃ

"আমি স্বয়ং এ কাজ করা শুরু করলেও এতবড় দায়িত্বপূর্ণ কাজ একা আমার দ্বারা সম্ভব নয়।"

আল্লামা ইকবালের ব্যাপারে মাওলানা আনোয়ার শাহ্ কাশ্মীরী (রঃ)-এর ধারণা সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে মাওলানা মুহাম্মদ কাদেরী লায়েলপুরী লেখেন ঃ

"مولانا محمد انور شاہ نے ان سے فرمایا کہ کسی مولوی نے
مجھ سے اقبال سے بڑھ کر استفادہ نہیں کیا"

"মাওলানা আনোয়ার শাহ্ কাশ্মীরী (রঃ) তাঁকে বলেছিলেন ঃ কোন মৌলভী (আরবী শিক্ষাবিদ) আমার থেকে ইকবালের চাইতে বেশী উপকৃত হতে পারেনি।"

ইকবাল ইসলামী আইন সমকালীন আবেদনের উপর প্রণয়নের জন্য তদানীন্তন জ্ঞানী, ধ্যানী ও গুণীজনদের আহ্বান জানিয়েছিলেন। এ জন্য তিনি ইসলামের মৌলিক শিক্ষার জন্য গবেষণাগার স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি জনাব নিয়াজ আহমদকে একবার লিখেছিলেন ঃ

"ইসলাম ধর্মের মূল ভাবগুলোর সঙ্গে পরিচয় ঘটাবার জন্য একটি শিক্ষা কেন্দ্রের প্রয়োজন। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, আধুনিক যুবক সমাজ এ সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন। অন্ততপক্ষে মুসলমানদের জন্য ধর্মহীন শিক্ষা সর্বনাশের কারণ।"

পাশ্চাত্য ফিরিঙ্গী সভ্যতার প্রতি তাঁর ক্ষোভ ব্যক্ত করে তিনি বলেন ঃ

"দুঃখের বিষয়, পাশ্চাত্য জাতিসমূহ ইসলামী দর্শন সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। আমার অবকাশ হলেই আমি একখানা বৃহদাকার গ্রন্থ রচনা করে ইউরোপীয় দার্শনিকদের জানিয়ে দিতাম যে, আমাদের ও তাদের দর্শনের মধ্যে কত ঐক্য ও সামঞ্জস্য বিদ্যমান।"

মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদীকে এক পত্রে ইকবাল লিখেছেনঃ

"আপনি নিজে ধর্মসংক্রান্ত বিষয় নিয়ে ছাত্রদের সাথে আলোচনা করলে ভাল ফল হবে বলে আমার বিশ্বাস।.... মুসলিম যুবকদের মনে ইসলামের জন্য যে দরদ রয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আমাদের সমাজের মধ্যে এমন কোন লোক নেই যার জীবনাদর্শ সে সব তরুণ মনের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে।"

মাওলানা সাইয়্যেদ সোলায়মান নদভী (রঃ)-কে ইকবাল লিখেছেন ঃ

"আমি আপনাকে সত্যি সত্যি জানাতে চাই যে, মুসলিম জগতের বর্তমান অবস্থা দেখে আমার হৃদয়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। এহেন বেদনাদায়ক চাঞ্চল্যের কারণ এই যে, আমার সদা ভয় হয় বর্তমানের মুসলমান যুবকগণ পাছে অস্থিরভাবে পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ে। কিছুদিন পূর্বে এক শিক্ষিত আরববাসীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল। তিনি ফারসী ভাষায় অনবরত কথা বলে চলেছিলেন। কিন্তু ইসলাম সম্বন্ধে দেখতে পেলাম একেবারে অজ্ঞ। এসব ঘটনা চোখে পড়লে মনে সত্যি সত্যি দুঃখ না হয়ে পারে না।"

এক চিঠিতে স্যার রাস মাসউদকে তিনি লিখেন ঃ

ঐশ্বর্যের কোলে আড়ম্বরপূর্ণ জীবন-যাপনে আমি অভ্যস্ত নই। সত্যিকারের মুসলমানরা সাদাসিধা এবং সংসার ত্যাগীদের ন্যায় জীবন যাপন করে গেছেন। প্রয়োজনের অতিরিক্ত লোভ করা কোন মুসলমানের পক্ষেই শোভা পায় না, আমার এই চিঠির কথাগুলোতে আপনি আশ্চর্য হবেন না। কারণ, আপনি যে বংশের ছেলে, স্যার সৈয়দ আহমদের নাতি, আর যাঁরা ছিলেন আমাদের সকলেরই আদর্শস্থানীয়— সেই মহাত্মাদের জীবনযাত্রা ছিল এমনই সরল, এমনই আড়ম্বরহীন।"

আল্লামা ইকবাল মাওলানা সোলায়মান নদভী ও সূফী গোলাম মোস্তফার কাছে লেখা চিঠিতে আশাবাদ ব্যক্ত করে লিখেছেন ঃ

"সে সুপ্রসন্ন সময় অতি নিকটে, যখন এ অঞ্চলের মুসলমানগণ শত শত বছরের গোলামীর জিঞ্জির থেকে মুক্তি লাভ করবে। নিরন্ধ্র অন্ধকারে জ্বলে উঠবে আশার আলো। পৃথিবীর সব শক্তির উপর চ্যালেঞ্জ করে একটি অনন্য আদর্শ মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। সে চ্যালেঞ্জ প্রতিযোগিতায় ইসলামী আদর্শই বিজয়ী হবে।"

এই ইসলামী আদর্শকে বিজয়ী করার জন্য আন্দোলন চালাবার নিমিত্ত গাইডলাইন দিতে গিয়ে ১৯৩০ সালের এলাহাবাদের ভাষণে বলেন ঃ

"সুতরাং এটা সুস্পষ্ট যে, ভারতে আবহাওয়া, জাতি, ভাষা, ধর্মমত, সামাজিক পদ্ধতির অসংখ্য বৈচিত্র্য বিবেচনায় ভাষা, জাতি, ইতিহাস, ধর্মের ঐক্য ও অর্থনৈতিক স্বার্থের সাদৃশ্যের বুনিয়াদে স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্রসমূহ গড়ে তোলাই হচ্ছে ভারতে এক স্থায়ী শাসনতান্ত্রিক কাঠামো কায়েম করবার একমাত্র সম্ভাব্য পন্থা।"

এ জন্য লিডার নির্ধারণে১৯৩৭ সালের ২১ শে জুন কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ (রঃ) -কে লেখেন ঃ

"........ আমি জানি, আপনি খুব ব্যস্ত মানুষ, কিন্তু আমি যে বার বার আপনার কাছে চিঠি লিখি, তার জন্য আশা করি আপনি কিছু মনে করেন না। কারণ, উত্তর-পশ্চিম ভারতে এবং

সম্ভবত সমগ্র ভারতে আজ যে আসন্ন ঝড়ের পূর্বাভাস দেখা যাচ্ছে, তাতে আপনিই একমাত্র মুসলিম, নিরাপদ পথ-নির্দেশের জন্য জাতি যাঁর মুখের দিকে তাকাতে পারে।"...

ইসলামী আইন প্রণয়ন, ইজতিহাদ ও ইসলামের মৌলিক বিধানাবলী গবেষণার জন্য তিনি আরবী শিক্ষিতদের আহবান জানিয়েছেন। আলীগড় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদেরও একীভূত করার প্রয়াস চালিয়েছিলেন। তাঁর তদানীন্তন সময়কার আপ্রাণ প্রচেষ্টার একটি উৎস মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী (রঃ)-এর নিম্নের আবেগাপ্লুত উদ্ধৃতি ঃ

"১৯৩৬ *সালের শেষের দিকে আল্লামা ইকবাল আমাকে পাঞ্জাবে চলে আসার আমন্ত্রণ জানান এবং ওয়াদা করে বলেন, তুমি যদি এখানে এসে বসে যাও তা'হলে আমি বছরে ছ'মাস এখানে কাটাবো, তাঁর এ কথায় এমন আকর্ষণ ছিলো যে, এ প্রস্তাব আমি সাথে সাথেই মেনে নিলাম এবং হায়দারাবাদ থেকে পাঠানকোট চলে এলাম, কিন্তু এ গোটা কাহিনীর ট্রাজেডী এই যে, মার্চে আমি পাঠানকোট এলাম, আর এপ্রিলে আল্লামা ইন্তেকাল করেন"।*

তাঁদের মধ্যেকার ভাব কি ছিল তা অনুমেয় হবে মাওলানার নিম্নের উদ্ধৃতিতে ঃ

"আল্লামার ইন্তেকালে আমি ভাবলাম তাঁর পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করে শোকবার্তা পাঠাবো, পরে চিন্তা করে দেখলাম তাঁর সন্তান তো আমরাই, আমাদের সবাইকে এতীম করে তো তিনি চলেই গেছেন"।

ঠিক সে সময়েই মাওলানা লেখেন, *"হায়াতে ইকবাল কা সবক"*—ইকবাল জীবনের শিক্ষাশীর্ষক প্রবন্ধ। এমনিভাবে তিনি অন্যান্য প্রবন্ধও লেখেন।

ইকবাল ছিলেন মর্দে মুজাহিদ। ইসালমী রেনেসাসঁ আন্দোলনের নিশানবরদার। এই সমর্থন মেলে মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম (রঃ)-এর নিম্নের উদ্ধৃতিতে ঃ

"পাক-ভারত-বাংলাদেশ ইসলামী আন্দোলনসমূহের উপর ইকবালের প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট। তাই রুশো ও ভল্টেয়ারের সাহিত্য ফ্রান্সে যে বিপ্লব সৃষ্টি করিয়াছে, এশিয়া কিংবা পাক-ভারত-বাংলা উপমহাদেশে ইকবালের সাহিত্যও যে একদিন অনুরূপ ইসলামী বিপ্লব সৃষ্টিতে সমর্থ হইবে তাহাতে ইকবাল সাহিত্যে অভিজ্ঞ কাহারও এক বিন্দু সন্দেহ থাকিতে পারে না।" (ষাটের দশকের লেখা)।

১৯১১ সালের ডিসেম্বরে অল ইণ্ডিয়া মোহামেডান এডুকেশন কনফারেন্সে সাইয়্যেদ মাওলানা শিবলী নোমানী (রঃ) ইকবালকে মাল্যদান প্রসঙ্গে বলেন ঃ

"....জাতির পক্ষ থেকে যে সম্মান আজ ডঃ ইকবালকে দেয়া হচ্ছে এটা তাঁর জন্য সম্মান এবং গৌরবের— মূলতঃ তিনি এ সম্মান পাওয়ার যোগ্যও।"

ইকবাল শুকরিয়া জানিয়ে বলেন ঃ

"আমার কবিতার ব্যাপারে কেউ কেউ ভুল ধারণা ছড়িয়ে দিচ্ছেন এবং আমাকে প্যান ইসলামিজম আন্দোলনের মুখপাত্র হিসেবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করছেন। মূলত আমার প্যান ইসলামিস্ট হবার স্বীকারোক্তি আছে বৈ কি। আমার এ বিশ্বাসও আছে যে, আমাদের জাতি একটি গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতীক্ষায়। মিল্লাতের এবং ইসলামের যে মিশন তা অবশ্যই মানযিলে মাকছুদে পৌঁছতে সক্ষম হবে। তাগুতি শক্তি, শিরক ও বাতিলের চিহ্ন দুনিয়া থেকে

নিস্ত-নাবুদ হয়ে যাবে—আর ইসলামী ঝাণ্ডাই পতপত করে উড়বে একদিন। এ মিশনকে কেন্দ্র করে যে জোশ ও আকাঙ্ক্ষা আমার অন্তরে নিহিত রয়েছে তা-ই আমি কাব্যাকারে কাওমের কাছে পৌঁছে দিতে চাই। আমার পূর্বসূরীদের স্প্রিট আমার মধ্যেও দোলা দিক আমি তা-ই চাই......।"

ইকবাল স্বীয় আধ্যাত্মিক অভাববোধের প্রতি ছিলেন সজাগ। তিনি বলেন ঃ

"একটি বিশাল সমস্যার সম্মুখে আমি একক দাঁড়িয়ে, মনে হচ্ছে যেন একটি দিগন্ত বিস্তৃত আদিম অরণ্যে আমি পথ হারিয়ে ফেলেছি। আমি চাই সহায়তা, আমি চাই শিষ, আমি চাই ওস্তাদ, আদেশ পালনে যে কি প্রশান্তিই পেতে পারতাম।"

তাঁর এ অভাববোধে এগিয়ে এলেন আধ্যাত্মিক গুরু মাওলানা রুমী (রঃ)।

ইকবাল তাঁর দর্শনের স্বীকারোক্তি করে বলেনঃ

"আমার দর্শন প্রাচীন মুসলিম সুফী ও দার্শনিকদের প্রদত্ত শিক্ষার পরিসমাপ্তি ও পরিপূর্ণতা মাত্র। আরো স্বচ্ছ ভাষায় বলতে গেলে, এটা নতুন অভিজ্ঞতার আলোকে পুরাতনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ মাত্র।

তিনি বলেন ঃ

"আমার চেয়ে বেশী দেখতে পেয়েছেন এবং নীচের দিকে চেয়ে তবে আমাকে দেখতে হয়, এমন কাউকে কেন জীবিত মানবসমাজে দেখতে পাচ্ছিনে ? আমার কি আজো ভালো করে খুঁজে দেখা হয়নি বলে? অথচ কত অসীম আগ্রহে আমি এমন একজনকে খুঁজে ফিরছি"

অবশ্য এর পরেই তিনি কাব্য রচনা করেন ঃ

گئے دن تنہا تھا میں انجمن میں
یہاں اب مرے رازداں اور بھی ہے

শেষ হলো আজ একলা থাকার ক্লান্ত দিন ;
এই পথে মোর সন্ধানী প্রাণ আছে আরো।।

(তরজমাঃ ফররুখ আহমদ)

এমনিভাবে ইকবাল সমকালীন প্রেক্ষাপটের দাবীতে কবিতা রচনা করে জোরের সাথে বলেছিলেন ঃ

"জানি না অতীত সুর আবার বাজবে কি-না ?
হিজাযী হাওয়া পুনঃ এদিকে বইবে কি-না ?
এ দীন ফকিরের নিঃশেষ হলো জীবন
অপার রহস্য ভেদী (জ্ঞানী) জানিনে জন্মে কি-না"

(তরজামাঃ তাহের ছিদ্দিকী)

ইকবাল-কাব্য নৈরাশ্য, হতাশা ও দ্বন্দ্ব-সংশয়ের ছোঁয়াচ হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র। নিরাশা-হতাশা তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। তিনি কারো মধ্যেই হতাশা বরদাশ্‌ত করতেন

না। তিনি সবাইকে উদ্বুদ্ধ করে কাব্য রচনা করেছেন এভাবেঃ

ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں
ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں

এই সিতারার শেষে আছে জাহান আরো।
প্রেমের পথে ঝঞ্ঝা-তুফান আছে আরো।।

(তরজমাঃ ফররুখ আহমদ)

اگر کھو گیا اک نشیمن تو کیا غم
مقامات آہ و فغاں اور بھی ہیں

একটি লক্ষ্য যায় হারিয়ে
যদি কভুও
পায় না যেন নাগাল হুতাশ
তোমার তবুও
আরো আছে শত উপায়
শত উপাদান
ঘুরছে আজো কালের চাকা
সময় অফুরান

(তরজমাঃ মতিউর রহমান মল্লিক)

اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا
کہ تیرے زمان و مکاں اور بھی ہیں

একটি মাত্র দিন-রজনীর
সফল বিজয় এলে
ডুব দিওনা ভোগ-বিলাসে
দায়-দায়িত্ব ফেলে
সামনে অনেক মঞ্জিল আছে
অনেক যুগ যে আর
সব করতলগত সবার
আয়ত্তে আনবার

(তরজমাঃ মতিউর রহমান মল্লিক)

* তিনি
* নৈরাশ্যবাদীদের অন্তর দিয়ে ঘৃণা করতেন। তাদেরকে তীব্র শাণিত বাক্যবানে জর্জরিত ও ক্ষত-বিক্ষত করে দিতেন। তিনি তাঁর পয়গামের জনপ্রিয়তা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ ছিলেন এবং

ঈমান ও বিশ্বাসের দিক দিয়ে ছিলেন নিঃশংক ও দৃঢ় প্রত্যয়ী। তাঁর কাব্যাদর্শের সত্যতা ও বিশুদ্ধতা সম্পর্কেও তাঁর মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিলোনা। তিনি *"আসরার ও রমূয"* গ্রন্থের শেষের দিকে *"রাহমাতুল্লিল আলামীন সমীপে গ্রন্থকারের নিবেদন"* শিরোনামে সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্যের মূর্ত প্রতীক দিশারী নবী হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর খেদমতে নিবেদন করে যে কাব্য খণ্ড রচনা করেছেন তাতে তিনি অতি বিনীত অথচ প্রত্যয় সহকারে বলেছেন ঃ

"যদি আমার হৃদয় হয় মূল্যহীন দর্পণ
অথবা আমার কবিতায় কুরআনের ব্যতিক্রম কিছু থাকে
পুনরুত্থান দিবসে আমায় করুন লাঞ্ছিত ও অপমানিত
আমায় বঞ্চিত করুন আপনার পদ চুম্বনের সৌভাগ্য থেকে
খচিত করে থাকি যদি কুরআনের রহস্যাবলীর মুক্তো
মুসলিমের সাথে বলে থাকি যদি সত্য কথা
সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে আবেদন করুন
আমার প্রেম যেন হয় কর্মের সাথে সামঞ্জস্যময়"

(তরজমাঃ ডঃ আবু সাঈদ নূরুদ্দীন)

ইকবালের উন্মাদনাময় এই আবেগ-উচ্ছ্বাস অন্তঃসারশূন্য নয়। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের গভীরতম অধ্যয়নের পরই তিনি স্বীয় জীবনের জন্য একটি শাশ্বত আদর্শ ও দার্শনিক মতবাদ নির্ধারণ করে নিয়েছেন। আর *'খুদী'র* দর্শনই হলো তাঁর দার্শনিক মতবাদের ভিত্তি।

তিনি মানুষের সামনে কোন নতুন পথ ও পন্থা পেশ করেননি, এটা তিনি কখনো দাবীও করেননি। বারবার বজ্র গম্ভীর কণ্ঠে তিনি একথাই ঘোষণা করেছেন যে, মানুষের পথ ও পন্থা শাশ্বত, চিরন্তন; প্রথম মানুষ সৃষ্টি হতে শুরু করে অনন্তকাল পর্যন্ত আল্লাহ তা'য়ালা মানুষের জন্য একটিমাত্র পথই নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন আর তা হলো *ইসলাম* ও *ইসলামী জীবনব্যবস্থা,* কাল-স্রোতের আবর্তে পড়ে মানুষ এ পথ হতে বার বার বিচ্যুত হয়েছে, সেহেতু প্রত্যেকবার নতুন করে সে পথে প্রত্যাবর্তন করার সাধনায় লিপ্ত হওয়াই হলো মানুষের স্বাভাবিক সংগ্রাম, এই সংগ্রাম যে দিন স্তব্ধ হবে, মানবতার অগ্রগতি সে দিন চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যাবে। সেহেতু জাতিকে জাগিয়ে তোলার নিমিত্ত ইকবাল গেয়ে উঠলেন ঃ

سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا
لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا

সত্য-ন্যায়ের সবক নে তুই
নে সবক তুই বীরত্বের
তোরে দিয়ে কাম হবেরে

সারা দুনিয়ার ইমামতের

(তরজমাঃ ফররুখ আহমদ)

وہ زمانے میں معزز تھے مسلماں ہو کر
اور تم خوار ہوئے تارک قرآں ہو کر

মুসলমানের তরেই তখন সে যুগ করিত গর্ববোধ,

কুরআন ছাড়িয়া এখন হয়েছে যুগ-কলঙ্ক হায় অবোধ !

(তরজমাঃ গোলাম মোস্তফা)

এভাবে শত-সহস্র কাব্য রচনা করে ইকবাল জাতিকে ইসলামের দিকে আহবান জানিয়েছেন। ইকবালের নিকট ইসলাম প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী নিছক ধর্মানুষ্ঠান পদ্ধতি নয়; বরং এক পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। মানবজীবনের কোন দিকই ইসলামের আওতার বাইরে পড়ে না। জাহেরী-বাতেনী যা-ই হোক না কেন সবই ইসলামের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ। ইকবাল রাজনৈতিক দর্শনকেও জীবনদর্শনেরই এক অপরিহার্য অংশ মনে করতেন। তিনি পাশ্চাত্য গণতন্ত্রকে প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন ঃ

"গণতন্ত্র এমন এক শাসন প্রণালী
যেখানে মানুষকে গণনাই করা হয়,
পরিমাপ করা হয় না
তাদের মস্তিষ্কের।

(তরজমাঃ সৈয়দ আবদুল মান্নান)

তিনি দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে মুসলিম মিল্লাতকে এগিয়ে যাবার সবক দিয়েছেন এভাবে ঃ

یقیں محکم، عمل پیہم، محبت فاتح عالم
جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں

দৃঢ় প্রত্যয়, অবিরাম কর্মচঞ্চলতা
আর বিশ্ব জয়ী প্রেম—
এ-ই হচ্ছে শাণিত কৃপাণ জীবনসংগ্রামের ।

(তরজমাঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম)

তিনি সুস্পষ্ট ধারণা নিয়ে আযাদ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকল্পে, বিশ্ব ঐক্য ও সংহতি গড়ার নিমিত্ত জীবনের অন্যান্য দিকের মতো সমভাবে রাজনীতির প্রতিও মনোযোগী হয়েছিলেন। তাঁর মতে ঃ

"রাজনীতির মূল রয়েছে মানুষের আত্মিক জীবনের গভীরে"

আর ধর্মকে তিনি মনে করতেন ঃ *"ব্যক্তি ও রাষ্ট্র উভয়ের জীবনে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শক্তি।"*

আধুনিক বিশ্বের অধিকাংশ চিন্তাবিদ যখন ধর্মকে রাজনীতি থেকে আলাদা করে নিছক ব্যক্তিগত ব্যাপারে পরিণত করার সপক্ষে ক্রমাগত প্রচার চালিয়েছেন, তিনি তখন অকুতোভয়ে প্রতিবাদ করে বললেনঃ *"ইসলাম মানুষের একত্বকে আত্মা ও বস্তুর সমন্বয়াতীত দ্বৈতবাদে বিভক্ত করে না। ইসলামে আল্লাহ্ ও বিশ্বপ্রকৃতি, আত্মা ও বস্তু, উপাসনাগার ও রাষ্ট্র পরস্পরের পরিপূরক।"*

তিনি আরো বলেছেন ঃ

"ঐক্য (তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ব) নীতিকে মানুষের চিন্তা-জগতে ও ভাব-জগতে জীবন্ত রূপ দেয়াই কার্যতঃ ইসলামের সমাজ ও রাষ্ট্র-বিধানের সবচাইতে বড় কাজ। ইসলাম দাবী করে একমাত্র আল্লাহর আনুগত্য, কোন সিংহাসনের প্রতি আনুগত্য নয়। আর যেহেতু আল্লাহই সমগ্র জীব-জগতের আধ্যাত্মিক অভিব্যক্তির মূল নিদান, আল্লাহর প্রতি আনুগত্য বস্তুত মানুষের আপন আদর্শ-প্রকৃতির প্রতি আনুগত্যের নামান্তর।"

তিনি গোঁড়া ইসালমপন্থীদের মসজিদকেন্দ্রিক ইবাদতের বিরুদ্ধে মারলেন কাব্যাঘাত ঃ

মোল্লা লাভ করেছে মসজিদে সিজদার স্বাধীনতা,
নির্বোধ সে, একেই সে মনে করে ইসলামের আযাদী।

(তরজামাঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম)

চিন্তানায়ক ইকবালের সমসাময়িক ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনসমূহের প্রতি দৃষ্টি ছিলো অত্যন্ত গভীর ও সুদূরপ্রসারী– সজাগ। তদানীন্তন উপমহাদেশের রাজনৈতিক আদর্শসমূহের প্রভাবে ইসলামের মৌলিক কাঠামো ও প্রকৃতির প্রভাবিত হবার সম্ভাবনা দেখেই তিনি রাজনীতির প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিয়েছিলেন।

শিক্ষার আলোকে ইকবাল জাতির পথনির্দেশের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন ঃ

"সুনির্দিষ্ট আদর্শের আলোকে যতক্ষণ না কোন জাতি তাদের দৈনন্দিন কার্যকলাপের ক্ষেত্রকে ক্রমাগত প্রদীপ্ত করে তুলে তাদের নিজস্ব অবস্থার পরিবর্তন আনয়ন করার জন্য উদ্যমশীল হয়, ততক্ষণ আল্লাহ তা'য়ালা সে জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, ব্যক্তির নিজস্ব আত্মিক জীবনের আযাদীর উপর সুদৃঢ় ঈমান ব্যতীত কোন কিছুই অর্জন করা যায় না। একমাত্র এই ঈমানই জাতির দৃষ্টিনিবদ্ধ রাখে তার লক্ষ্যের প্রতি এবং তাদেরকে বাঁচিয়ে রাখে চিরন্তন দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থেকে।"

ইকবাল কবি না দার্শনিক– এটা নিয়ে মতানৈক্য পোষণ করেন কেউ কেউ। তাঁদের মতে ঃ দর্শন এক, কাব্য এক। কাব্যের বিচার তত্ত্বকথায় নয় ; বরং, রস ও আনন্দে। এ তিন গুণ কোন কবির মধ্যে কতখানি আছে, তা দেখেই তার কাব্যের মূল্যমান নির্ধারণ করতে হবে। এটা সম্পূর্ণ সত্য বলে মেনে নেয়া যায় না। দার্শনিকতার মধ্যেই যে কাব্য হবে তা ঠিক নয়। হাজার দার্শনিকতা থাকলেও রসোত্তীর্ণ না হলে তাকে কাব্য বলা যায় না। আবার দর্শন না থাকলেও কাব্য হয় না। সত্যিকার কাব্যে যে দর্শন থাকবেই না, এমনটিও নয়। দর্শনের কাছেই শেষ পর্যন্ত আসতে হবে। যে কবির কাব্যে কোন জীবনদর্শন নেই, সে কবি *good*

poet — ভাল কবি হতে পারেন, কিন্তু, *great poet* — বড় কবি হতে পারেন না।

কোলরিজ *Colereidge* -এর মতে, বড় দার্শনিক ছাড়া কেউ বড় কবি হতে পারে না।

ব্রাউনিং *Brov* g-এর মতে, দর্শন আগে, তারপর তার ফলস্বরূপ আসবে কাব্য।

বিশিষ্ট কাব্য-সমালোচক ল্যাণ্ডর *Landor* বলেন, আমরা ছোট-খাট জিনিস খুব ভাল করে লিখতে পারি, কিন্তু কোন গুরুতর বিষয় ভালভাবে লিখতে না পারলে কেউ কখনো বড় কবি হতে পারে না। সে অলস প্রেমের গান গাইতে পারে, সবুজ মাঠের বর্ণনা দিতে পারে; কিন্তু যে কবি শুধু এসব নিয়েই মগ্ন থাকে, সে এটা অপেক্ষা আর বড় হতে পারে না।

এতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, কবি হলেই যে দার্শনিক হতে নেই— এটা নিছক ভুল।

এখানে বলা আবশ্যক যে, ইকবালের আবির্ভাবকালে দার্শনিক বিভ্রান্তিতে সমস্ত জগৎ আচ্ছন্ন হয়েছিল। বিশ্বে তিনটি স্বতন্ত্র কৃষ্টি বা কালচারের ধারা বয়ে চলেছিলোঃ ১. হেলেনিক বা গ্রীক কালচার, ২. সেমেটিক কালচার এবং ৩. আর্য কালচার। ইউরোপ প্রধানতঃ গ্রীক কালচার দ্বারাই প্রভাবিত। গ্রীক কালচারের মূলে আছে প্লেটো ও এরিস্টটলের চিন্তাধারা। দর্শন, বিজ্ঞান, শিক্ষা, রাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি বিষয় সর্বপ্রথম আলোকপাত করেন প্লেটো, অবশ্য উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে জার্মান দার্শনিক নীচে *[Nietzche]* এবং ফরাসী দার্শনিক বার্গসঁ কিছুটা নতুন কথা নিয়ে আসেন। এমনিভাবে অন্যবিধ ধর্মাবলম্বী দার্শনিক মনীষীরা তাদের ধর্মের পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেন। মুসলিম মনীষীরাও শাশ্বত ইসলামী দর্শন পেশ করেন। এটা সত্য যে, প্রাচ্যপাশ্চাত্যের যে-সব দর্শনের জ্ঞান সমানভাবে রপ্ত না থাকায়, ভাষার প্রাচীরের কারণে বিশ্বজনীন আবেদনের ক্ষেত্রে ইসলামের তাবলীগ স্বগোত্র, স্বভাষীর মধ্যেই বিক্ষিপ্তভাবে চলতে থাকে। পাশ্চাত্য জ্ঞানআহরণ করে তাদের ভ্রান্ত ব্যাখ্যার উত্তর দেবার ব্যাপারে কেউ যথার্থ ভূমিকা পালন করতে পারেননি বলা চলে। ইকবাল দর্শনের ছাত্র হয়ে যান ইউরোপে। তখন মানবাত্মার এ গুরু লাঞ্ছনায় তিনি ব্যথিত হন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় দর্শনের সঙ্গেই নিবিড়ভাবে পরিচিত হয়ে তিনি যে সত্যের সন্ধান পেলেন তা প্রকাশ করলেন এভাবে ঃ

"শুধু যে সে পরম সত্তাই সত্য আর জগত মিথ্যা—তা নয়; এ জগত সত্য; তবে পূর্ণ সত্য নয়। উভয় জগতকে মিলালে পূর্ণ সত্য পাওয়া যায়।" তিনি প্রচার করলেন আত্মার দর্শনের। মানুষের আত্মা যে প্রতিবিম্বের ন্যায় আল্লাহর অস্তিত্বে মিশে যাবে না, তার যে ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য আছে, মৃত্যুর পরেও যে সে অনন্ত জীবনে বেঁচে থাকবে—একথা তিনি উদাত্ত কণ্ঠে জানিয়ে দিলেন।

তাঁর মতে, মানুষের মধ্যে অসীম শক্তি ও সম্ভাবনা লুকিয়ে রয়েছে, সাধনা দ্বারা সে শক্তি ও সম্ভাবনার পূর্ণ জাগরণ আনতে পারলে এই মানুষ আল্লাহর *'খলীফা'র* গৌরবময় আসন লাভ করতে পারে। এই পূর্ণ-মানুষকেই ইকবাল *'মর্দে মুমিন,* বা *'ইনসানে কামিল'* বলেছেন। ইকবালের দর্শন তাই আত্মবিকাশের দর্শন—আত্মশক্তির দর্শন।

একজন উদারপন্থী সংস্কারক ইকবাল শিল্প ও সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর ধারণা বিশ্লেষণ করে বলেন ঃ

আল্লামা ইকবাল

"কোন জাতির আধ্যাত্মিক সুস্থতা নির্ভর করে তার কবি-সাহিত্যিক ও শিল্পীদের ইলহামী যোগ্যতর উপর। কিন্তু, এটা অর্জন করার মত বস্তু নয়। প্রকৃতপক্ষে এটা একটি দান মাত্র, এটা পরিপূর্ণরূপে করায়ত্ত হওয়ার পূর্বে এর বিশেষত্ব ও প্রভাব-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে কোন সমালোচনামূলক উক্তি করা সেই দান-প্রাপকের পক্ষেও সম্ভব হয় না।"

কোন প্রকৃত কবির প্রকৃতি কি হবে সে সম্পর্কে ইকবাল বলেন ঃ

কবির প্রকৃতি নিরন্তর অনুসন্ধিৎসু,
সৃষ্টি করে নিত্য-নতুন আকাঙ্ক্ষা,
করে তার লালন-পালন।
কবির মর্যাদা অসীম—
জাতির বক্ষে যেমন দিল,
যে জাতি পায়নি কখনো কাব্যের অপূর্ব প্রেরণা
তা যেন মৃত্তিকার স্তূপ।
কবির হৃদয় জ্বালা
জ্যোতির্ময় করে তোলে একটি জগৎ।
মর্মজ্বালা আর আবেদনহীন কাব্যমালা,
অর্থহীন শোকগাঁথামাত্র।
কবিতার লক্ষ্য যদি হয় মানুষ
গড়িয়া তোলা,
এই কাব্যই হতে পারে
পয়গম্বরীর উত্তরাধিকার।

(তরজমাঃ সৈয়দ আবদুল মান্নান)

ইকবালের মতে ঃ কবি শুধু ব্যবসায়ীই হবে না, তাকে জাতির চিন্তা জগতে আনতে হবে বিপ্লব। ইকবাল দিশারী কবির বর্ণনা দিয়ে কাব্য রচনা করেছেনঃ

কবির বক্ষদেশ হলো সৌন্দর্যের মঞ্চঃ
এ থেকেই বিকিরিত হবে ভাস্বর দীপ্তি
কবির দৃষ্টির প্রলেপ সুন্দরকে সুন্দরতর করে;
প্রকৃতিকে প্রতিভাত করে অধিকতর প্রিয়রূপে
কাফেলা পথ চলে তার ঘণ্টা ধ্বনি ও
তার বাঁশীর সুরের অনুসরণ করে।

(তরজমাঃ ফাহমিদ-উর-রহমান)

ইকবালের মতো মহাকবিও কোথাও জীবন-জিজ্ঞাসার কোন জবাব পেয়ে তা কুরআন ও

হাদীসে বিদ্যমান কি-না এটা দেখে তবে মসি ধারণ করেছেন। তাঁর সাহিত্যের সারবান পটভূমি ছিলো কুরআন ও হাদীস। আজ আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? মুসলিম কবি-সাহিত্যিকরা আল-কুরআন ও হাদীস শরীফ হতে উপকরণ বা প্রেরণা নিতে ইতস্ততঃ করেন। অন্যদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি অমুসলিমরা অনায়াসে এরই মধ্যে প্রেরণা খুঁজে পান।

মহাকবি গ্যেটে *"প্রতীচ্য-প্রাচ্য দেওয়ান"* *[west-eastern divan]* কাব্যগ্রন্থ লিখে যশস্বী হয়েছেন। এর মধ্যে আল্লাহ তা'য়ালা, মুহাম্মাদ (সঃ), ফেরেশ্‌তা ও হুর ইত্যাদির বিবরণও রয়েছে।

মহাকবি দান্তে *[Dante]* তাঁর *"ডিভাইন কমেডি"র* প্রেরণা লাভ করেন কুরআনুল করীম থেকেই।

কবি *Ezraa Pound* কুরআনের সূরা *"আল আ'রাফ"* অবলম্বনে *"Al-Araf"* কবিতা লিখে সুখ্যাতি লাভ করেছেন।

আল্লাহর ৯৯টি গুণবাচক নামের উপর ৯৯টি কবিতাসম্বলিত সুন্দর গ্রন্থ *"পারলস্ অফ ফেথ"* *[pearls of faith]* রচনা করেছেন ইংরেজ মনীষী *Sir Edwin Arnold* — এভাবে আরো কত দৃষ্টান্ত রয়েছে। মনীষী হাফিজ, রুমী, ওমর খৈয়াম- এঁরাও তো ইসলামী আঙ্গিকে ইসলামী উপাদান নিয়েই কাব্য সৃষ্টি করেছেন। সেগুলো বিশ্ব সাহিত্য নয়কি ? এর মধ্যে কি মানবীয় আবেদন নেই? ধর্ম ও ঐতিহ্য ভিত্তি হলেই যদি কাব্য অপাংক্তেয় হয়— মারা যায় তা হলে শ্রেষ্ঠ কবি *T. S. Elliot*-কে কি বলা যাবে? তিনি তো একজন গোঁড়া রোমান ক্যাথলিক? তাঁর প্রায় সমস্ত কবিতাই তো ঐতিহ্যবাহী।

কবি রবীন্দ্রনাথকে নিয়েই বলা যাক, তিনি ইকবালের রচনাবলীর মুখবন্ধে একখানা চিঠি হায়দারাবাদের ডঃ মুহাম্মদ আব্বাসকে উদ্দেশ করে লিখেছিলেন ঃ

"ইকবালের কাব্য যে খ্যাতি অর্জন করেছে তা বিশ্ব সাহিত্যে চিরকাল অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে বলেই আমার বিশ্বাস। কোন কোন সমালোচককে আমার ও ইকবালের কাব্যের তুলনামূলক বিচার করতে দেখে আমি সত্যই দুঃখিত। সাহিত্য কাল ও সময়ের উর্ধ্বে.....আমার আরও বিশ্বাস, আমি এবং স্যার মুহাম্মদ ইকবাল সত্য ও সুন্দরের দু'জন সেবক। আর আমরা সেই সীমায় গিয়ে মিলে যাই যেখানে মানবের চিত্ত ও মস্তিষ্ক বিশ্বমানবের দরবারে শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর উপহার এনে উপস্থিত করে।"

এই সেই রবীন্দ্রনাথ, যার সমস্ত কাব্য ও দর্শনের উৎসমূল হলো উপনিষদ। রামায়ণ, মহাভারত, বেদ, পুরাণ ও ইতিহাস থেকেই তিনি তাঁর কাব্যের উপকরণ সংগ্রহ করেছেন। রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, যুধিষ্ঠির, দ্রৌপদী, অহল্যা, উর্বশী, মেনকা, শিবাজী—সবই তো সাম্প্রদায়িক। অথচ 'উর্বশী' বিশ্ব সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্য বলে বিবেচিত। হোমার, ভার্জিল, কালিদাস, হাফিজ, রুমী, ওমর খৈয়াম, শেক্‌সপীয়র সবার ব্যাপারেই একথা নিতান্ত সত্য। প্রত্যেকেই অল্প-বিস্তর সাম্প্রদায়িক, অথচ এঁদের সাহিত্যই বিশ্ব সাহিত্য। মূলত দুনিয়ার কোন কবি, কোন শিল্পীই এই চিরন্তন রীতি ও নীতির ব্যতিক্রম নন। সব

শিল্পীই আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে তার শিল্পকে রচনা করেন। গণ্ডি বা আবেষ্টনকে অস্বীকার করে কোন শিল্প-সৃষ্টি অসম্ভব। শিল্পের পূর্ণ বিকাশের পথে গণ্ডি-সংকীর্ণতা কোন বাধা সৃষ্টি করে না বলেই আমাদের বিশ্বাস। তাই তো 'ম্যাডোনা'র মাতৃমূর্তি বা 'মনালিসা'র স্নিগ্ধ হাসি খৃষ্টানী গণ্ডি অতিক্রম করে বিশ্ব সম্পদে পরিণত হয়েছে। সেহেতু এটা বলা সততই সঙ্গত যে, ইকবাল-কাব্যে ইসলামী রূপ ও রস বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তা মানবীয় উপাদানে পরিপূর্ণ এবং বিশ্ব সাহিত্যের লক্ষণাক্রান্ত এ জন্য হয়েছে— তিনি কুরআন ও হাদীস, ইতিহাস-ঐতিহ্যের গণ্ডি অতিক্রম করেননি।

ইকবালের কালামকে চিন্তাধারা ও বিষয়বস্তুর নিরিখে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। যেমনঃ কবিত্ব, দর্শন ও আন্দোলনের গতিচাঞ্চল্য। এর সঙ্গে সামঞ্জস্য-বিধানকল্পে বলা যেতে পারে যে, ইকবালের অনুভূতি ছিলো কাব্যধর্মী, চিন্তাধারা হলো দার্শনিক, আর মতবাদ হলো সম্পূর্ণ ইসলামী আদর্শভিত্তিক। বস্তুত তাঁর মন-মগজে মানবীয় সমস্যার যে সমাধান জাগ্রত হতো, তার মূল উৎস হতো ইসলামী ভাবধারা।

ইকবালকে আমরা তিনটি রূপে দেখতে পাই। প্রথমতঃ তিনি কবি, দ্বিতীয়তঃ তিনি দার্শনিক এবং তৃতীয়তঃ তিনি মর্দে মুজাহিদ—তাঁর ভাষায় *'ইনসানে কামিল'*। এই দিকত্রয়ই তাঁর প্রকৃতি ও চরিত্রে সমানভাবে এবং পূর্ণ সামঞ্জস্য সহকারে উজ্জ্বল-উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। এ সমন্বয়ের ফলে তিনি হয়েছেন গোটা বিশ্বের সমঝদারদের কবি, মিল্লাতের চিন্তানায়ক, সেহেতু তিনি এক আদর্শ ব্যক্তিত্ব; কেবল মুসলিম জাহানের জন্যই নয়, গোটা মানবতার জন্য তিনি সর্বসমন্বিত এক মহান সৃষ্টি।

نشان مرد مومن با تو گویم
چو مرگ آید تبسم بر لب اوست

"প্রকৃত মোমিন কে বা,
শোন তার পরিচয়।
মরণ আসিবে যবে
অধরেতে হাসি রয়।"

(তরজমা ঃ মীজানুর রহমান)

ইন্তেকালের পূর্ব মুহূর্তে মিল্লাতের জন্য রচিত ইকবালের শেষ "সওগাত" উল্লিখিত পংক্তি। انما الاعمال بالخواتیم *(الحدیث)

ইন্নামাল আ'মালু বিল খাওয়াতীমঃ—

আমলের কার্যকারিতা শেষ কীর্তির উপর নির্ভরশীল— হাদীসের এই ব্যাখ্যার নিরিখে ইকবালের শেষ সওগাত যে মাকবুল হয়েছে— আল্লাহর দরবারে, তা বলা অন্যায় হবে না।

[প্রবন্ধটি 'বাংলা সাহিত্য পরিষদ' আয়োজিত "ইকবাল, মুনশী মেহেরুল্লাহ ও এয়াকুব আলী চৌধুরী" স্মরণসভায় ২০-১২-৮৯ তারিখে পঠিত]

গ্রন্থপঞ্জী

১. ইকবাল কী ইবতেদায়ী জিন্দেগী
২. ইকবাল কী ছোহবাত মেঁ ঃ ডঃ আবদুল্লাহ চুগতাঈ
৩. ইকবাল কে হুজুর ঃ সাইয়্যেদ নজীর নিয়াজী
৪. ইকবাল আওর কাশ্মীর ঃ ডঃ ছাবের আফাকী
৫. দায়েরায়ে মাআরেফে ইসলামিয়া ঃ উর্দূ
৬. দ্য রিকনস্ট্রাকশন অফ রিলিজিয়াস থট ইন ইসলাম ঃ ডঃ মুহম্মদ ইকবাল
৭. ইকবালের উর্দূ ও ফার্সী রচনাবলী
৮. ইকবালের শিক্ষা দর্শন ঃ গোলাম সাইয়্যেদায়েন
৯. ইকবালের রাজনৈতিক চিন্তাধারা ঃ মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম
১০. শেকোয়া-জওয়াবে শেকোয়া ঃ অনুবাদ, গোলাম মোস্তফা
১১. পাকিস্তানের ঐতিহাসিক পটভূমি ঃ অনুবাদ, সৈয়দ আবদুল মান্নান
১২. দেওবন্দ আন্দোলন একটি জিহাদ ঃ এডভোকেট এ. এম. এম. আবদুল জলীল
১৩. আল্লামা ইকবাল ঃ শরীফুল মুজাহিদ
১৪. তারীখুল ইসলাম ঃ ইহসানুল্লাহ আব্বাসী
১৫. ইসলামী বিশ্বকোষ ঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন
১৬. তাজকারে ইকবাল ঃ মুহাম্মদ উদ্দীন ফাওক
১৭. বিশ্বের মনীষীদের দৃষ্টিতে মাওলানা মওদূদী (রঃ) ঃ আব্বাস আলী খান
১৮. হায়াতে ইকবাল কা সবক ঃ (প্রবন্ধ) মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদূদী
১৯. ইকবাল আওর আফগানিস্তান (প্রবন্ধ)
২০. ইকবাল আওর মুহাব্বাতে রাসূল
২১. আহওয়াল ও আছারে ইকবাল
২২. জিন্দা রূদ ১ম, ২য় খণ্ড ঃ ডঃ জাবিদ ইকবাল
২৩. আল-কুরআনের দৃষ্টিতে ইকবাল দর্শন ঃ (প্রবন্ধ,) ডঃ আবু সাঈদ নূরুদ্দীন
২৪. খোত্‌বাতে ইকবাল
২৫. ফররুখ রচনাবলী প্রথম খণ্ড
২৬. কুরআনুল কারীম
২৭. আল-হাদীস ঃ মেশকাত শরীফ

ইকবাল ও সরোজিনী নাইডু

ফারুক আহমাদ খান

মিসেস সরোজনী নাইডুর হিন্দুস্তানে শিক্ষা, সাহিত্য ও রাজনীতির অঙ্গনে যে স্থান তা সর্বজনবিদিত। তাঁকে হিন্দুস্তানের সাহিত্যাঙ্গনে *"বুলবুলে হিন্দ"* বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ চুগতাইর ভাষায়ঃ

"১৯২৭ সালে আমার আল্লামা ইকবালের সাথে সিমলা যাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। আমরা সেখানে স্যার ফিরোজ খাঁ নূন-এর মেহমান হিসেবে তাঁর কুঠি *"গুডুল"*-এ উঠেছিলাম। একদিন স্যার ফিরোজ খাঁ নূন পাঞ্জাবের লাট সাহেব স্যার বারডুডকে তাঁর কুঠিতে টেনিস খেলার দাওয়াত দিয়ে বললেন, আল্লামা ইকবালও আমার এখানেই রয়েছেন। তাঁর সাথেও আপনার সাক্ষাত করিয়ে দেবো। আল্লামা ইকবাল যখন এটা জানলেন তখন তিনি সাক্ষাতের থেকে বাঁচার জন্য–স্থানান্তর করার জন্য প্রোগ্রাম করে *'সমর হল'*-এ সরদার ইমরাও সিং মাজীঠ سردار امراؤ سینگھ مجیٹھیہ-এর সাথে সাক্ষাত করার মনস্থ করলেন। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমরা সেখান থেকে বেরিয়ে পড়লাম। আমরা *'সিসিল হোটেল'* سیسل ہوٹل-এর নিকটে পৌঁছলে পথিমধ্যে মিসেস সরোজিনীর সাথে সাক্ষাতহয়ে যায়। আল্লামা ইকবাল ও সরোজিনী নাইডুর ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব সম্পর্ক ছিলো অতি পুরনো। অনেক বছর পর এ-ই হঠাৎ সাক্ষাত হলো। সেহেতু দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত কথাবার্তা চলতে থাকলো। উভয়েই একে অন্যের সাথে শিক্ষা, সাহিত্য এবং রাজনৈতিক বিষয়ে মত বিনিময় করতে লাগলেন। আজো মনে পড়ে, মিসেস সরোজিনী নাইডু আল্লামাকে বলেছিলেনঃ "মিসেস জীনা جینا (বেগম কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ)ও আপনার সঙ্গে সাক্ষাত করার ব্যাপারে আকাঙ্ক্ষী। তিনি যথেষ্ট শিক্ষিত, ইংরেজী সাহিত্যের উপর বিশেষ দখল রাখেন এবং আপনার সঙ্গে সাক্ষাত করতে চান।" এভাবে কথা বলতে বলতে অনেক সময় শেষ হয়ে গেলো এবং আমরা তাঁর থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম।

এখানে আল্লামা ইকবালের একটি কবিতার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এটি তিনি মিসেস সরোজিনী নাইডুর বই " Broken wings " পড়ার পর লিখেছিলেন। এ পংক্তিগুলো তিনি উল্লেখিত বইয়ের প্রাপ্তি স্বীকারে টোকেন হিসেবে মিসেস সরোজিনী নাইডুকে পাঠিয়ে ছিলেন। আল্লামা ইকবালের রচনাবলীতে এগুলো দেখা যায় না। লক্ষ্মৌ থেকে একটি সাহিত্য পত্রিকা *"জাখীরাহ"* আগষ্ট ১৯৬৭ সংখ্যায় এগুলো প্রকাশিত হয়েছিলো।

মিসেস সরোজিনী নাইডু কখনো লাহোরে আসলে সাধারণত প্রফেসর মির্জা সায়ীদের ওখানেই উঠতেন। একদা আল্লামা ইকবাল প্রসঙ্গক্রমে হাস্যচ্ছলে বলেছিলেনঃ একবার সরোজিনী নাইডুর সাথে সাক্ষাত হয়েছিলো। সে জানতে চাইলোঃ আমার গযলিয়াত *[Lyrics]* কেমন? আমি জবাবে বললাম, মাদ্রাজ সফর থেকে ফেরার সময় আল্লামা হায়দরাবাদ পৌঁছে সেখানে সভা শেষ করে একদিন সরোজিনী নাইডুর বাড়ী যাওয়ার ইচ্ছা করেন। খবর নিয়ে জানা গেলো তিনি বাড়ী নেই। কংগ্রেসের বার্ষিক সভায় যোগদানের জন্য কোথাও গিয়ে থাকবেন, তথাপি সৌজন্যবোধের তাকিদে আল্লামা তাঁর ঘরে গিয়ে তাঁর স্বামী ডঃ নাইডু এবং ছেলেমেয়েদের সাথে দেখা করে ফিরে আসেন।

আল্লামা ইকবালের ইন্তেকালের সংবাদ হায়দরাবাদ পৌঁছলে মিসেস সরোজিনী নাইডু যারপরনাই মর্মাহত হন। সেখানকার মাসিক পত্রিকা "সব রস"-এ নিম্নের শোকবাণী প্রকাশ পায়ঃ

"আমি আমার উত্তম বন্ধু ইকবালকে হিন্দুস্তানের পুনরুত্থানের মহাকবি হিসেবে বিশ্বাস করি। এ কবির উর্দু এবং ফার্সী কাব্যের কারনামা হিন্দুস্তানী জাতির রাহনুমা হয়ে থাকবে। যদিও ইকবালের শরীরকে জমিন তার বক্ষে ধারণ করেছে। কিন্তু মরহুমের জিন্দায়ে জাবেদ, ধীশক্তি, অমর সৃষ্টি দুনিয়াতে সর্বদা বাকী থাকবে। আমি মরহুমের পরিপূর্ণ জ্ঞান এবং প্রজ্ঞার প্রতি সবিনয় শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।"

মাওলা ওরশী عرشی তাঁর লিখিত বই *"নুকুশে ইকবাল"*-এ লিখেছেন যে, আমি ১৪ এপ্রিল ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে আল্লামা ইকবালের খেদমতে উপস্থিত হই। আমার সাথে হাকীম তালেব আলী সাহেবও ছিলেন। আমাদের যাওয়ার পূর্বেই বিখ্যাত কবি মিসেস সরোজিনী নাইডু এবং মিয়া বশির আহমদ (হুমায়ুন)-ও উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা উভয়ে ইংরেজীতে কথাবার্তা বলছিলেন। আমি এই মহিলা কবিকে এ-ই প্রথম এবং শেষবার দেখি। আর এটাও প্রত্যক্ষ করেছি যে, আল্লামা তাঁকে বিদায় দেয়ার জন্য তাঁর স্থান থেকে উঠে কুঠির বাহির দরোজা পর্যন্ত তাশরীফ এনেছেন।

১৯৩৫ সালে আঞ্জুমানে হেমায়াতে ইসলামের বার্ষিক সভা ইকবালের সভাপতিত্বে রাত ৮টার সময় শুরু হয়। আল্লামা ইকবাল সে সময় আঞ্জুমানের সভাপতি ছিলেন। যখন আল্লামা সভামঞ্চে এলেন, তখন তাকবীরের ধ্বনিতে সম্পূর্ণ সভা গুঞ্জরিত হয়ে উঠে। সে সভায়ও মিসেস সরোজিনী নাইডু উপস্থিত ছিলেন। *"নুকুশে ইকবালের"* উল্লেখিত ঘটনাটিও সম্ভবত সে সময়কার। মিসেস সরোজিনীও মূলত আল্লামার দাওয়াতেই সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন। সভাটি ছিল উপভোগ্য। এতে আল্লামা অন্যান্য বক্তার বক্তৃতা ও কবিতার উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে পরে সভাপতির ভাষণ দেন।

১৯১৯ সালে কংগ্রেসের বার্ষিক সভা অমৃতসরে হয়েছিল। এতো বড় সম্মেলন সাধারণত পরিলক্ষিত হয় না। এ সম্মেলনে আল্লামা ইকবাল এবং মিসেস সরোজিনী নাইডুও অংশগ্রহণ করেছিলেন। গান্ধীজীও এসেছিলেন। এটা ছিলো অসহযোগ আন্দোলনের সময়। এ সময় গান্ধীজী এতদঞ্চলে অসাধারণ গুরুত্ব এবং প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। তখন মিসেস সরোজিনী নাইডু চেষ্টা-তদবির করে আল্লামাকে গান্ধীজীর সাথে দেখা করার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। এ সাক্ষাত শেষ হলে তিনি গান্ধীজীর ব্যাপারে আল্লামার মনোভাব জানার জন্য উদগ্রীব হলেন। তিনি ভেবেছিলেন গান্ধীজী ইকবালকে তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং শিক্ষার দ্বারা প্রভাবিত করে থাকবেন, তাঁর ব্যাপারে আল্লামার মনোভাব পরিবর্তিত হয়ে গেছে। তাই যখনি আল্লামা গান্ধীজীর কক্ষ থেকে পদদ্বয় বাইরে রাখলেন মিসেস সরোজিনী লাফিয়ে তাঁর মুখোমুখি হয়ে জানতে চাইলেন। কি ডঃ সাহেব! মহাত্মাজীকে আপনার কেমন লাগলো ? আল্লামা ছিলেন কৌতুকপ্রিয় মানুষ। তাই, তিনি কোনরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত না করেই জবাব দিলেন ঃ *"গান্ধীজী তো ভালো মানুষ। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে সজাগ বিধায় শারীরিক দিক থেকে সুস্থ। আর এ কারণেই তাঁকে বয়সের তুলনায় সবল মনে হয়।"*

সরোজিনী এ জবাবের প্রত্যাশায় ছিলেন না বিধায় দুঃখ পেলেন এবং বললেন, আমি তো একজন মহান ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আরেক মহান ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতি প্রত্যাশী ছিলাম। কিন্তু আপনি আমার কথা হাস্যচ্ছলে উড়িয়ে দিলেন। ডঃ সাহেব বললেন ঃ

"সরোজিনী ! গান্ধীর ব্যাপারে আমার বক্তব্য এ-ই, যা আমি আপনাকে বলেছি, আর এ-ই আমার শেষ কথা। এর চাইতে অধিক আর কি-ইবা বলবো।"

ইকবালের এ জবাব আরো হতাশাব্যঞ্জক ছিলো। সেহেতু মিসেস নাইডু চুপ মেরে গেলেন। এখানেই কথাবার্তার ইতি হলো।

[ডঃ আবদুল্লাহ চুগতাইর 'ইকবাল কী ছোহবাত মেঁ' উর্দূ বই অবলম্বনে]

ইকবালের আফগানিস্তান সফর

মোজ্জাম্মেলুল হক

আল্লামা ইকবাল তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *"পায়ামে মাশরিক"* ১৯২২ সালে প্রকাশ করেছিলেন। গ্রন্থখানা তিনি আফগানিস্তানের ওয়ালী আমানুল্লাহ খাঁর নামে উৎসর্গ করতে গিয়ে যে ক'টি শব্দ ব্যবহার করেছেন তা হলোঃ
"بحضور اعلیٰ حضرت امیر امان اللہ خان فرمان روائے دولت مستقلۂ
افغانستان خلد اللہ ملکہ و اجلالہ"

এ গ্রন্থখানা আল্লামা প্রসিদ্ধ জার্মান কবি গ্যাটের *"পাশ্চাত্য দেওয়ান"* নামক গ্রন্থের জবাবে লিখেছেন। আমীর আমানুল্লাহ খাঁ ১৯১৯ সালে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। আফগানিস্তানের রাজনৈতিক অবস্থা প্রাচ্যের অন্যান্য রাষ্ট্রের চাইতে ছিলো ভিন্নতর। আল্লামার ইচ্ছা ছিলো *"পায়ামে মাশরিক"*- কে কোন স্বাধীন ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির নামে উৎসর্গ করবেন। কেননা, গ্রন্থখানাতে ইসলামের উপর স্বাধীনভাবে আলোচনা স্থান পেয়েছে। তাঁর সমর্থন ছিলো আফগানিস্তানের পক্ষে। তিনি ১৯২৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারী লাহোরস্থ ইংরেজী পত্রিকা *"ট্রিবিউন"*-এ এক বিবৃতি প্রদান করেছিলেন, তাতে তিনি তাঁর দৃষ্টিকোণ থেকে আফগানিস্তানের অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন। বিবৃতিটির সারমূল নিম্নরূপঃ

"....... কেবলমাত্র আফগানিস্তানের স্বার্থেই নয়, বরং এশিয়ার ব্যাপকতর উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিরিখেই অপরিহার্য কর্তব্য হলো শাহ আমানুল্লাহর হুকুমত অপরিবর্তিত রাখা.......আমরা যা কিছু পত্র-পত্রিকায় দেখছি, আমার মতে এর অধিকাংশই নির্ভরযোগ্য নয়। আমি এসব কথার উপর বিশ্বাস করতে পারছি না যা কাবুল হতে আগত লোকজনের মুখে আমাদের কাছে পৌঁছে.......আমানুল্লাহ খাঁর ব্যর্থতার কারণ আমার জানামতে এই— তিনি সংস্কারের ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করেছেন......হযরত شور بازار-কে এ পরামর্শের শিখন্ডি বলা হয়ে থাকে। কেননা, তিনি স্বয়ং স্বাক্ষর করেছিলেন..........মানুষ তাদের কৃষ্টি-কালচারের সংস্কারের সবক অধুনাই শিখেনি, সেজন্যই এব্যাপারে অতিরঞ্জিত করা উচিত নয়।"

সে সময়ে অনেক ছাত্রই আল্লামার খেদমতে ইসলামিয়া কলেজে গিয়েছিলো। তাদের ইচ্ছা ছিলো যে কোনভাবে আমানুল্লাহকে আফগানিস্তানে ফিরিয়ে আনা চাই। একদিন সন্ধ্যায় যে বৈঠক মোহামেডান হলে বসেছিলো সে বৈঠকে আমানুল্লাহর প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্যে একটি ফাণ্ড জমা করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিলো।

ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র মাস্টার মোমতাজ মির্জা ফাণ্ড জমা করার ব্যাপারে ছিলেন অগ্রণী। ডঃ আবদুল্লাহ চুগতাঈর ভাষায় "আমার থেকেও মমতাজ মির্জা চাঁদা নিয়েছিলেন এবং ছাপানো রসিদ আমাকে দিয়েছিলেন।" বৈঠকে 'আমানুল্লাহ খাঁ' শীর্ষক কবিতাও আবৃতি করা হয়েছিলো। তখন বৃটেনের সরকার গাজী আমানুল্লাহ খাঁর বিরোধী ছিল। নাদির শাহ-এর হিতাকাঙ্ক্ষীরা তাকে তখতে বসিয়ে দিয়েছিলো এবং حضرت شور بازار-কে গ্রেফতার করে নিয়ে

গিয়েছিলো। তৎকালীন *'ইনকিলাব'* পত্রিকায় একটি কবিতা خطاب باقوام شرق নামে ছাপা হয়েছিলো।

সে সময়ে *'আ   হ ফাণ্ডে'* যে টাকা জমা হয় তা ইম্পেরিয়াল ব্যাংকে রাখা হয়েছিল। একটি পার্টি জেনারেল নাদের খাঁকে আফগানিস্তানে ডেকেছিলো এজন্যে যে, তিনি এসে কোনভাবে আমানুল্লাহ খাঁকে ফিরিয়ে আনবেন। প্রথমে সংবাদ এলো, নাদের খাঁ বোম্বাই পৌঁছে গেছেন। পরে জানা গেলো, তিনি লাহোর হয়ে যাবেন। সেহেতু লাহোর রেলওয়ে স্টেশনে কয়েক লাখ মুসলমান পৌঁছে গেছেন। সেখানে আল্লামা ইকবাল, মৌলবী যফর আলী খাঁ এবং ডঃ আবদুল্লাহ চুগতাঈও উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর রেলগাড়ী এলে আবদুশ শহীদ মালেক, গোলাম রাসূল মেহের, নূরুল হক, ডঃ মির্জা ইয়াকুব বেগ, মৌলবী আবদুল কাদের কাছুরী এবং আল্লামা ইকবাল ট্রেনের বগিতে ঢুকে জেনারেল নাদের খাঁর সাথে সাক্ষাত করেন। জেনারেলের সাথে তাঁর দু'ভাই। সাইয়্যেদ হাবীব এবং এনায়েত শাহ সফরসঙ্গী ছিলেন। ট্রেনের বগির দরোজায় দাঁড়িয়ে জেনারেল নাদের খাঁ সমবেত লোকদের উদ্দেশে বলেছিলেন ঃ

"আমি রোগগ্রস্ত ছিলাম, এখনও আমি অসুস্থ। কিন্তু আল্লাহর শোকর এই জন্য যে, এখন আমি এতটুকু সুস্থ হয়েছি–এই নাযুক সময়ে আফগানিস্তানের খেদমত করতে পারি। এখন আফগানিস্তানে আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। আমি এই প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা নেভানোর জন্যেই যাচ্ছি। আমি আমার ব্যক্তিগত কোন স্বার্থসিদ্ধির জন্য সেখানে যাচ্ছি না; বরং, আমি সেখানে আমান প্রতিষ্ঠা করতে চাই। আমার ইচ্ছা হলো আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে মাতৃভূমির খেদমত আনজাম দেয়ার শক্তি দান করুন। আমার আল্লাহর দরবারে এ-ই প্রার্থনা যে, তিনি শাহ আমানুল্লাহকে অতিশীঘ্র তখতে ফিরিয়ে আনুন।"

এই বক্তৃতার পর *"আল্লাহু আকবার"*-এর না'রা মুহুর্মুহু ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠেছিলো। এরপর গাড়ী ছেড়ে দেয়। ওদিকে গুজব ছড়িয়ে পড়লো যে, আমানুল্লাহ খাঁ কান্দাহারে থাকবেন এবং মোল্লা শোর বাজার(ملا شور بازار)কে গ্রেফতার করা হয়েছে। যা হোক, কিছুদিন পর নাদের খাঁ ওয়ালীয়ে আফগানিস্তান হিসেবে ঝক্কি-ঝামেলা আয়ত্তে আনলেন। আল্লামা স্যার মুহাম্মদ ইকবালের মোবারকবাদ জ্ঞাপনকৃত এক চিঠির জবাবে শুকরিয়া জ্ঞাপন করে ১৯২৯ সালে তিনি যে জবাব দেন তার তরজমা নিম্নরূপঃ

জনাব ফাজেল মুহতারাম স্যার মুহাম্মদ ইকবাল!

বর্তমান ধ্বংসযজ্ঞে আফগানিস্তানের ব্যাপারে আপনার দিকনির্দেশনার জন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে এবং আফগানিস্তানের সাধারণ জনগণ ও আত্মবিসর্জনকারীদের পক্ষ থেকে আপনাকে শুকরিয়া জানাচ্ছি। আফগানিস্তান ধ্বংসের মুখোমুখি। আফগানিস্তানের হতভাগ্য জাতি এক মহাপরীক্ষার সম্মুখীন। আফগানিস্তান তার হিন্দুস্তানী ভাইদের সব ধরনের সাহায্য-সহযোগিতার দিকে তাকিয়ে আছে। এমনি সন্ধিক্ষণে যে সৌভ্রাতৃত্বের কদম আপনি উঠাচ্ছেন তা আমাদের জন্য অত্যন্ত সুখকর বৈ কি। বিশেষ করে আর্থিক সাহায্য, যে

ব্যাপারে আমি "ইছলাহ" পত্রিকায়ও হিন্দুস্তানী ভাইদের খেদমতে আপীল করেছিলাম-তা অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়েছে।

মুহতারাম! আফগানিস্তানের বর্তমান মুছীবতে আপনি যেভাবে এগিয়ে এসেছেন, আমরা আশাবাদী- এমনিভাবে আপনার সহযোগিতা আফগানিস্তানের কিংকর্তব্যবিমূঢ় জাতিকে সব সময় উৎসাহিত করবে এবং আপনিও তাদের শ্রদ্ধাভাজন হবেন। যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শনান্তে–

মুহম্মাদ নাদের খাঁ।।

উল্লেখ্য যে, নাদের খাঁকে আর্থিক সাহায্য প্রদানের কাজ স্বয়ং আল্লামার পৃষ্ঠপোষকতায় হয়েছে। যত টাকা একত্রিত হয়েছে তা নাদের খাঁর নিকট পাঠানোর নিমিত্ত "*ব্যাংক অফ ইণ্ডিয়া*"-তে জমা করা হয়েছিলো এ সময়কালে জেনারেল নাদের খাঁ এবং ইকবালের মধ্যে অনেক চিঠিপত্রের আদান-প্রদান হয়েছিলো। পরে, ১৯৩৩ সালে যখন জেনারেল নাদের খাঁ আফগানিস্তানের অধিপতি, তখন তিনি শিক্ষাক্রম সংক্রান্ত পরামর্শের জন্য আল্লামা ইকবাল, সাইয়্যেদ রাস মাসউদ ও মাওলানা সাইয়্যেদ সোলায়মান নদভীকে আফগানিস্তান যাওয়ার দাওয়াত দেন। সেহেতু, তাঁরা আফগানিস্তান যাবার জন্য তৈরী হয়ে যান। ১৯৩৩ সালের ২০ অক্টোবর আল্লামা কাবুল পৌঁছেন। স্যার রাস মাসউদ এবং সাইয়্যেদ সোলায়মান নদভীও তাঁর সফরসঙ্গী হলেন। কাবুলে তাঁরা সরকারী মেহমান ছিলেন। তাঁরা শিক্ষাসংক্রান্ত নীতিমালাসম্বলিত একটি পরিপূর্ণ দিকনির্দেশনা -কে প্রদান করেন। সেখানে তাঁরা কাবুল, গজনী, কান্দাহার ইত্যাদি শহরও ঘুরে ঘুরে দেখেন। যখন আল্লামা জেনারেল নাদের খাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করেন তখন তিনি তাঁকে কুরআনুল করীমের একখানা নোসখা উপঢৌকন হিসেবে দেন। আলা হজরত এই নোসখাখানা সীনার সঙ্গে লাগিয়ে চুমো খেয়ে অশ্রুসিক্ত নয়নে বললেন, এই তোহফা আমার জন্য দ্বীন এবং দুনিয়ার সর্বোৎকৃষ্ট মূল্যের সম্পদ। তখন উভয়েই কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন। তাঁরা ইসলামী বিশ্বের উন্নতি-অগ্রগতির জন্য দোয়া করলেন।

তাঁরা নভেম্বর মাসে কাবুল থেকে প্রত্যাবর্তন করেন। ডঃ সাহেব সে সময় একটি কবিতা الٰہی مسافر নামে এবং দ্বিতীয় কবিতা پس چہ باید کرد নামে রচনা করেন। কাবুল সফরের সময় আল্লামা ছালাহউদ্দীন সেলজুকীও তাঁর সঙ্গী ছিলেন। প্রত্যাবর্তনের পর আল্লামা সাইয়্যেদ সোলায়মান নদভী আফগানিস্তানের '*সফরনামা*'ও লিখেছিলেন। এটা পরে পুস্তকাকারেও প্রকাশিত হয়েছিল। [ডঃ আবদুল্লাহ চুগতাঈর 'ইকবাল কী ছোহবাতমেঁ' গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত]

ইকবাল ও জওয়াহের লাল নেহ্রু

ছালেহ আহমাদ

১৯৩৭ সালে পণ্ডিত জওয়াহের লাল নেহ্রু লাহোরে আসেন। তিনি মুসলমানদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে স্যার সেকান্দার হায়াত খানের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি স্যার সেকান্দার হায়াত খানকে বললেন ঃ

'যেহেতু, মিস্টার জিন্নাহ দ্বি-জাতিতত্ত্বের ব্যাপারে অনড়, সেহেতু আপনিই আমাদের সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে একটা পথ বের করুন।'

সেকান্দার হায়াত খান জবাবে বললেন ঃ

'মুসলিম ভারতের একমাত্র প্রতিনিধি হলেন মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ। হিন্দুস্তানের মুসলমানরা তাই বিনা বাক্যব্যয়ে ঐ সিদ্ধান্ত মেনে নেবেন যা জিন্নাহ অনুমোদন করেন, সেহেতু এ ব্যাপারে আপনার কথাবার্তা জিন্নাহ সাহেবের সাথেই হওয়া দরকার।'

এরপর পণ্ডিত জওয়াহের লাল নেহ্রু আল্লামা ইকবালের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁর কাছেও অনুরূপ প্রস্তাব পেশ করেন। আল্লামা ইকবাল উত্তর করলেন ঃ

পণ্ডিতজী ! কাব্য এবং দর্শন ইত্যাদির ব্যাপারে কোন আলোচনা করলে আমি প্রস্তুত আছি। আর রাজনীতির ব্যাপার যতটুকু নিহিত তা আমরা মিস্টার জিন্নাহর উপর ন্যস্ত করে দিয়েছি। তিনি ব্যতীত দ্বিতীয় কেউ কংগ্রেসের সাথে বুঝাপড়া তো দূরের কথা সাধারণ আলাপ করতেও পারবে না।

এ জবাব শুনে পণ্ডিতজী নিরাশ হয়ে গেলেন। মুসলমানদের অনড় একাত্মতা দেখে তাঁর এই বদ্ধমূল ধারণা জন্মালো যে, কায়েদে আজম ছাড়া বুঝাপড়া করার লোক নেই। তাই তিনি ব্যর্থ হয়ে প্রত্যাবর্তন করলেন।

[ডঃ আবদুল্লাহ চুগতাইর লেখা উর্দূ বই 'ইকবাল কী ছোহবাত মেঁ' অবলম্বনে লিখিত]

আল্লামা ইকবালের স্মরণীয় বাণী

শরীফুল মুজাহিদ

মুনশী মুহাম্মদ উদ্দীন ফাওক রচিত "তাজকারে ইকবাল"-এর ১২০—১২৪ পৃষ্ঠায় ইকবালের ৩৩টি স্মরণীয় বাণী পত্রস্থ হয়েছে। তারই তরজমা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো ঃ

১. পৃথিবীতে ইসলামই সর্বপ্রথম ধর্ম যা মানব-জাতিকে উন্মুক্ত মাঠে সজীব হাওয়া ও সূর্যের ঝলমলে আলোতে ইবাদাত-বন্দেগী করার শিক্ষা দান করেছে।

২. দুনিয়াতে মানবজাতিকে সৃষ্টি করার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো আমল বা কাজ করা।

৩. প্রত্যেক মানুষ ছোট পরিমাপ-যন্ত্রের উপর স্বয়ং খালেক। আর এ সৃষ্টিশীল শক্তিমত্তাকে ধ্বংস করার নামই হলো গুনাহ বা পাপ।

৪. প্রত্যেক হিন্দুস্তানী মুসলমানের জন্য এটা অপরিহার্য কর্তব্য যে, প্রত্যেক আকীদার মুসলমানের— যার তাওহীদ ও রিসালাতের উপর ঈমান আছে— তার পেছনে নামাজ পড়া।

৫. প্রতিটি হিন্দুস্তানী অধিবাসীর অবশ্যম্ভাবী কর্তব্য হলো, নিষ্কর্মা হয়ে বসে না থেকে স্বহস্তে কিছু না কিছু রোজগার করা।

৬. একই চিন্তা-চেতনা পোষণকারীর সাহর্চয কোন কোন সময় এ ধরনের পরিণতির উদ্ভব ঘটায়— যা কারো কল্পনারও অতীত।

৭. পীর-মুরীদের আমল এমন হওয়া উচিত যে, উভয়ই একে-অন্যের সামনে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকবার প্রতিজ্ঞা করবে এবং এভাবে দোয়া করবে যে, কাল কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'য়ালা যেন আমাদের অপমানিত না করেন।

৮. ইদানীংকালে আওলিয়ায়ে কেরামের সন্তান-সন্ততি তাদের পূর্বসূরীদের সমুদয় গুণাবলী বিসর্জন দিয়ে তাঁদের বুজুরগী বা আভিজাত্যকে এদের প্রতিনিধিত্বের ওসীলা তথা মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করছে।

৯. সূফী-সাধক ও দরবেশদের কাফেলায় যে ধরনের আনন্দ ও মানসিক প্রশান্তি পাওয়া যায় তা আমীর-ওমরাদের সংশ্রবে কিভাবে সম্ভব হতে পারে ?

১০. মানসিক প্রশান্তি একমাত্র আল্লাহর জিকিরের মাধ্যমেই অর্জন করা সম্ভব।

১১. হিন্দুস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে যে-সব বুজুর্গানে দ্বীন ইসলামী জ্ঞান প্রচার-প্রসারে ব্রতী ছিলেন, তাঁদের উত্তরসূরীরা ইহলৌকিক পদ-পদবীর পেছনে পড়ে ধ্বংস হয়ে গেছে।

১২. বর্তমান ধর্মান্ধ প্রেক্ষাপটে হুজুর (সঃ)-এর সবচাইতে বড় খেদমত হলো— নিজের ধন-সম্পদ ও ব্যক্তিত্বকে একমাত্র ইসলামের প্রচার ও প্রসারে বিলীন করে দেয়া।

১৩. মুসলমান যদি প্রকৃত মুসলিমই হয়, তা হলে সে কখনো পরাজিত ও অধীনস্থ হতে পারে না, আর তা এ জন্য যে, তার অধীনস্থতা বা পরাজয়বরণ হক-এরই পরাজয়বরণের নামান্তর।

১৪. স্বদেশ প্রেম হলো প্রাকৃতিক অনুভূতিস্বরূপ— যার লালনের জন্য কোন ধরনের প্রভাবের প্রশ্নই উঠে না।

১৫. কুরআনুল কারীমের সযত্ন অধ্যয়ন করে আমি যা উপলব্ধি করেছি, সে প্রেক্ষিতে ইসলাম শুধুমাত্র মানবজাতির চারিত্রিক সংশোধনের আহবায়কই নয়; বরং, পৃথিবীতে মানবজাতির সম্মিলিত জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে ইসলাম ক্রমবিন্যাসকারী,উপরন্তু বৈপ্লবিক ভিত্তি কামনা করে।

১৬. এটা কুরআনেরই শিক্ষা যে, মানুষ প্রকৃতিগতভাবে নিষ্পাপ, তার কোন ধরনের প্রায়শ্চিত্ত করার আদৌ প্রয়োজন নেই। মানুষ স্বভাবগত দিক থেকে স্বাধীন এবং সে স্বাধিকারের অধিকার রাখে বৈ কি।

১৭. তোষামোদ, চাটুকারিতা, অনুরোধ, মিনতি, অভিলাষ-আকাঙ্ক্ষার দ্বারা কখনো কিছুই পাওয়া যায়নি। একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো আনুগত্য স্বীকার করা আমাদের জন্য ওয়াজিব নয়।

১৮. যে জাতি এক বিরাট উদ্দেশ্য নিয়ে জন্মেছে, স্মরণ রেখো ! কেউ ধ্বংস করতে চাইলেও তার ধ্বংস হবে না।

১৯. লিডারদেরও দল আছে। তারা তাদের প্রশিক্ষণকেন্দ্র থেকে নতুন নতুন লিডার তৈরী করেই চলেছে। তবে হ্যাঁ, সে কারখানার আসবাবপত্র অলস হয় না।

২০. বিদেশী শিল্প-সংস্কৃতিকে নিত্য-সঙ্গী হিসেবে বরণ করে নেয়া মানেই তার গোলামী করা।

২১. ধর্মকে শিকেয় তুলে রাজনীতির প্রতি পুরোপুরি মনোযোগী হও— এটা ইউরোপের দাসত্ব মনোভাবেরই ফলস্বরূপ। আর অন্য জাতির জন্য মৃত্যুর বার্তাবাহক।

২২. পরিপূর্ণ জ্ঞান, কামালাত, উঁচু ধারণা— যা মানবজাতির জন্য কোন না কোন দিক থেকে উপকারী, এগুলো অর্জনের অবিরাম প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে *জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর* পর্যায়ভুক্ত।

২৩. ইসলামী তাছা-উফ পূজারীরা হিন্দু এবং খ্রীষ্টানের সাহচর্যের দরুন যথেষ্ট প্রভাবিত হয়ে পড়েছে।

২৪. জ্ঞানী কলমের উপর চলেন, আর সুফী চলেন কদমের উপরে।

২৫. বুজুর্গদের আবির্ভাবের ব্যাপারে এ ধারণা করা হয়ে থাকে যে, যখন কোন মুছলেহ এবং মুজাদ্দেদের আবির্ভাব ঘটে, তিনি সাধারণ মানুষের প্রতীক্ষা এবং বিশ্বাসের ভিত্তিতে ফায়েদা উঠিয়ে তাদেরকে একটি স্তর পর্যন্ত পৌঁছে দেন। অবশ্য, কুরআনে এ ব্যাপারে কোন উল্লেখ নেই।

২৬. বর্তমান বিশ্বে জ্ঞান-বিজ্ঞান, সংস্কৃতি এবং সৃষ্টিকৌশল ও আবিষ্কারের সবই মুসলমানদের "*মাখলুক*" বা সৃষ্টি।

২৭. এদেশের বেকার মোল্লা এবং নিষ্কর্মা মুসলমান ধর্মীয় বিবাদ-বিসম্বাদ, সংঘাত, ফতো-য়াবাজি ও লম্বা লম্বা দোয়া-দরূদের মধ্যে মূল্যবান সময় ব্যয় না করলে কি-ই বা করবেন!

২৮. মানুষ নেহায়েত উদাসীনতার সাথে কুরআন ও ইসলাম (ব্যাখ্যা)-এর মধ্যে ভারতীয় এবং ইউরোপীয় দর্শন একীভূত করে ফেলেছে। যদি এমন হতো যে, রাসূল (সঃ) পুনরায় তাশরীফ এনে ভারতীয় মুসলমানদের মাঝে দ্বীন-ইসলামের ব্যাখ্যা করে দিতেন।

২৯. যে জাতির শক্তি-সার্মথ্য বিলোপ পায়, সে জাতির লক্ষ্য, উদ্দেশ্যও বদলে যায়। বৈরাগ্য, অলসতা, মন্থরগতি এবং সূফীদের ছন্দালংকারকেই তারা সান্ত্বনার একমাত্র উদ্দেশ্য মনে করে।

৩০. একজন সহজ-সরল, অশিক্ষিতা ও শ্রী-হীন গ্রাম্য তরুণী যেই শক্তিশালী, বলিষ্ঠ, বিনয়ী, সত্যাশ্রয়ী শিশুর জন্ম দেয়; সে ঐ সুন্দরী রমণীর চাইতেও হাজারো গুণে উত্তম, যে তথাকথিত শিক্ষা-দীক্ষা, কৃষ্টি-কালচার ও সংস্কৃতির দিক থেকে ঐশ্বর্যশালী, কিন্তু, পুরুষকে ছলনা-প্রতারণার জালে শিকারে ব্যস্ত এবং জীবনের আবশ্যকীয় বিধি-বিধানের বিষয় সম্পর্কে পরিপূর্ণতার ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন।

৩১. আরকানে ইসলামের নিয়মানুবর্তিতা মুসলমানদের আত্মোৎসর্গের এক বিরাট পরীক্ষা, মূলত এর নামই হলো সূফীবাদ। কেননা, ইসলামের নির্ধারিত চিহ্নসমূহের নিয়মানুবর্তিতার দ্বারাই আত্মার ক্রমবিন্যাসের শিক্ষা হাসিল হয়।

৩২. যদি দুনিয়াকে একটি তাসের সাথে তুলনা করা হয়, তা হলে ইসলামই অতুলনীয় ও অনুপম যার একেশ্বরবাদের সামনে তাসের বড় বড় রাজা-রাণী, বাদশা-গোলাম কেটে যায়।

৩৩. কাশ্মীরী মুসলমানদের জন্য বৃটিশ-ভারতে একটি কাশ্মীর কমিটির সাহায্য-সহযোগিতা, পথপ্রদর্শন, উপদেশ-নির্দেশ অপরিহার্য।

ইকবাল ঃ

আমার হৃদয়ের সাথী, অকৃত্রিম বন্ধু

মূল ঃ মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদুদী
মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম অনূদিত

[মাসিক 'উর্দু সাইয়্যারাহ ডাইজেষ্ট' পত্রিকা ১৯৬৩ সালের মে 'ইকবাল সংখ্যায়' সাইয়েদ মওদুদীর নিম্নের সাক্ষাতকারটি প্রকাশ করেছিল। সাক্ষাতকারটি গ্রহণ করেছিলেন জনাব গোলাম হোসাইন আজহার।]

"ইকবাল ছিলেন আমার আত্মার আত্মীয়, আমার আত্মিক আশ্রয়......."

কয়েক বছর আগে ''*তরজমানুল কুরআন*''–এর পাতা ওল্টাতে গিয়ে উপরোক্ত শব্দ ক'টি আমার দৃষ্টিতে পড়ে। শব্দগুলো আমার আবেগ এবং অনুভূতিতে তীব্র দোলা সৃষ্টি করে। শব্দগুলোর অন্তরালে লুক্কায়িত ছিল এক মর্মান্তিক কাহিনী। সেটাই আমার ছিলো জানার বিষয়। বিষয়টি নিয়ে মাওলানার সাথে আলাপ করার ইচ্ছে জেগেছিল বার বার। কিন্তু মাওলানার কোন না কোন ব্যস্ততার কথা চিন্তা করে এ ইচ্ছাকে দমিত রাখতে হয়েছে।

'*সাইয়্যারাহ ডাইজেষ্ট- এর*' ইকবাল সংখ্যায় আমার লেখার সুযোগ আসলে দীর্ঘ দিনের সেই লালিত আকাঙ্ক্ষাটি মাওলানার সামনে ব্যক্ত করলাম। মাওলানা যে কোন সন্ধ্যায় তাঁর খেদমতে হাজির হবার অনুমতি দিলেন। ১৪ এপ্রিল সন্ধ্যায় মাওলানার খেদমতে হাজির হলাম। তাঁর সাথে আলোচনার একটি সংক্ষেপ চিত্র তুলে ধরছি ঃ

ঃ "মাওলানা ! আপনি একবার লিখেছিলেন, ইকবাল ছিলেন আমার রূহানী সহযোগী– এর সাথে কি কোন কাহিনী জড়িত আছে?"

এ প্রশ্নের জবাবে মাওলানা আমাকে বললেন ঃ

"আল্লামা ইকবাল আমাকে পাঠানকোট চলে আসার জন্য লিখেছিলেন। আমার সাথে ওয়াদা করে বলেছিলেন, 'তুমি যদি এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস কর, তাহলে আমিও বছরে ৬ মাস তোমার সাথে থাকবো।' তাঁর একথার মধ্যে ছিলো এক মোহিনী জাদুর পরশ। তাঁর প্রস্তাবটি সংগে সংগেই আমাকে গ্রহণ করে নিতে হয়। আমি হায়দারাবাদ থেকে পাঠানকোট চলে আসি। কিন্তু কাহিনীর মর্মান্তিক দিকটি হচ্ছে ঃ মার্চে আমি পাঠানকোটে আসি, এপ্রিলে আল্লামা ইকবাল ইন্তেকাল করেন। মর্মবিদারী এই আকস্মিক ঘটনাটি আমার মন-মস্তিষ্কের উপর এক তীব্র প্রভাব বিস্তার করে। সে অনুভূতিই আমাকে এ কথাগুলো লেখার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করে।"

ঃ "মাওলানা ! আল্লামা ইকবালের সাথে আপনার যে পত্র যোগাযোগ, মত বিনিময় ও কথাবার্তা হয়েছে তা বিস্তারিতভাবে বললে আমরা উপকৃত হবো।"

মাওলানা বললেন ঃ "সে-সব চিঠিপত্র তো আমার কাছে এখন নেই। কিন্তু ভিন্ন প্রসংগে কিছু বলছি"।

মাওলানা ধীরে ধীরে তাঁর অনুভূতি প্রকাশ করে বলতে লাগলেন ঃ

"চৌধুরী নিয়ায আলী দ্বীনের খেদমতের উদ্দেশ্যে একটি প্রতিষ্ঠান কায়েমের সিদ্ধান্ত নিলেন। এক খণ্ড জমিন ওয়াকফ্ করে তাতে একটি অট্টালিকা তৈরির কাজও শুরু করলেন। কিন্তু তিনি নিশ্চিত ছিলেন না যে, প্রতিষ্ঠানটি কেমন হবে। প্রতিষ্ঠানটি কোন্ ধরনের হওয়া উচিত– এ ব্যাপারে তিনি আমার কাছে পরামর্শ চাইলেন। এর একটি কাঠামো তৈরি করে আমি তাঁকে পাঠালাম, যা ঐসব চিঠির অন্তর্ভুক্ত ছিলো, পরবর্তীতে যেগুলো *দারুল ইসলাম* সম্পর্কে আমি প্রকাশ করেছি। এ সময় তিনি আল্লামার কাছেও এ ব্যাপারে নির্দেশনা চেয়ে পত্র যোগাযোগ করেন। তাঁদের দু'জনের এই পত্র যোগাযোগের বিস্তারিত বিষয় আমার জানা নেই। অবশ্য আমি চৌধুরী নিয়ায আলীর কাছ থেকে জানতে পারলাম, আমাদের প্রস্তাবিত স্কীমটি তিনি আল্লামাকে দেখিয়েছিলেন। আল্লামা তা পছন্দও করেছিলেন এবং বলেছিলেন, এ সময় এটাই আমাদের মৌলিক কাজ। এ সম্পর্কিত যাবতীয় চিঠিপত্র চৌধুরী নিয়ায আলীর কাছে সংরক্ষিত রয়েছে। এসব চিঠিপত্র তিনি একবার প্রকাশও করেছিলেন। ১৯৩৬ সালের কাছাকাছি সময়ের কথা। আল্লামা সর্বপ্রথম আমাকে জনাব নজীর নিয়াজী অথবা মিঞা শফির মাধ্যমে চিঠি লিখেছিলেন। তিনি আমাকে হায়দারাবাদ ছেড়ে পাঞ্জাবে চলে আসার পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু সে সময় আমার হায়দারাবাদে বসবাস করার আগ্রহ থাকায় আমি পাঞ্জাবে আসার ব্যাপারে আল্লামাকে আমার অপারগতা সম্পর্কে অবহিত করি। আল্লামার পরামর্শের আলোকে একটি প্রতিষ্ঠান কায়েমের উদ্দেশ্যে হায়দারাবাদে এক টুকরো জমিনও আমি খরিদ করি"।

ঃ "আল্লামা আপনাকে পাঞ্জাব অবস্থানের যে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন সে ব্যাপারে কোন বিশেষ কারণ তিনি উল্লেখ করেছিলেন কি ?'

"শুধুমাত্র এ ইচ্ছাই প্রকাশ করেছিলেন, আমি যেন পাঞ্জাব চলে আসি ; তখন বিস্তারিত কিছুই লেখেননি। সে সময় তাঁর পক্ষ থেকে এই আমন্ত্রণের অন্তর্নিহিত কারণ আমার সামনে স্পষ্ট ছিল না। অবশ্য ১৯৩৭ সালের মাঝামাঝি নিজেই অনুভব করলাম, ভারতের দক্ষিণ অঞ্চল ছেড়ে উত্তর ভারতের প্রতিই আমার মনোনিবেশ করা উচিত। এ সময় চৌধুরী নিয়ায আলীও আমাকে খুব গুরুত্ব আরোপ করেই পাঞ্জাব সফর করে তাঁর ওয়াক্ফকৃত ঐ স্থানটি দেখার অনুরোধ করলেন, যেখানে তিনি একটি প্রতিষ্ঠান কায়েমের পরিকল্পনা নিয়ে কাজ শুরু করেছেন। তখন আমিও উত্তর ভারত সফর করার কথা চিন্তা করছিলাম। ভাবছিলাম উত্তর ভারতে এমন একটি স্থান বেছে নেবো, যাকে কেন্দ্র করে আমি আমার উদ্দিষ্ট কাজ করার সুযোগ পেতে পারি। এ উদ্দেশ্যে ১৯৩৭ সালের আগস্টের শেষের দিকে আমি পাঞ্জাব সফর

করি এবং জালন্ধর ও লাহোর হয়ে পাঠানকোট পৌঁছি। এ সময়েই আল্লামা ইকবালের সাথে আমার বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। পাঞ্জাব সফরের আগে তিনি আমাকে লিখেছিলেন ঃ চৌধুরী নিয়ায আলী যে জমিন ওয়াকফ করে দিয়েছেন, আমি যেন তা-ই বাছাই করে নেই এবং যে প্রতিষ্ঠানের কাঠামো সম্পর্কে আমি চৌধুরী সাহেবকে আমার চিঠিতে উল্লেখ করেছিলাম, তা যেন আমি এখানেই কায়েম করি।"

ঃ "আপনি উত্তর ভারতকে কেন আপনার তৎপরতার কেন্দ্র বানাতে চেয়েছিলেন ?"

"আমি অনুভব করেছিলাম, দক্ষিণ ভারতে ঈপ্সিত চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালানোর সুযোগ দিন দিন সংকুচিত হয়ে আসছে, অপরদিকে মুসলমানদের ভবিষ্যতের ফয়সালা গ্রহণের দায়িত্ব পালন করতে যাচ্ছে উত্তর ভারত।"

ঃ "আপনার সাথে আল্লামা ইকবালের ব্যাপক আলোচনার মধ্যে কোন্ বিষয়টি সবচাইতে বেশী প্রাধান্য লাভ করেছিলো।"

"সে সময় যে আলোচনা হয়েছিলো, তার উল্লেখযোগ্য দিক্ ছিলো মুসলিম মিল্লাতের পুনর্গঠনের জন্যে কোন্ ধরনের তৎপরতা অত্যাবশ্যকীয়। এ ব্যাপারে আল্লামা এবং আমার চিন্তা ছিলো প্রায় অভিন্ন। কাজের পদ্ধতিও তাঁর দৃষ্টিতে তা-ই ছিলো, যার একটা কাঠামো আমি পেশ করেছিলাম। এই চিন্তাকে কিভাবে বাস্তবে রূপ দেয়া যায়, তা-ই ছিলো আমাদের আলোচনার মূল বিষয়বস্তু। কিন্তু এ ব্যাপারে আলোচনার বিস্তারিত বিষয় এ মুহূর্তে আমার স্মরণ নেই।"

ঃ "ভারতে ইসলামী আন্দোলনের গোড়া-পত্তন করা জরুরী –এ বিষয়টি কি তখন আপনাদের সামনে ছিলো ?"

" এ সময় আন্দোলন বলতে যা বুঝায়, তা অবশ্য আমাদের সামনে ছিলো না। তবে দু'টো বিষয় অবশ্যই স্পষ্ট ছিলো। এর একটি হলো, শিক্ষার দিক থেকে জীবন ও সমাজের ওসব ক্ষেত্রের শূন্যতা পূরণ করা, যে শূন্যতার কারণে মুসলমানরা বর্তমানে ইসলামের জীবনপদ্ধতিকে একদিকে অপূর্ণাঙ্গ মনে করছে, অপরদিকে একে মনে করছে বাস্তবতা বিবর্জিত। দ্বিতীয়তঃ এমন সৃজনশীল জনশক্তি তৈরী করা, যে জনশক্তি মুসলমানদেরকে চিন্তা ও বাস্তব জীবনে যথাযথ নেতৃত্ব দানে সক্ষম হবে। একটি নিরেট ও ব্যাপক ইসলামী আন্দোলনের বাস্তব পরিকল্পনা ঐ মুহূর্তে অবশ্য আমাদের সামনে ছিলো না।"

ঃ "আল্লামা ইকবাল সে সময় শিক্ষার ক্ষেত্রে কোন্ ধরনের কার্যক্রমের উপর সবচাইতে বেশী গুরুত্ব প্রদান করতেন ?"

"এ ব্যাপারে খুঁটিনাটি দিকগুলো এ মুহূর্তে স্মরণ নেই। তবে ইসলামী আইন ও দর্শনকে কিভাবে যুগের চাহিদা পূরণে অব্যর্থ ব্যবস্থা হিসেবে উপস্থাপন করা যায়, তা-ই ছিল তাঁর মূল চিন্তা। আমাদের মধ্যেকার আলোচনাও এ বিষয়টিকে কেন্দ্র করেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল।"

ঃ "মাওলানা ! শুনেছি, আল্লামা ইকবাল (আপনার সম্পাদিত) 'তরজমানুল কুরআন' বিশেষভাবে অধ্যয়ন করতেন।"

"এটা আমি পরে জনাব নজীর নিয়াজী ও মিয়া শফীর কাছ থেকে জানতে পেরেছি, আল্লামা তরজমানুল কুরআন খুব মনোযোগের সাথে পড়তেন। তিনি *'আল-জিহাদু ফিল-ইসলাম'* পড়িয়ে শুনেছিলেন এবং খুব পছন্দও করেছিলেন।"

ঃ "মাওলানা ! ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে ইকবালকে কোন জিনিসটি শ্রেষ্ঠত্বের আসনে সমাসীন করেছে।"

"সে সময় মূলত এমন এক ব্যক্তিত্বের প্রয়োজন ছিল, যিনি পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানে অনেক অগ্রসর ছিলেন ওই লোকদের চাইতে, যারা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে গৌরববোধ করতো। প্রয়োজন ছিলো এমন ব্যক্তিত্বের যাঁর দূরদৃষ্টি ছিল অনেক গভীর। এই ব্যক্তিত্ব এমন অনন্য বলিষ্ঠতা নিয়ে ইসলামী চিন্তা, দর্শনকে উপস্থাপন করবেন, যার মোকাবেলায় যেন পাশ্চাত্যের মানব-সন্তানরা মাথা উঁচিয়ে কথা বলার সাহস না পায়। বস্তুত আল্লামা ইকবালের মূল অবদানের *[Contribution]* মূল্যায়ন তখনকার সমাজ-প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখেই করতে হবে। তখন পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য-সংস্কৃতি চিন্তার জগতে এমন দুর্দান্ত প্রভাব ফেলেছিলো, যে অবস্থায় সাধারণ মানুষ মনে করতো,এ যুগে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সাথে একে আপোষ করতে হবে এবং পরিশেষে ইসলামী জীবনাদর্শকে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে বিলীন হয়ে যেতে হবে। আল্লামা এই ধারণার ধূম্রজাল ছিন্নভিন্ন করে দেন। এ দিক থেকে সে সময় ইসলামী আন্দোলনের ক্ষেত্রে ইকবালের ব্যক্তিত্ব ছিলো অতি গুরুত্বের দাবীদার। এটা জরুরী নয় যে, কেউ তাঁর সমুদয় মতামতের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করবে। কিন্তু এটা বাস্তব সত্য, তিনি ইসলামী আন্দোলনের পটভূমি রচনায় অতি গুরুত্বপূর্ণ ও বিশেষ সম্মানের ভূমিকা পালন করে গেছেন।"

ঃ "মাওলানা ! ইকবালের বাস্তব জীবন তো তাঁর প্রচারিত আদর্শ মোতাবেক ছিলো না।"

"আপনি তাঁর জীবনের বৈশিষ্ট্যময় দিকগুলোর *[Examples]* অনুসরণের চেষ্টা করুন। তাঁর আমলের প্রতি দৃষ্টি না-ই দিলেন। ওসব নিয়ে আপনার মাথাব্যথা না থাকলেও তো চলে।"

ঃ "মাওলানা ! অনেক সময় ইকবালের চিন্তাধারাকে নিছক প্রকাশের প্রয়াস বলে অনুমিত হয়।"

"ভাই ! একজন কবিকে অ-কবির আসনে রেখে মূল্যায়ন করা তাঁর উপর অন্যায় করা বৈ কি। আল্লামা ইকবালকেও সে দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে তাঁর প্রতি জুলুমই করা হবে। আপনি তাঁর বর্ণাঢ্য জীবনের বৈচিত্র্যময় ও সুন্দর বৈশিষ্ট্যগুলোর অনুসরণ করুন। এটা যেমনি আপনার নিজের জন্যে কল্যাণকর হবে, তেমনি কল্যাণকর হবে গোটা জাতির জন্যেও।"

ইকবাল ও তাঁর শিল্পের সংগে আমার পরিচয়

মূল ঃ মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী
অনুবাদ ঃ কে. এ. রহমান

আমি কৈশোরে পদার্পণ করার পূর্বেই ইকবাল বিশিষ্ট কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন, আর তাঁর অনেক কবিতা ও পংক্তিমালা ঘরে ঘরে উচ্চারিত হচ্ছিল। তিনি ইতিমধ্যেই ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। সম্ভবত কোন কবিই ইকবালের মতো তার নিজ প্রজন্মের কল্পনাকে এমন প্রবল শক্তিতে আবিষ্ট করেননি। তাঁর যুগ-মানসের উপর তিনি অসামান্য প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, আর এতে তাজ্জব হবার কোন কারণ নেই যে, আমি নিতান্ত অল্প বয়সেই তাঁর কবিতার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলাম, আর সেকাল থেকে আজ পর্যন্ত তাঁর কবিতার প্রতি নিরবিচ্ছিন্নভাবে আকৃষ্ট রয়েছি।

নানাবিধ করণে মানুষ মহৎ কবিতা পছন্দ করতে পারে। সে কারণগুলোর মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও সাধারণ কারণ সম্ভবত এই যে, মানুষ কবিতায় তার নিজের আদর্শ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ অভিজ্ঞতার প্রতিফলন দেখতে পায়। মানুষ মূলত আত্মকেন্দ্রিক হবার কারণে সে যা কিছুতে তার অন্তর্নিহিত আবেগাদির প্রতিফলন দেখতে পায় আর যা তার হৃদয়ের কথাকে ভাষায় প্রকাশ করে, তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। আমি নিজেও এ শ্রেণীর মানবের আন্তর্ভুক্ত। হতে পারে আমি ইকবাল সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করতাম এ কারণে যে, তাঁর ধ্যান-ধারণা ও অনুভূতি আমার ধ্যান-ধারণা ও অনুভূতির খুবই অনুরূপ ছিল। আমি অনুভব করেছিলাম যে, আমার মনের ভিতর দিয়ে ভাব ও আবেগ সঞ্চারিত হচ্ছিল তিনি তাঁর কবিতায় তা-ই বাঙ্ময় করে তুলেছিলেন। যা আমাকে তাঁর কবিতার প্রতি সর্বাধিক আকৃষ্ট করেছিল তা হচ্ছে তাঁর অন্তর্নিহিত প্রেম, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও ঈমানের পয়গাম, আর এ পয়গাম একটা বিরল বস্তুছিল সমসাময়িক কবিতায়। এ তিনটি জিনিসই (প্রেম, উচ্চাভিলাষ ও ঈমান) — হচ্ছে আমার মানসিক গঠনের মৌলিক উপাদান। যে আন্দোলন বা সাহিত্য উদারতা ও গভীর আন্তরিকতাকে উচ্চে তুলে ধরে আর মুসলিম পুনর্জাগরণের আহবান জানায়, যে সাহিত্য ব্যক্তিত্ব বিকশিত করে ও ভিতরের আর বাইরের জগতকে জয় করার স্পৃহা জাগত করে, আর প্রেম ও বিশ্বস্ততার অনুভূতিকে পোষণ করে, ধর্মীয় চেতনাকে লালন করে, আল্লাহ্ ও হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর অনন্য মহত্ত্বে আর তার বার্তার বিশ্বজনীনতা ও চিরন্তনতায় গভীরভাবে বিশ্বাস করে, তার প্রতি আমি স্বভাবতই আকৃষ্ট হই। এর সব কিছুই আমি ইকবালের কবিতায় পেয়েছিলাম। আমি বিশেষ করে তাঁকে বিমুগ্ধ চিত্তে শ্রদ্ধার আসনে বসিয়ে ছিলাম। ইসলাম মানবজাতির সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের কথা বলেছে, তাঁর সমর্থক আর মুসলিম সত্তার অপরিহার্য মহত্ত্বে বিশ্বাসী কবি হিসাবে আমি তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করতাম এ জন্যও যে, তিনি ছিলেন পাশ্চাত্যের বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতার নির্ভিক সমালোচক আর সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ ও অপরিশোধিত আঞ্চলিকতাবাদের বিরুদ্ধে নিঃশঙ্ক সেনানী।

শৈশবেই আমি তাঁর কবিতা পড়তে শুরু করি, আর বয়স বাড়ার সংগে সংগে আমি তাঁর কিছু কবিতা আরবীতে অনুবাদ করার চেষ্টা করি। তখনও পর্যন্ত আমি তাঁর 'বাঙ্গই-দারা'

[কাফেলার ঘণ্টা] নামক কবিতা-সংকলন ছাড়া আর কোন কাব্য পড়িনি। ইতিমধ্যে তাঁর দু'খানা ফারসী কবিতার সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল।

১৯২৯ সালে, আমার বয়স যখন ষোল বছর তখন তাঁর সংগে আমার প্রথম দেখা হয়। আমি লাহোর বেড়াতে গিয়েছিলাম। লাহোর ছিল তখন শিক্ষা ও সংস্কৃতির একটা বড় কেন্দ্র। গ্রীষ্মের এক তপ্ত দিনে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজের অধ্যাপক ডঃ আবদুল্লাহ চুগতাই আমাকে ইকবালের কাছে নিয়ে গেলেন আর তাঁর কবিতার প্রচণ্ড ভক্ত বলে আমাকে তাঁর সংগে পরিচয় করিয়ে দিলেন। ডঃ চুগতাই আমার আব্বা মরহুম মাওলানা হাকিম সৈয়দ আবদুল হাই হাসনীর নামও উল্লেখ করলেন। ইকবাল তাঁকে তাঁর সদ্য প্রকাশিত ও সারা দেশে জনপ্রিয় মূল্যবান গ্রন্থ *'গুলে-ই-রা'নার'* মাধ্যমে চিনতেন। সেই সাক্ষাতকালে আমি তাঁর রচিত কবিতা *'চাঁদ'*-এর আমার দ্বারা কৃত আরবী অনুবাদের এক কপি উপহার দিলাম। সেটা পড়ে ইকবাল খুশি হন, আর সম্ভবত আমার জ্ঞানের গভীরতা যাচাই করার উদ্দেশ্যে কয়েকজন আরব কবি সম্পর্কে আমাকে কয়েকটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। আমি ফিরে এলাম তাঁর সরলতা, আন্তরিকতা ও বিনয়ে মুগ্ধ হয়ে।

১৯২৯ সাল থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত বছরগুলোতে আমি প্রায়ই লাহোর যেতাম আর মাসের পর মাস সেখানে থাকতাম, কিন্তু অনন্য প্রতিভাধর কবিকে বিরক্ত করতে উৎসাহ বোধ করিনি, কারণ তিনি দীর্ঘকাল আমাদের মাঝে থাকবেন বলে বিশ্বাস করার কারণে আমি তাড়াহুড়ো করার কোন প্রয়োজন বোধ করিনি। উপরন্তু, বিশেষ প্রতিভাবান ব্যক্তিদের সংগে দেখা করার ব্যাপারে ছিলাম লাজুক, আর লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকাও তাঁর সংগে দেখা করার কাজটা মুলতবি রাখার জন্যে আংশিক দায়ী।

এ বছরগুলোর মধ্যে তাঁর আরও দুখানা উর্দূ কবিতার সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল। কবি উর্দূতে লেখা ছেড়ে দিয়ে ফারসিতে কবিতা রচনা করা শুরু করার বেশ কিছুকাল পরে এগুলো আত্মপ্রকাশ করেছিল। উভয় গ্রন্থই ছিল ইকবালের কবি-প্রতিভা ও গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। তখন আমি তাঁর 'যারব-ই-কলিম [মুসার ছড়ির আঘাত]-কে বেশি পছন্দ করতাম, কিন্তু পরবর্তী কালে 'বাল-ই-জিব্‌রাঈল' [জিবরিলের ডানা] আমার বেশি প্রিয় প্রতিপন্ন হয়েছিল, আর আমার এ পুস্তকে তা থেকেই প্রধানত উপাদান সংগ্রহ করেছি।

আমি তখন লাখনৌ-এর নাদ্‌ওয়াতুউল উলেমাতে শিক্ষকতা করছিলাম আর মরহুম মাওলানা মাসুদ আলী নদভীর সংগে আমার কামরাটা ভাগাভাগি করে বাস করছিলাম; তিনি ছিলেন আরবি ভাষায় প্রখ্যাত পণ্ডিত আর ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে আরবি ভাষায় প্রকাশিত 'আল-জিয়া' পত্রিকার সম্পাদক। আমরা একসাথে মিলে ইকবালের কবিতা পড়তাম। আমার এই জান্নাতবাসী বন্ধু ছিলেন ইকবালের প্রগাঢ় ভক্ত, আর আরব জগতে ইকবালের চেয়ে টেগোর [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর] বেশি পরিচিত এ ব্যাপারটা লক্ষ্য করে আমরা সুখী হতে পারিনি। সিরিয়া ও মিশরের বহু বিদ্বান ব্যক্তি টেগোরের [রবীন্দ্রনাথের] ভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। আমরা এর জন্য নিজেদের অপরাধী মনে করতাম, কারণ আমরা ইকবালকে আরব জাতিগুলোর কাছে পরিচিত করার জন্য কিছুই করিনি। আমরা যখন আরবি ভাষায় প্রকাশিত সাময়িক পত্রিকায় টেগোর ও টেগোরের কবিতার প্রশংসা দেখতাম

[আমরা এসব পত্রিকা নিয়মিত পড়তাম] তখন আরবিতে ইকবালের কবিতা আনুবাদ করার সংকল্প দৃঢ়তর হত। এ কাজটাকে আমরা আমাদের কর্তব্য ও আমানত বলে গণ্য করতে শুরু করলাম।

ঘটনাচক্রে কবি ইন্তেকাল করার কয়েক মাস পূর্বে তাঁর সংগে আমার আর একবার দেখা হয়। সে সাক্ষাৎ ছিল দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী ও স্মরণীয়। ১৯৩৭ সালের ২২শে নভেম্বর আমি আমার চাচা সৈয়দ তালহা আল-হাসনি আর তাঁর ছেলে সৈয়দ ইবরাহীম আল-হাসনিসহ ইকবালকে দেখতে যাই। কবি তখন দীর্ঘস্থায়ী ব্যাধিতে নিজ গৃহে আবদ্ধ ; এ ব্যাধিই তাঁর জীবনাবসান ঘটিয়েছিল। রোগগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও তিনি আন্তরিকতার সাথে আমাদের অভ্যর্থনা করলেন, আর আমরা তিন ঘণ্টারও অধিক সময় তাঁর সান্নিধ্যে ছিলাম। এ শ্রম তার প্রভুর জন্যে সহ্যাতীত হবে, এ ভয়ে কবির বৃদ্ধ ও প্রভুগতপ্রাণ ভৃত্য বার কয়েক ভিতরে এসে তাঁকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করা থেকে বিরত করতে চেষ্টা করলো, কিন্তু আল্লামা তার উপদেশের প্রতি কর্ণপাত না করে আমাদের সাথে কথা বলে চললেন। মনে হলো যে, তাঁর হৃদয়ের দ্বার খুলে গেছে তিনি নানা বিষয় সম্বন্ধে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করলেন। প্রাগ-ইসলামীক যুগের আরবি কবিতা সম্পর্কে কথা বলতে যেয়ে তিনি মন্তব্য করলেন যে, তিনি সে কবিতার বাস্তবানুগতা ও প্রাণবন্ততা আর দুর্বলকে রক্ষার আদর্শ ও বীররসের সমঝদার, আর হামসার কয়েকটি কবিতা আবৃত্তি করলেন। তিনি বললেন যে, ইসলাম তার অনুসারীদের অবিচল চিত্তে কাজ করার আর বাস্তবকে গ্রহণ করার নির্দেশ দেয়। তিনি আরও বললেন যে, ভৌত বিজ্ঞান ইসলামের নিকটবর্তী। দু'শতাব্দী যাবত মুসলমানেরা এ ঐতিহ্য অব্যাহত রেখেছিল আর ধর্ম, নৈতিকতা ও সক্রিয় প্রচেষ্টার প্রতি অবিচল ছিল ; তারপর পরদেশী, প্রধানত গ্রীক, ধ্যান-ধারণার প্রভাবে গোটা প্রাচ্য জগত বুদ্ধিবৃত্তিগত দিকে থেকে পঙ্গু হয়ে পড়ে, প্রাচ্যের মানবকুল রোগীতে পরিণত হয়। ইকবাল মন্তব্য করলেন যে, ইউরোপের পুনর্জাগরণ তখনই সম্ভব হয়েছিল যখন সে গ্রীক অধিবিদ্যার শৃঙ্খল ছিন্ন করে শিক্ষার উপযোগী ও অধিকতর উৎপাদনশীল শাখাগুলোর দিকে মনোযোগ দেয়। কিন্তু আধুনিককালে কিছু সমস্যার উদ্ভব হয়, আর সেগুলো ইউরোপকে প্রতিক্রিয়াশীলতার রাস্তায় স্থাপন করেছে। তিনি আরও বললেন যে, যে আরবদের মানসিক গঠন-প্রকৃতি ছিল ইসলামের জন্যে সবচেয়ে বেশি উপযোগী কিন্তু হেলোনিস্টিক ধ্যান-ধারণা ইউরোপে খৃষ্ট ধর্মের ক্ষেত্রে যা করেছিল তা-ই করল ইসলামের ক্ষেত্রে। এ ধ্যান-ধারণা উভয় ধর্মকে বিপর্যস্ত করেছিল।

সুফিবাদ বা ইসলামী মরমীবাদ সম্পর্কে ইকবাল মুসলিম মরমীদের ভাবতত্ত্বগত বাড়াবাড়ির জন্যে দুঃখ প্রকাশ করলেন, আর বললেন যে, নবী করিম (সঃ)-এর সহচরেরা যেখানে অশ্বারোহণে,যুদ্ধবিদ্যায় দক্ষতা প্রদর্শনে,আর শাহাদাত বরণে আনন্দ লাভ করতেন সেখানে সুফিরা আনন্দ লাভ করতেন 'সামা' [সংগীত] ও ওয়াজদে [ভাবাবেশে]। ভারতবর্ষে ইসলামের পুনর্জাগরণ প্রসঙ্গে বলতে যেয়ে তিনি শেখ আহমদ সরহিন্দি, শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেলভী আর সম্রাট আওরাঙ্গজীবের প্রচেষ্টার প্রশংসা করলেন। তিনি বললেন যে, তাঁরা আর তাঁদের প্রচেষ্টা না থাকলে ভারতীয় দর্শন আর কৃষ্টির প্রভাবে ইসলাম বিপর্যস্ত হয়ে যেতো।

তিনি পাকিস্তান দাবী সম্বন্ধেও কথা বলেছিলেন [এখানে স্মরণযোগ্য যে,পাকিস্তানের ধারণা

মূলত তাঁর মৃত্যুর পরে ১৯৪৭ সালে তা বাস্তব রূপ লাভ করেছে] তিনি বললেন যে, আবাসভূমিহীন কোন জাতি তার ধর্ম বিশ্বাস রক্ষা করতে পারে না আর পারে না নিজ কৃষ্টির বিকাশ ঘটাতে। ধর্ম আর কৃষ্টির সংরক্ষণ নির্ভরশীল রাজনৈতিক ক্ষমতার উপর। তাই পাকিস্তানই ছিল ভারতীয় মুসলমানদের অর্থনৈতিক সমস্যাদিসহ অন্যান্য সমস্যার একমাত্র সমাধান। এ প্রসঙ্গে তিনি যাকাত ও বায়তুল মালের বিষয় উল্লেখ করলেন।

ভারতের মুসলমানদের নিকটভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি আমাদের বললেন যে, তিনি অমুসলিমদের মধ্যে ইসলাম প্রচারের প্রয়োজনীয়তার দিকে কয়েকজন দেশীয় রাজন্যের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। এছাড়াও তিনি ধর্মীয় সংস্কার ও মুসলমানদের উন্নতি, আরবি ভাষার প্রসার ও উন্নয়ন.আর একটা (মুসলিম) বিশ্ব ব্যাংক স্থাপনের উপর গুরুত্ব আরোপ করে আসছেন। মুসলমানদের স্বার্থ সমর্থন আর তাদের কণ্ঠে শক্তি সঞ্চারের জন্যে একটি ইংরেজি দৈনিকেরও প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু তিনি আফসোস করে বললেন যে, দেশীয় রাজন্যরা তাঁর উপদেশে কান দেননি। তাঁরা পরিস্থিতির গুরুত্ব আর বিশ্বে যে সব পরিবর্তন ঘটছিল তার তাৎপর্য অনুধাবন করেন নি; তাঁরা ছিলেন স্বার্থপর, সংকীর্ণমনা ও দূরদৃষ্টি-বিবর্জিত।

কবি কথোপকথন চালিয়ে যেতে চেয়েছিলেন কিন্তু আমরা তাঁর অসুস্থতার কারণে বিদায় নেয়া সমীচীন বোধ করলাম। তাই আমরা তাঁকে বিদায় অভিবাদন জানিয়ে চলে এলাম। কয়েক দিনের মধ্যে আমরা লাহোর ত্যাগ করলাম। এটাই ছিল আমাদের শেষ মোলাকাত।

আমার স্পষ্ট মনে আছে যে, আমি তাঁর কয়েকটি কবিতা আরবিতে অনুবাদ করার অনুমতি চাইলে তিনি আনন্দ প্রকাশ করলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে আমার অনুরোধ রক্ষা করলেন। আমি 'যারব-ই-কলিম' থেকে যে সব কবিতার আরবি অনুবাদ করেছিলাম তার গুটিকয়েক তাঁকে পড়ে শুনিয়েছিলাম। তিনি আমাকে জানালেন যে,মিশরের আবদুল ওহাব আয্যামও তাঁর কিছু কবিতা আরবিতে অনুবাদ করার চিন্তা-ভাবনা করছেন। ছ'মাস পরে ১৯৩৮ সালের ২১শে এপ্রিল তাঁর মৃত্যুর খবর শুনলাম; তখন তাঁর জীবন ও রচনা গভীরভাবে অধ্যয়নের সংকল্প জোরদার হল। আমি এ সম্পর্কে আমার বন্ধু মাওলানা মাসুদ আলমের কাছে লিখলাম; তিনি তখন পাটনা শহরে ছিলেন। কবির মৃত্যুতে আমরা পরস্পরের মধ্যে সমবেদনা বিনিময় করলাম, আর আমাদের কর্তব্য সাধনে আমাদের উভয়ের চেষ্টা সমন্বিত করবোবলে স্থির করলাম। মাওলানা মাসুদ আলম ইকবালের ব্যক্তিত্ব ও বাণী সম্পর্কে লেখার প্রস্তাব করলেন, আর তাঁর কবিতা আরবিতে অনুবাদ করার কাজ আমার উপর অর্পণ করলেন। (তিনি বলেছিলেন যে, অনুবাদে তিনি খুব পাকা নন)। তিনি ইকবাল সম্পর্কে একটা ভাবোদ্দীপক রচনা লিখেছিলেন আর সেটি আমার পুরানো বন্ধু মোহিউদ্দীন খাতিব (মরহুম) সম্পাদিত কায়রোর 'আল-ফাতাহ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। আমিও ইকবালের জীবনী বিষয়ক একটা প্রবন্ধ লিখেছিলাম, আর সেটা কিছু দিন পরে সাউদী-আরব বেতার থেকে প্রচারিত হয়েছিল। কিন্তু তারপর বিভিন্ন কারণে আমাদের আরব্ধ কাজটি দশ বছর মুলতবি রইল।

১৯৫০ সালে আমি সাউদী আরব, সিরিয়া ও মিশর ভ্রমণ করি। এসব দেশে আমার এক বছরেরও বেশি দিন স্থায়ী অবস্থান-কালে আমি ইকবাল, তাঁর চিন্তা ও শিল্প-সৌকর্য সম্বন্ধে

কয়েকটা গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখি, আর সেগুলো আমি দারুল উলুম আর ফুআদ বিশ্ববিদ্যালয়ে (বর্তমানে কায়রো বিশ্ববিদ্যালয় নামে পরিচিত) পাঠ করি। ১৯৫৬ সালে আমি সিরিয়ায় অবস্থান-কালে 'নবী করীমের মদিনায় মোহাম্মদ ইকবাল' -শীর্ষক প্রবন্ধ রচনা করি, আর সেটি দামেস্ক বেতার থেকে প্রচারিত হয়। কিন্তু ইকবালের কবিতা অনুবাদের কাজে হাত দেওয়া হয়ে উঠলনা। হয়তো এর একটা কারণ এই যে, ডঃ আবদুল ওহাব আযযাম ইতিমধ্যে এ কাজ শুরু করেছিলেন। ফারসি ও আরবি উভয় ভাষায় তাঁর পাণ্ডিত্য আর ইকবালের সঙ্গে তাঁর বুদ্ধিবৃত্তি ঘণিষ্ঠতার কারণে তিনি ছিলেন এ কাজের জন্য সর্বাধিক যোগ্য ব্যক্তি, কিন্তু তাঁর অনূদিত কবিতাবলীর দুটো সংকলন বের হবার পর আমার কয়েকজন বন্ধু আমাকে জানালেন যে, সেগুলোতে ইকবালের হৃদয়-উদ্বেল-করা বৈশিষ্ট্য বিধৃত হয়নি, আর নেই তাতে আবেগের উষ্ণতা আর দ্যুতি ; ইকবালের চিন্তা ও বাণীও তাতে বাঙ্ময় হয়নি ; ওগুলো ইকবালের প্রাণবন্ত ও শক্তিমান কাব্যের যথাথ অনুবাদই হয়নি। আমি যখন সেগুলো পড়লাম তখন লক্ষ্য করলাম যে, তাতে ছন্দ-বিষয়ক কোন ত্রুটি ছিল না, আর ইকবালকে বুঝাতেও ডঃ আযযাম ভুল করেননি। অনুবাদগুলোতে ডঃ আযযামের আরবি প্রকাশ-ভঙ্গি বিষয়ক জ্ঞানের গভীরতারও পরিচয় ছিল। আসল ব্যাপারটা ছিল এই যে, ডঃ আযযাম কাব্যানুবাদ করতে যেয়ে নিজের ও মহান কবির প্রতি অন্যায় করে ফেলেছেন। কাব্যে অনুবাদের ফলে ইকবালের কবিতার তাড়না-শক্তি, সজীবতা ও কার্যকারিতা বহুলাংশে বিনষ্ট হয়েছিল। উপরন্তু অনুবাদে এক ধরণের অস্পষ্টতা ও জটিলতা প্রবেশ করে পাঠক ও তাঁর উপলব্ধির মধ্যে প্রতিবন্ধক দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। আরবি ও ফারসিতে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী ডঃ আয্যাম যদি প্রথম ইকবালের চিন্তা ও শিল্পের গভীরে প্রবেশ করে পরে কবিতাগুলোকে গদ্যে অনুবাদ করতেন তা হলে ভাল হত।

প্রত্যেক ভাষারই বিশিষ্ট মেজাজ আর গুণ আছে, আছে নিজস্ব বাগধারা আর প্রকাশ-ভঙ্গি। আর এগুলোর মূল রয়েছে ইতিহাস ও কৃষ্টিতে। অনুবাদকালে যদি এসব স্মরণ রাখা না হয় তা হলে মূল কবিতার মাধুর্য আর আবেগ-বহ্নি বহুলাংশে বিনষ্ট হয়ে যায়। তা সত্ত্বেও ডঃ আযযাম ইকবালের কিছু কবিতা আরবিতে অনুবাদ করে মুসলিম জাহানের প্রভূত খেদমত করেছেন, আর সেজন্য তিনি অঢেল প্রশংসা আর ইসলামী চিন্তা ও সাহিত্যের পণ্ডিত ব্যক্তিদের দীর্ঘস্থায়ী কৃতজ্ঞতার দাবীদার। তাঁর তরজমা তাঁর গভীর বিদ্যাবত্তা ও আন্তরিকতার সাক্ষ্য বহন করে। তাঁর এই ভালোবাসা- প্রণোদিত শ্রম নিশ্চয়ই ইকবালের আত্মাকে সুখী করবে।

আমার বহুবিধ তৎপরতা ও ব্যস্ততা একটা ঘটনা ঘটার পূর্ব পর্যন্ত ইকবালের কবিতা অনুবাদ করার ইচ্ছাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। প্রখ্যাত আরবি পণ্ডিত ডঃ আলী তানতাভির আমার উদ্দেশ্যে লেখা একখানা খোলা চিঠি আমি 'আল-মুসলিমুন' পত্রিকার পৃষ্ঠায় পড়লাম; সে পত্রে তিনি আরব জগতের কাছে ইকবালকে পরিচিত করাবার জন্য আমাকে অনুরোধ করেছিলেন। সে চিঠিখানায় ছিল ঃ

'আপনি কি মেহেরবানি করে ইকবালের কিছু নির্বাচিত কবিতা আরবিতে অনুবাদ করবেন যাতে আমরা তাঁর কবিতা ও বাণীর অসামান্যতা সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারি ? ————ইকবালের কবিতার যে সামান্য কয়েকখানি আরবি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে তা

ইকবালের, তাঁর চিন্তার গঠন বৈশিষ্ট্যের আর তাঁর কবিতার গৌরব-মহিমার সঠিক চিত্র তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছে। তাই আপনি যে সব কাজ করার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছেন এ খেদমতটাকেও তার অন্তর্ভুক্ত করে কি আরব বিশ্বের কাছে ইকবালের কবিতার সজীবতা ও গৌরব পৌঁছে দেবেন, দেবেন আনন্দময় বাগিচার দ্বার আমাদের আছে উন্মোচন করে আর সমৃদ্ধ করবেন ইসলামী সাহিত্যকে ?"

আমি এ আহবানে সোৎসাহে সাড়া না দিয়ে পারিনি। এক বসায় "মসজিদ-ই-কার্তবা"র (কর্ডোভার মসজিদ) অনুবাদ সম্পন্ন করি আর ইকবালের কবিতা অনুবাদ করার কাজে এগিয়ে যাবার একটা অপ্রতিরোধ্য তাকিদ অনুভব করি মনের ভিতর। এমনি করে শুরু হল একটা প্রক্রিয়া, আর শিগগিরই লেখা হল কয়েকটা প্রবন্ধ আর কতকগুলো কবিতা হল অনূদিত।

আমি পরিষ্কারভাবে বলতে চাই যে, আমি ইকবালকে অসামান্য ধর্মীয় নেতা, ধর্মতত্ত্ববিদ বা প্রশ্নাতীত রকম ধর্মভীরু ও আল্লাহর প্রতি কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তি বলে গণ্য করিনা অথবা তাঁর অতি উৎসাহী ভক্তদের মতো তাঁর প্রশংসায় সহস্রমুখ হবার প্রতিও আমার কোন ঝোঁক নেই। আমার বিশ্বাস, হাকিম সুনাই, ফরিদউদ্দীন আত্তার ও জালালউদ্দীন রুমী এসব ক্ষেত্রে তাঁর চেয়ে অগ্রসর ছিলেন। তাঁর *Six Lectures on the Reconstruction of Religious Thought in Islam*-এ কিছু কিছু ইসলামী ধারণার যে ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন তার সঙ্গে আমার মতের মিল নেই। আমি এ মতও পোষণ করিনা যে, ইসলামকে তাঁর চেয়ে ভাল কেউ বুঝত না, ইসলামের মর্মমূলে আর কেউ পৌঁছেনি। আমি সারা জীবন যা অনুভব করেছি তা হচ্ছে এই যে, তিনি ইসলামী ধর্মতত্ত্ব, কৃষ্টি ও দর্শনের একজন নিষ্ঠাবান ছাত্র ছিলেন, তিনি বিখ্যাত মুসলিম ধর্মতত্ত্ববিদদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন আর তাদের উপদেশ কামনা করতেন। তিনি মাওলানা আনোয়ার শাহ্ কাশমিরী, মাওলানা সৈয়দ সুলায়মান নদভী ও মাওলানা মাসুদ আলম নদভীর কাছে যে চিঠিগুলো লিখেছিলেন তা তাঁর বিনয় ও জ্ঞানার্জনের প্রবল স্পৃহার পরিচয় বহন করে।

ইকবালের অতুলনীয় ব্যক্তিত্বের কতকগুলো দিক আছে যা তার শিল্প ও শিক্ষার গভীরতা আর তার বাণীর মহৎ চমৎকারিত্বের সাথে খাপ খায়না। সম্ভবত তিনি এ বিচ্যুতিগুলো অতিক্রম করার সুযোগ পাননি। তবে আমি বিশ্বাস করি যে, ইকবাল ছিলেন এমন একজন কবি যাঁকে আল্লাহ পাক আধুনিক যুগের প্রেক্ষিতে নির্দিষ্ট কতকগুলো সত্য আর মতবাদকে স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করার জন্যে প্রেরণা দান করেছিলেন।

তিনি ছিলেন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর আহবানের স্থায়িত্ব, মুসলিম সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব দানের সহজাত শক্তি ও সামর্থ্য, আর আধুনিক বৈশিষ্ট্যময় ধ্যান-ধারণা আর রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিয়ম-ব্যবস্থাদির দেউলিয়াত্বে দৃঢ় বিশ্বাসী। এ বিষয়গুলো সম্পর্কে তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় তাঁর চিন্তাকে স্পষ্টতা, পরিপক্কতা দান করেছিল আর ব্যক্তিত্বের প্রবৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটিয়েছিল, একদিকে তিনি পাশ্চাত্য চিন্তা ও কৃষ্টি সম্পর্কে অজ্ঞ আর ইসলামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ধারণাবিহীন ইসলামী ধর্মতত্ত্বের মহাপণ্ডিতদের চেয়েও উৎকৃষ্ট ছিলেন।

আমাকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, আমি ইকবালকে বিশ্বাস, প্রেম ও প্রগাঢ় হৃদয়বৃত্তির

কবি বলে গণ্য করি। যখনই আমি তাঁর কবিতা পড়ি তখনই আমার অস্তিত্বের অন্তঃস্থল পর্যন্ত উজ্জীবিত ও আলোড়িত হয়। তাঁর কবিতা আমার কল্পনার সামনে দূরপ্রসারী দৃশ্যপট উন্মোচিত করে, আর ইসলামের জন্যে প্রগাঢ় উৎসাহ ও উদ্দীপনায় আমাকে কানায় কানায় ভরে দেয়। আমি মনে করি, এর (উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টির ক্ষমতা) মধ্যেই ইকবালের কবিতার প্রকৃত মূল্য আর তাৎপর্য নিহিত।

ইকবালকে আরবিতে অনুবাদ করার আরো একটি তাকিদ অনুভব করেছিলাম এ কারণে যে, আরবরা পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী সভ্যতার কাছে লজ্জাজনকভাবে আত্মসমর্পণ করছিল। আমি দেখেছিলাম, কিভাবে মুসলিম জাহান প্রাচীন ও আধুনিক এ দু'ধরনের *paganism* (প্রকৃতি উপাসনাবাদ)-এর সংযোগস্থলে দাঁড়িয়ে ছিল। এক দিকে ছিল অতিরঞ্জিত জাতীয়তাবাদ আর অন্যদিকে ছিল উপাস্যবিহীন সমাজতন্ত্র *[Communism]*, আর এ দুয়ের মারাত্মক কুফল দৃশ্যমান হয়ে ফুটে উঠেছিল মুসলিম জাহানের সাহিত্য, চিন্তা ও আচরণে। বিশ্ববাসীকে আরবরা যে পয়গাম দিয়েছে তার তাৎপর্য অনুধাবন করতে যে লেখকরা সক্ষম;আর সর্বগ্রাসী অন্ধকার,বুদ্ধিবৃত্তিক ও আদর্শবিচ্যুতি শিক্ষিত শ্রেণীগুলোর উপর ক্রমাগত দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর-ভাবে নিয়ন্ত্রণ কায়েম করছিল তার বিরুদ্ধে অবিরাম যুদ্ধে আত্মনিয়োগ করতে প্রস্তুত মুসলমানের মধ্যে তেমন লেখকের সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছিল।

এ প্রেক্ষাপটে বিচার করলে ইকবালের গুরুত্ব আরো বেড়ে যায়। ইসলামের সূতিকাগার থেকে বহুদূরে সম্প্রতি ধর্মান্তরিত এক ব্রাহ্মণ পরিবারে এবং পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জিঞ্জিরে বাঁধা একটি দেশে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি শিক্ষা লাভও করেছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষার কয়েকটি বিশিষ্ট কেন্দ্রে, কিন্তু তা সত্ত্বেও মহানবী মুহাম্মদ (সঃ)-এর পয়গামে তার বিশ্বাস গভীরতর ও দৃঢ়তর হয়েছিল। তিনি মুসলিম মিল্লাতের গৌরবময় অদৃষ্টে গভীরভাবে আস্থাবান ছিলেন। ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন আর পাশ্চাত্যের চিন্তা ও সভ্যতার প্রতি ঘৃণা তাঁর দ্বিতীয় স্বভাবে পরিণত হয়েছিল। তিনি তাঁর অন্তর আর বুদ্ধির সমস্ত অতুল সম্পদ সে কাজে নিয়োজিত করেছিলেন, আর ঈমান, দিব্যদৃষ্টি ও চিন্তামূলক কবিতার প্রতীকে পরিণত হয়েছিলেন। তাঁর ধ্যান-ধারণা উপমহাদেশের নিস্তরঙ্গ জলাশয়ে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল আর এখানে উত্থিত তরঙ্গমালা আরব তথা গোটা মুসলিম জাহানের সৈকত প্লাবিত করেছিল।

তাই আমার মনে হল মুসলিম ও আরব তরুণদের আমি যে শ্রেষ্ঠ উপহার দিতে পারি তা হচ্ছে ইকবালের কবিতার আরবি অনুবাদ। আমি বিশ্বাস করি যে, আমার এ পুস্তক মুসলমানদের মানসিক ঔদাস্য ও অবসাদ ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করবে আর তাদের ভিতর নতুন চিন্তা-চেতনার উন্মেষ ঘটাবে।

ইকবালের হাস্য-কৌতুক

মূল ঃ সাবের কালূরাবী

আবু নায়ীম অনূদিত

আল্লামা ইকবাল (রঃ) বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে এক বিশাল ব্যক্তিত্ব। তিনি একাধারে কবি, সাহিত্যিক, ইতিহাসবিদ, দার্শনিক এবং ইসলামী চিন্তাবিদ। তাঁর ক্ষুরধার লেখনী ও জাদুমন্ত্রবৎ বর্ণনায় ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য যেভাবে প্রতিভাত হয়ে উঠে তা সত্যিকার অর্থেই একজন সচেতন, বোদ্ধা পাঠককে রীতিমত পুলকিত ও চমকিত করে। এতসব গুণ-বৈশিষ্ট্যর বাইরে তাঁর আরেকটি বিশেষ গুণ ছিল হাস্য-কৌতুক। নিজের সঙ্গী-সাথী এবং ভক্ত-অনুরক্ত ও নিকটবর্তীজনের সঙ্গে তিনি অনেক সময়েই এমন সব হাস্য-কৌতুক করতেন যা মূলত সরস সাহিত্যের উপজীব্য। সমসাময়িক বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব বিশেষতঃ আতিয়া ফয়জীর নামে লেখা পত্রাবলীতে ইকবাল-জীবনের এ দিকটি বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। হাস্য-কৌতুক বা কাউকে চিমটি কাটার কোন সুযোগ পেলে আল্লামা ইকবাল মোটেই তা হাতছাড়া করতেন না।

ইকবালের কেম্ব্রিজ-এর ছাত্রজীবনে একবার সেখানে ধর্ম সম্পর্কিত আলাপ-আলোচনা শুরু হয় ; তখন একজন আল্লামাকে প্রশ্ন করলো ঃ

"কি ব্যাপার! পৃথিবীতে যত নবী-রাসূল এসেছেন তাঁরা সবাই এশিয়াতে, ইউরোপে একজনও জন্ম নেননি !"

আল্লামা ঝটপট উত্তর দিলেন ঃ

"ভাই ! প্রথম প্রথম আল্লাহ্ তা'আলা এবং শয়তান যার যার অধিষ্ঠান স্থল ঠিক করেছে। আল্লাহ্ তা'আলা এশিয়াকে নির্বাচন করেছেন আর শয়তান ইউরোপকে নির্বাচিত করেছে।"

এ জবাব শুনে সে ব্যক্তি বলে উঠলো ঃ

"তা হলে শয়তানের পয়গম্বর কে ?"

আল্লামা জবাব দিলেন ঃ

"কেন ? তোমাদের মেকিয়াভেলীই তো শয়তানের পয়গম্বর।"

لارڈ کچنر (লর্ড কিচনার) এক সামুদ্রিক জাহাজের যাত্রী ছিলেন, দুর্ঘটনাকবলিত হয়ে জাহাজটি নিমজ্জিত হলে তিনি মারা যান। সংশ্লিষ্ট সকলেই স্থির নিশ্চিত যে, লর্ড কিচনার সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়ে মারা গেছেন। সেকালেই একজন রটিয়ে দিল যে, লর্ড কিচনারকে সমুদ্র থেকে জীবন্ত উদ্ধার করা হয়েছে। একজন আল্লামার সাথে আলোচনায় বললো, "শুনেছি লর্ড কিচনার যিন্দা হয়ে গেছে।"

আল্লামা নিরুদ্বিগ্নভাবে উত্তর দিলেন ঃ

"হ্যাঁ ভাই ! কডলিভার ওয়েলরূপে যদি ফিরে এসে থাকে তবে বিস্মিত হবার কিছু নেই।"

কাশ্মীরী বংশোদ্ভূত কোন এক লোক অন্য বংশে বিয়ে করতে চাচ্ছিল। আল্লামা লোকটিকে এরূপ করতে নিষেধ করছিলেন। তখন আল্লামার নিকট বসে থাকা একজন ছাত্র প্রতিবাদের সুরে বললো, আপনি তো সব সময়ই বংশীয়-গোত্রীয় মর্যাদা বিলোপের উপদেশ দিয়ে থাকেন।

আল্লামা হেসে জবাব দিলেন : "তোমার কথা সম্পূর্ণরূপে ঠিক, কিন্তু এ লোক সেখানে বিয়ে করলে তার সন্তানাদিও কালো কালো হবে। আমার আকাঙ্ক্ষা, মুসলমানদের সন্তানরাও সুন্দর-সুশ্রী, লাল এবং শাদাশুভ্র রংয়ের হবে যাতে প্রকৃত অর্থেই আমরা '*মিল্লাতে বাইজা*' অর্থাৎ 'সুশ্রী-সুন্দর' জাতিতে পরিণত হতে পারি।" আল্লামার এ কৌতুকপূর্ণ জবাবে সকলে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে।

এক সভাতে শ্রোতৃমণ্ডলীর একান্ত আশা ছিল যে, আল্লামা তাঁর স্বভাবসুলভ সাহিত্য প্রতিভাগুণে কোন উচ্চ সাহিত্যমানসম্পন্ন ভাষণ দান করবেন, কিন্তু আল্লামা বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়িয়ে বললেন :

"বিশ্বযুদ্ধের সময় ইবলীসের কয়েকজন ভক্ত-অনুরক্ত তার সঙ্গে সাক্ষাত করতে গিয়ে দেখে সে বসে বসে দিব্যি আরামে সিগারেট ফুঁকছে। ইবলীসকে এরূপ অবসর দেখে ভক্তরা এর কারণ জিজ্ঞেস করলে সে জবাব দিলো : *"আজকাল আমি অবসর। কারণ, আমার যাবতীয় কাজ-কর্মের দায়িত্ব বৃটিশ মন্ত্রিসভার কাছে হস্তান্তর করেছি।"*

আফগানিস্তানের জেনারেল নাদের শাহ কাবুল যাবার সময় লাহোরে পৌঁছুলে ইকবাল তাঁর সাথে সাক্ষাত করার জন্য রেল স্টেশনে যান। তিনি ইকবালের বাহ্যিক অবস্থা দেখে অত্যন্ত হয়রান হয়ে বলে উঠলেন : "তো আপনিই ইকবাল ! আমি ভেবেছিলাম আপনি লম্বা দাড়িওয়ালা বুজুর্গ অবয়বের অধিকারী !"

জবাবে ইকবাল বললেন :

"আপনার ব্যাপারে আমার হয়রানি আরো বেশী। কেননা, আপনি একজন জেনারেল। আমি ধারণা করেছিলাম আপনি হবেন লম্বা, স্বাস্থ্যবান। কিন্তু, আপনি ক্ষীণকায় পাতলা স্বাস্থ্যের অধিকারী। আপনার মধ্যে বাহ্যতঃ জেনারেলের কোন শানই পরিলক্ষিত হয় না।"

ফকীর সাইয়্যেদ ওহীদুদ্দীনের এক স্নেহভাজনের কুকুর পোষার শখ ছিল। একবার ফকীর সাহেব স্নেহভাজনের মোটরে করে আল্লামার সাথে সাক্ষাত করতে আসেন। মোটরের মধ্যে তার কুকুরটিও ছিলো। তারা আল্লামার নিকট গিয়ে বসলো। এদিকে কুকুরটি মোটরেই রেখে গেলো। কিছুক্ষণ পরেই আল্লামার কন্যা মুনীরা ছুটে এসে বললো :

"আব্বাজান ! মোটরে করে কুকুর এসেছে"। আল্লামা উপস্থিত দু'জনের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন : "না বেটী ! এঁরা তো মানুষ।"

একবার চৌধুরী শিহাব উদ্দীন আপাদ-মস্তক সাদা পোশাক পরিধান করেছিল। তাকে দেখে আল্লামা নির্দ্বিধায় পাঞ্জাবী ভাষায় বললেন :

"اوہ دیکھو جبہ وچ کٹا وڑ گیا"

অর্থাৎ, দেখ ! দেখ ! জুব্বার মধ্যে মহিষের বাচ্চা ঢুকে পড়েছে।

এই চৌধুরী শিহাব উদ্দীন সাহেবই একটি কুঠি তৈরী করেন। আল্লামার থেকে এই কুঠির নাম চাওয়া হলো আল্লামা বললেন : এতে চিন্তা করার কি আছে, "دیو محل" রেখে দাও। (উল্লেখ্য যে, চৌধুরী শিহাব উদ্দীন সাহেবের গায়ের রং ছিলো অত্যন্ত কালো।)

আরেক দিন চৌধুরী সাহেবের কুঠিতে ইফতার পার্টি ছিলো। চৌধুরী সাহেব পানি চাইলেন। আল্লামা লোক ডেকে বললেনঃ "দেখো ভাই ! চৌধুরী সাহেবের জন্য বালতি ভরে পানি আনবে কিন্তু।"

ইকবাল ও গোলাম মোস্তফা

ডঃ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্

ইকবাল ও গোলাম মোস্তফার ভাবধারায় অনেক ক্ষেত্রেই ঐকতান পরিলক্ষিত হয়। তাঁরা উভয়েই ছিলেন জীবনের কবি, ইসলামী আদর্শের কবি, মুসলিম জাতীয়তাবাদ ও প্যান ইসলামবাদের পতাকাবাহী। তাঁরা উভয়েই ছিলেন জাতীয় জাগরণ ও আযাদী আন্দোলনের অগ্রনায়ক। মুসলিম-সাহিত্য রচনায়, মুসলিম সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের পরিচায়নে ইকবাল ও গোলাম মোস্তফা যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন, তা জাতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। মুসলিম জাতীয় সাহিত্য আজ তাঁদের অবদানে সমৃদ্ধ।

উভয়ের মধ্যে ভাবের ঐক্য দেখা গেলেও সর্বক্ষেত্রে এটা বলা চলে না যে, এই চিন্তাধারা একজনের স্বকীয় এবং অপর জনের পরকীয়। মৌলিক চিন্তাধারার মানে এই নয় যে, তা অবশ্যই মহাকাল ভাব-সমুদ্রের উর্ধ্বে স্বতন্ত্র একটা কিছু হবে। ভাব-মহাসমুদ্রে রয়েছে যুগ-যুগান্তরের অগণিত চিন্তাশীল মানুষের অবদান। এখান থেকে রত্ন আহরণ করেই মনীষিগণ আপন চিন্তাভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে তোলেন। তাঁরা এ সংগৃহীত জ্ঞানের আরো শ্রীবৃদ্ধিসাধন করেন এবং অনাগত ভবিষ্যতের মানুষের জন্যে তা গচ্ছিত রেখে যান। এ রত্ন আহরণকে যেমন ধার বলা চলে না, তেমনি এর শ্রীবৃদ্ধিসাধনকেও সৃষ্টিধর্মী সংযোজন না বলে পারা যায় না।

ইকবাল এবং গোলাম মোস্তফা সমসাময়িক কবি হলেও কাব্যজগতে এঁদের সফর শুরু হয় ভিন্ন সময়ে এবং তা শেষও হয় ভিন্ন সময়ে। এঁদের কাব্য রচনার কাল, পরিবেশ এবং বাহনও ছিল অনেকটা স্বতন্ত্র। ইকবালের 'হিমালাহ্' (হিমালয়) শীর্ষক প্রথম কবিতাটি 'মাখযান' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৯০১ সালে। তখন তিনি লাহোর গভঃ কলেজের একজন অধ্যাপক। গোলাম মোস্তফার 'আদ্রিয়ানোপল উদ্ধার' শীর্ষক কবিতাটি জনসমক্ষে আসে ১৯১৩ সালে। এ সময়ে তিনি যশোরে এক হাই স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র। ইকবালের পঁয়ত্রিশ বছরের সাহিত্য জীবনের অবসান ঘটে তাঁর মৃত্যুর সাথে ১৯৩৮ সালে। গোলাম মোস্তফা প্রায় অর্ধ শতাব্দীকাল সাহিত্যকর্মে রত ছিলেন এবং শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ১৯৬৪ সালে। ইকবাল ছিলেন উর্দূ ও ফার্সী কবি। গোলাম মোস্তফার লেখনী সীমাবদ্ধ ছিল বাংলা সাহিত্যের ময়দানে। ইকবালের বেশীর ভাগ জীবন অতিবাহিত হয় আইনজীবী ও রাজনীতিকরূপে। পক্ষান্তরে, গোলাম মোস্তফা তাঁর অধিকাংশ জীবন ব্যয় করেন সরকারী শিক্ষকরূপে। এই বৈসাদৃশ্য সত্ত্বেও তাঁদের চিন্তা ধারায় যে সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়, তার উৎস কোথায় ? অনুমান করে একথা বলা যায় যে, হয়তো ইকবালের ভাবধারায় প্রভাবান্বিত

হয়েই গোলাম মোস্তফা আপন কাব্যে তার চিন্তাধারার পুনরাবৃত্তি করেছেন। কারণ, যেসব ক্ষেত্রে এঁদের মধ্যে সামঞ্জস্য দেখা যায়, সেখানে ইকবালই প্রথমে অবতীর্ণ হন। তা'ছাড়া গোলাম মোস্তফা নিজেও বিভিন্ন লেখার মধ্য দিয়ে ইকবালের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন। তিনি ইকবালের সাহিত্যাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর বেশ কয়েকটি কবিতার বাংলা অনুবাদও প্রকাশ করেন। তিনি 'ইকবাল ও রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক প্রবন্ধ রচনা করে ইকবালের কাব্যাদর্শের বিশদ ব্যাখ্যা করেন। কবি রবীন্দ্রনাথের উপর ইকবালের প্রাধান্য দিতে গিয়ে তিনি বলেন ঃ

"যে কারণে ইকবাল প্লেটো বা হাফিজকে আমল দেন নাই, ঠিক সেই কারণে আমরা রবীন্দ্র কাব্যকেও আমল দিতে পারি না। রবীন্দ্র কাব্যও আমাদের মনে এনে দেয় প্রশান্তির মনোভাব। যে নতুন নভোভ্রমণের যুগ এল, নব সৃষ্টি ও নব সম্ভাবনার যুগ এল, সে যুগের কবি রবীন্দ্রনাথ নন। সে যুগের কবি ইকবাল।" [আমার চিন্তাধারা]

এমতাবস্থায়, কেউ যদি বলতে চান, গোলাম মোস্তফা ইকবাল-সাহিত্যের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছেন, তবে তা বিচিত্র বা অবিশ্বাস্য নয়।

গোলাম মোস্তফা ইকবালের কাব্যধারায় প্রভাবান্বিত হয়ে থাকলেও একে অনুকরণ না বলে মহাকালের ভাব-সমুদ্র থেকে রত্ন আহরণ বলাই অধিকতর সমীচীন হবে। কারণ, এঁদের দু'য়ের মাঝে যেখানে ভাব-ঐক্য রয়েছে, সেখানে কবি গোলাম মোস্তফার নিজস্ব ব্যক্তিত্ব, স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি ও বাণীভঙ্গি ফুটে উঠেছে। ইসলামী আদর্শের সাহিত্যায়নে ইকবাল হয়তো তাঁর পূর্বসূরি উর্দু কবি হালী, শিবলী, আকবর এলাহাবাদী এবং তাঁর সমসাময়িক ইসলামী চিন্তাবিদ মাওলানা আবুল কালাম আযাদ ও সৈয়দ সুলায়মান নাদবীর মতবাদে প্রভাবান্বিত হয়ে থাকবেন; ঠিক তেমনিভাবে গোলাম মোস্তফাও হয়তো তাঁর পূর্বসূরি ইসমাইল হোসেন শিরাজী ও কায়কোবাদ থেকে প্রেরণা লাভ করে থাকবেন, কিন্তু এতে তাঁদের সাহিত্য-মূল্য হ্রাস পাবার কথা নয়। কারণ, এই রস সিঞ্চনই তাঁদের সব কিছু নয়। তাঁদের অনুপ্রেরণার মূল উৎস হলো– কুরআন, হাদীস এবং ইসলামের ইতিহাস। তাঁরা কুরআন ও হাদীসের মর্মবাণী অনুধাবন করেন, ইসলামের ইতিহাস থেকে মুসলিম ঐতিহ্য ও মুসলিম কৃষ্টি উত্তমরূপে মন্থন করেন। তাঁরা যে ইসলামের মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করেন, তা একজন মুসলমানরূপে নয়, বরং একজন চিন্তাবিদরূপে। তাঁরা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন, ইসলামী আদর্শই একমাত্র পথ যাতে বিশ্বের যুদ্ধ-বিগ্রহ, বিবাদ-বিসংবাদ বিদূরিত হয়ে শান্তি আসতে পারে। যাতে মহামানবতা ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এ বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হয়েই তাঁরা আপন রচনাবলীতে ইসলামী আদর্শ প্রচারে ব্রতী হন এবং মানব মনে এর মহত্ত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন।

জাতীয় জাগরণে ইকবাল ও গোলাম মোস্তফার সাহিত্যের সবচাইতে বড় অবদান হলো তাঁদের মুসলিম জাতীয়তাবাদ। মুসলিম জাতীয়তাবাদ এবং অমুসলিম জাতীয়তাবাদ—এ দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতেই ভারত বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়। অবশ্য এ দ্বি-জাতিতত্ত্ব কোন নতুন মতবাদ নয়। এটা এতই পুরনো, যতটুকু পুরনো ইসলাম ও কুরআন। কুরআন

বর্ণ, গোত্র এবং ভাষা নির্বিশেষে বিশ্বের সমস্ত মুসলমানদের একটি স্বতন্ত্র জাতিরূপে আখ্যায়িত করে ঃ

'তোমরা বিশ্বের সেরা জাতি। মানব জাতির কল্যাণ সাধনেই তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে।'

এই স্বতন্ত্র জাতীয়তাবাদের ধ্যান-ধারণা এ উপমহাদেশীয় মুসলমানদের কাছে স্পষ্ট ছিল যুগে যুগে। কিন্তু মোগল সম্রাট আকবরের (১৫৫৬-১৬০৫) দ্বীনে এলাহীর প্রচার এবং হিন্দু জাতির প্রতি তাঁর অশোভন উদারতার ফলে মুসলমানদের এ স্বাতন্ত্র্যবোধ এক মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন হয়। মুজাদ্দিদ-ই-আলফে সানী (১৫৬৩-১৬২৪), সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীর (১৫৫৮-১৭০৭) এবং শাহ্ ওলীউল্লাহ্ দেহলবীর (১৭০৩-১৭৬১) ধর্মীয় আন্দোলনের ফলে মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় চেতনা অনেকটা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়, ধর্মীয় শিক্ষা-দীক্ষা ও সংস্কৃতি জোরদার হয়ে উঠে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় দ্বন্দ্ব-কলহের দরুন তাদের জাতীয় স্বাতন্ত্র্য ও সংহতি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তাদের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাজাত্যবোধে ভাটা পড়ায় মোগল সাম্রাজ্যের পতন ঘটে এবং এ উপমহাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয় বৃটিশ শাসন।

মুসলমানদের অধঃপতন এখানেই শেষ নয়। ১৮৫৭ সালে সমগ্র ভারতে বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন হিন্দু জাতি এবং ইংরেজ উভয়ের খপ্পরে পড়ে অর্থনীতি ক্ষেত্রে তাদের দেউলিয়া হবার উপক্রম হয়। জীবনের সব ক্ষেত্রে হিন্দু প্রাধান্যের ফলে তারা কেবল মান-ইজ্জতই হারায়নি, জাতীয় স্বাতন্ত্র্যবোধও হারাতে বসে। এমন সময় তাদের ভাগ্যাকাশে স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁর ন্যায় এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের উদয় হয়। তিনি কুরআনে উল্লেখিত মুসলিম জাতীয়তাবাদকে একটি রাজনৈতিক মতবাদরূপে দাঁড় করান। মুসলমানদের রাজনীতি ক্ষেত্রে হিন্দু জাতি থেকে দূরে সরে থেকেএকটি স্বতন্ত্র কর্মপন্থা অবলম্বনের উপদেশ দেন। তিনি প্রথমে উপমহাদেশীয় জাতীয়তাবাদ সমর্থন করতেন। কিন্তু হিন্দু নেতাদের বিরূপ মনোভাব বুঝতে পেরে তিনি আপন মত পরিবর্তন করতে বাধ্য হন। ১৮৭০ সালে তিনি লণ্ডন থেকে নওয়াব মুহসিনুল মুলকের নিকট এক পত্রে উর্দূ-হিন্দী ঝগড়া সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন ঃ

"মুসলমান কোন দিন হিন্দীকে সমর্থন করবে না......এবং এর ফল এই দাঁড়াবে যে, হিন্দু ও মুসলিম নিঃসন্দেহে আলাদা হয়ে যাবে। আমি মনে করি, মুসলমানরা যদি হিন্দু থেকে আলাদা হয়ে স্বতন্ত্র কর্মপন্থা অবলম্বন করে, তবে তারাই বেশী উপকৃত হবে। পক্ষান্তরে হিন্দুরা হবে ক্ষতিগ্রস্ত।"

১৮৮৩ সালে আইন পরিষদে যখন '*লোকাল সেলফ গভর্নমেন্ট*'- এর প্রশ্ন উথাপিত হয়, তখন স্যার সৈয়দ আহমদ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে তাতে এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের নিয়োগ সরকারের স্বহস্তে রাখার প্রস্তাব পেশ করেন। ১৮৮৬ সালে তিনি মুসলমানদের শিক্ষা সংস্কারের জন্য 'মোহামেডান এডুকেশন্যাল কনফারেন্স' গঠন করেন। ১৮৮৬ এবং ১৮৮৮ সালে যথাক্রমে লক্ষ্ণৌ এবং মিরেঠের ভাষণে তিনি মুসলমানদের কংগ্রেসে যোগদান থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেন। ১৮৯৩ সালে তিনি '*মোহামেডান*

ডিফেন্স এসোসিয়েশন' নামক একটি রাজনৈতিক দলও গঠন করেন।

মোটকথা, ভারতে স্যার সৈয়দ আহমদই সর্বপ্রথম মুসলিম জাতীয়তাবাদকে একটি রাজনৈতিক মতবাদরূপে গ্রহণ করেন। তিনি ধর্মীয় জাতীয়তাবাদকে রাজনৈতিক মতবাদরূপে গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। অবশ্য, সৈয়দ আহমদ শহীদের (১৭৮৬–১৮৩১) জেহাদ আন্দোলনের সময়েও মুসলমানদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবোধ কিছুটা গড়ে উঠেছিল। কিন্তু তাতে রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্যবোধ ছিল নগণ্য ; বরং ধর্মীয় অনুভূতিই ছিল বেশী প্রবল। পরবর্তীকালে ইংরেজদের হিন্দু-প্রীতি এবং কংগ্রেসী নেতাদের অনুদার মনোভাবের ফলে স্যার সৈয়দ আহমদ বাধ্য হয়ে মুসলমানদের জন্য একটি স্বতন্ত্র পথ বেছে নেন। তিনি সর্বপ্রথম *'কওম'* শব্দটি মিল্লাতের *[Nation]* অর্থে ব্যবহার করেন। এরপর থেকে মুসলিম লেখকগণ 'কওম' বলতে মুসলিম জাতিকেই বুঝিয়েছেন। স্যার সৈয়দ আহমদের আলীগড় আন্দোলনের সাথে সাথে মুসলমানদের জাতীয় স্বাতন্ত্র্য ধীরে ধীরে জোরালো হয়ে উঠে। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর উপমহাদেশে কিছুদিন ধরে হিন্দু-মুসলিমের মিলনধর্মী রাজনীতি চলতে থাকে। এতে মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবোধ অনেকটা চাপা পড়ে যায়। এ সময় বিলাত থেকে সদ্য ফেরত ডক্টর ইকবাল স্বতন্ত্র জাতীয়তাবাদ প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর এই জাতীয়তাবাদ ছিল একাধারে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক। কারণ, তাঁর মতে ধর্ম ও রাজনীতি অভিন্ন। তিনি বলেন, ধর্মের জন্যই রাজনীতির আশ্রয় নিতে হয়। তাই ধর্মই পরিচালিত করবে রাজনীতিকে। অন্য শব্দে ধর্মের প্রকৃতি অনুসারেই হবে মুসলিম রাজনীতির প্রকৃতি। ধর্মই নিয়ন্ত্রণ করবে রাজনীতি ও রাষ্ট্রনীতি। তিনি কবিতায় বলেন ঃ

রাজনীতি থেকে ছুটে যায় যদি ধর্মনীতি,
থেকে যাবে শুধু চেঙ্গিজের নীতি।

স্যার সৈয়দ এবং ইকবাল স্বাতন্ত্র্যধর্মী রাজনীতির পক্ষপাতী হলেও তাঁদের জাতীয়তাবাদে কিছুটা তফাতও রয়েছে। স্যার সৈয়দ আহমদের জাতীয়তাবাদে ছিল রাজনীতির প্রাধান্য। কিন্তু ইকবালের জাতীয়তাবাদে ছিল ধর্মের অগ্রাধিকার। ইকবাল মুসলমানদের কাছে কেবল স্বতন্ত্র জাতীয়তাবাদই প্রচার করেননি, তিনি তাদের জন্য একটি সুস্পষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্যও স্থির করেন। তাদের স্বতন্ত্র তাহযীব-তমদ্দুনের কথাও বারবার উচ্চারণ করেন। তিনি তাঁর কাব্যে মুসলমানদের স্বতন্ত্র তাহযীব-তমদ্দুন নানাভাবে বর্ণনা করেন। মিঃ জিন্নাহ ইকবালের এপথ ধরেই এগিয়ে চলেন। তিনি পরিষ্কার ভাষায় বলেন ঃ *"আমরা একটি স্বতন্ত্র জাতি। তাই আমাদের তাহযীব-তমদ্দুনও স্বতন্ত্র।"*

ইকবাল-কাব্যে মুসলিম জাতীয়তাবাদ, কুরআনের আদর্শ ও ইসলামের অতীত গৌরব যত জোরালোভাবে চিত্রিত হয়েছে, তা উর্দূ-সাহিত্যে ইতিপূর্বে আর কখনও হয়নি। তেমনি গোলাম মোস্তফার সাহিত্যে যত ব্যাপকভাবে ইসলামী জাতীয়তাবাদ, ইসলামী তাহযীব-তমদ্দুন ও মুসলিম শৌর্য-বীর্যের ছবি অংকিত হয়েছে, তা বাংলা সাহিত্যে ইতিপূর্বে আর কখনো দেখা যায়নি। ইকবালের পরিবেশ ছিল উর্দূ এবং ফার্সীর পরিবেশ। তিনি যে পরিবেশে কাব্যচর্চা করেন, তাতে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ ছিল না। পক্ষান্তরে, গোলাম মোস্তফা

যখন কাব্যাসরে অবতীর্ণ হন, তখন বাংলা সাহিত্যের আকাশে দীপ্তিমান ছিল রবীন্দ্রনাথের উজ্জ্বল রবি। তিনি ছিলেন কবি সম্রাট। তাঁকে কেন্দ্র করে যে বাংলা সাহিত্য গড়ে উঠে, তা প্রধানতঃ হিন্দু ঐতিহ্যের প্রতীক। তাঁর সুবিস্তীর্ণ কাব্য জগতের গণ্ডি এড়িয়ে স্বতন্ত্রভাবে মুসলিম ঐতিহ্যধারী সাহিত্য রচনা করা সহজসাধ্য ছিল না। কিন্তু গোলাম মোস্তফার শিরায় শিরায় প্রবাহিত ছিল ইসলামী প্রেরণার উষ্ণ খুন। তিনি প্রেমের কবিতায় রবীন্দ্রনাথের কিছুটা অনুকরণ করলেও মুসলিম জাতীয়তাবাদ ও মুসলিম ঐতিহ্য বর্ণনায় তার মোটেই পরোয়া করেননি। তিনি রবীন্দ্র যুগে থেকেও ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে স্বতন্ত্র ধরনের সাহিত্য রচনায় ব্রতী হন। ইকবালকে কখনো এ ধরনের পরিবেশের সম্মুখীন হতে হয়নি। গোলাম মোস্তফা তাঁর সাহিত্যিক জীবনের প্রারম্ভ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ইসলামী আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য সুতীক্ষ্ম লেখনী পরিচালনা করেন। বিলাত গমনের পূর্বে ইকবাল অবশ্য দেশভিত্তিক জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু গোলাম মোস্তফা তাঁর কবি জীবনের প্রথম থেকেই তওহীদভিত্তিক জাতীয়তাবাদের মত পোষণ করতেন। ১৯১৩ সালে গোলাম মোস্তফা ছিলেন দশম শ্রেণীর ছাত্র। তখন *'আদ্রিয়ানোপল উদ্ধার'* শীর্ষক তাঁর যে কবিতাটি সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়, তাতেই তাঁর স্বাজাত্যবোধ এবং প্যান-ইসলামবাদ ফুটে উঠে। ১৯১৫ সালে রচিত তাঁর *'পরিচয়'* শীর্ষক কবিতাটিও এ মনোভাবের পরিচায়ক।

ইকবাল ও গোলাম মোস্তফা চোখ মেলে দেখলেন, মুসলিম জাতি নিগৃহীত ও ভাগ্য বিড়ম্বিত। তারা কেবল রাজ্যহারাই নয়, সর্বহারাও বটে। তারা যে স্বতন্ত্র ও সেরা জাতি, তারা যে ঐতিহ্য ও কৃষ্টিবাহী জাতি, এ সবই তারা ভুলে গেছে। গোলাম মোস্তফা ও ইকবাল আরো অবলোকন করলেন, মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য নেই, সংগঠন নেই, হারানো রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বহাল করার মত প্রতিজ্ঞাও নেই। তাদের আশা-আকাংখার আলো নিভু নিভু। এ সংকটময় মুহূর্তে কবিদ্বয় সারা বিশ্বের মুসলমানদের *'এক জাতি'* এবং এক কুরআনের অনুসারী বলে ঘোষণা করেন। তাদের মধ্যে বিশ্বজোড়া ঐক্য এবং নৈতিক সহানুভূতির উদ্রেক করার চেষ্টা করেন। কবিদ্বয় তওহীদভিত্তিক জাতীয়তাবাদ প্রচার করে মুসলিম জাতির মধ্যে ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্যের অনুভূতি সৃষ্টি করার প্রয়াস পান। মুসলিম জাতিকে বিশ্বজোড়া ভ্রাতৃত্ব ও ইসলামী জাতীয়তাবাদের ডোরে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য ইকবাল বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করলেন (১৯১০):

চীন ও আরব আমাদের,
হিন্দুস্তান আমাদের।
আমরা মুসলিম,
সারা জাহান আমাদের।
গচ্ছিত রয়েছে তওহীদের আমানত
আমাদের বুকে;
সহজ নয় আমাদের বিলোপ সাধন।

[তারানা-ই-মিল্লী : বাংগে দারা]

মহামানবতা ক্ষতবিক্ষত
স্বার্থপরতার কোপে।
হতে হবে তোমায় ভ্রাতৃত্বের প্রতীক,
ভালবাসার জীবন্ত ছবি।
হে অঞ্চল-পূজারী,
এরা হিন্দী আর ওরা খোরাসানী,
এরা আফগানী আর ওরা তুরানী—
বাদ দাও এসব, ছড়িয়ে পড়ো সারা বিশ্বে
সাগর তরঙ্গসম।

[ইসলামের উদয় ঃ বাংগে দারা, ১৯২২]

গোলাম মোস্তফার ভাষায় ঃ

জগতের মাঝে আমরা সবাই বিপুল একটি জাতি,
লুকায়ে রয়েছে আমাদের মাঝে অসীম বীর্যভাতি
আমরা জগতে মরিব না কভু, চিরকাল বেঁচে রব,
যুগ যুগে লভি নূতন শক্তি বিশ্ববিজয়ী হব।
এক তারে সবে বেঁধে দিব প্রাণ—এক সুরে গাব গান,
মহামানবতা গড়িয়া তুলিব—আমরা মুসলমান।

[পরিচয় ঃ ১৯১৫]

মুসলিম দেশগুলোর প্রতি ইকবাল ও গোলাম মোস্তফার মনে ছিল গভীর দরদ। তাঁরা এ সবের উন্নতিকে জাতীয় উন্নতি এবং অবনতিকে জাতীয় অবনতি বলে মনে করতেন। তাঁরা ছিলেন মনে-প্রাণে প্যান-ইসলাম বাদে বিশ্বাসী। মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠুক— এ ছিল তাঁদের আন্তরিক কামনা। ১৯১৯ সালে গ্রীকরা তুরস্ক রাজ্যভুক্ত স্মার্না দখল করে নেয়। ১৯২২ সালে তুর্কী বীর মোস্তফা কামাল পাশা (১৮৮১–১৯৩৮) তাদেরকে পরাজিত করে স্মার্না পুনরুদ্ধার করেন। তখন ইকবাল তুর্কীদের বিজয়ে উল্লসিত হয়ে 'তুলুয়ে ইসলাম' (*ইসলামের উদয়*) নামক এক দীর্ঘ কবিতা রচনা করেন এবং বলেন ঃ

আবার চলছে দীপ্ত দ্বীন ইসলাম
সংগঠনের পথে,
আবার হবে হাশেমী রসূলের ধর্ম
ফুলে ফলে সুশোভিত।
জয় করেছে এবার তুর্কী কামাল

ইকবাল ও গোলাম মোস্তফা

তাব্রীজ আর কাবুলের প্রাণ:

ছড়িয়ে পড়েছে তার বিজয়-খোশবু

বাতাসের দোলায়।

বীর কেশরী মোস্তফা কামাল পাশার এ বিজয়কে জাতীয় গৌরবরূপে অভিহিত করে গোলাম মোস্তফা বলেন ঃ

গাও সবে জয়গীতি—

ধন্য কামাল, খোদার জামাল, মূর্ত মহিমা, প্রীতি।

[আজি] শত্রু-দর্প করিয়া খর্ব

পূর্ণ করেছে জাতীয় গর্ব,

হে বীর কেশরী বিজয়ী কামাল,—অক্ষয় তব স্মৃতি।

ইকবাল এবং গোলাম মোস্তফা উপমহাদেশের মুসলমানদের স্বতন্ত্র মুসলিম জাতীয়তাবাদের দীক্ষা দিয়ে ক্ষান্ত হননি, তাঁরা জাতির জন্য একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠারও স্বপ্ন দেখেন। ১৯৩০ সালে *'মুসলিম লীগের'* এলাহাবাদ কনফারেন্সে ইকবাল পাকিস্তানের যে পরিকল্পনা পেশ করেন, তা বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য গোলাম মোস্তফা আপ্রাণ চেষ্টা করেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে গোলাম মোস্তফা পুরোপুরি আস্থাবান ছিলেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বেই তিনি *'পাকিস্তান'* শীর্ষক একটি গান রচনা করেন। পরিকল্পিত পাকিস্তানের গুণ-গরিমা বর্ণনা করে তিনি জনসাধারণকে পাকিস্তান আন্দোলনের প্রতি ঝাঁপিয়ে পড়তে উৎসাহিত করেন। যথাসম্ভব ইকবালের পাকিস্তান প্রস্তাবের প্রতি লক্ষ্য করেই তিনি বলেছিলেন (১৯৪৭) ঃ

শিল্পী যাহার আঁকলো ছবি—কবি যাহার গাইল গান

রূপ ধরে আজ আসলরে সেই ধ্যানের ছবি পাকিস্তান।

[পাকিস্তানের গান]

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বেই গোলাম মোস্তফা এর উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বলেন ঃ *"এটা হবে আদর্শভিত্তিক রাষ্ট্র, যা দুনিয়া থেকে মুছে দেবে অনাচার, অত্যাচার। পাকিস্তান নেতৃত্ব দেবে সারা জাহানের।"* এমনি করে তিনি মুসলিম আবাল-বৃদ্ধ-বণিতাকে কল্পিত পাকিস্তানের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেন।

আযাদী হাসিলের ভূমিকায় ইকবাল এবং গোলাম মোস্তফার দান অবিস্মরণীয়। এর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে তাঁরা বলেন, আযাদী মানুষের জন্মগত অধিকার। এ অধিকার হরণ করার অধিকার কারুর নেই। ইকবালের ভাষায়, 'পরাধীনতা মানুষের মনুষ্যত্ব এবং মুমিনের ঈমান নষ্ট করে। যে জালিম মানুষের স্বাধীনতা হরণ করে, তাকে ভোগ করতে হবে প্রকৃতির ভীষণ শাস্তি।' তিনি জনগণকে তাদের জন্মগত অধিকার অর্জনের প্রতি উৎসাহিত করে বলেনঃ

করো না স্বাধীন ব্যক্তিত্বের অবমাননা

পরাধীনতার শৃংখলে।

পরের প্রভুত্ব স্বীকারের মানে—
বড় কাফের তুমি ব্রাহ্মণের চেয়েও
[খিযরে রাহ্]
বিনাশ করে প্রভুত্ব
পরাধীনের মনুষ্যত্ব।
হে জালিম শাসক, সাবধান !
রয়েছে অপেক্ষায় তোমার তরে
প্রকৃতির ভীষণ শাস্তি।
[তুলুয়ে ইসলাম]

ইকবাল জীবনের প্রথম থেকেই ভারতের আযাদী কামনা করেন। তিনি বলেন ঃ " পাশ্চাত্য শক্তি ভারতের বাগান থেকে ফুল আহরণ করে নিচ্ছে। তারা লুটে নিচ্ছে এ দেশের ধন-সম্পদ। ভারতবাসী এখনো যদি আপন অবস্থা অনুধাবন করতে সক্ষম না হয়, তবে তাদের পতন অনিবার্য।" তিনি *'দুঃখের প্রতিমূর্তি'* নামক কবিতায় অনুতাপ করে বলেন (১৯০৪) ঃ

হে ভারত ! অশ্রুসিক্ত মোর নয়ন
তোমার দুরবস্থায় !
শিক্ষণীয় তোমার কাহিনী
পৃথিবীর ইতিহাসে।
রাখেনি বাগানে লুটেরার দল
ফুলের কোন চিহ্ন ;
চলছে কাড়াকাড়ি বাগান-প্রভুদের মাঝে
তোমার কিসমত নিয়ে।
হে ভারতবাসি, এখনো বুঝলে না তুমি !
রইবে না তোমার নাম-নিশান
জগতের ইতিহাসে।

আযাদী মানবের জন্মগত অধিকার—এ কথা গোলাম মোস্তফাও বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করেন। তিনি জালিম শাসকের প্রতি হুঁশিয়ারী বাণী উচ্চারণ করে বলেন ঃ এখন আর দুনিয়ায় জালিমের কোন স্থান নেই। মানুষ স্বাধীনতা অর্জন করেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবে ঃ

র'বে না ধরায় অধীন জীবন—আত্মচেতনা-বিস্মৃতির,
আপনার পায়ে দাঁড়াবে সবাই মুক্ত আকাশে তুলিয়া শির,
স্বাধীন বাতাস আকাশ আলোকে
অধিকার আছে মুক্তি-পুলকে,

ইকবাল ও গোলাম মোস্তফা

কঠিন নিগড়ে কে চায় বাঁধিতে, কোন্ সে জালিম, কোন্ কাফির ?

স্থান নাই আর বিশ্বে এবার দস্যু-দানব পিণ্ডারীর।

[স্বাধীন মিসর : ১৯২২]

মিসর ইংরেজদের প্রভুত্ব থেকে মুক্ত হলে গোলাম মোস্তফা আনন্দে উৎফুল্ল হন এবং *'স্বাধীন মিসর'* শীর্ষক একটি কবিতা রচনা করেন। তিনি স্বদেশ ভূমি ভারতকে গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ দেখে এ কবিতায় দুঃখ করে বলেন :

মুক্তি পিয়াসী ভারতবাসীর স্থান কোথা আজি এ খুশীর !

জাতীয় জাগরণে ইকবাল ও গোলাম মোস্তফার দান অসামান্য। তাঁরা মুসলমানদের উদাসীনতার নিদ্রা থেকে জাগ্রত করেন। আল্লাহ্ মুসলিম জাতিকে পৃথিবীর সেরা জাতিরূপে সৃষ্টি করে তাদের হাতেই সাম্য, মৈত্রী ও শান্তি স্থাপনের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন—এ বিষয়টিকে তাঁরা আপন কাব্যে নানা ভাব-ভঙ্গি তে প্রকাশ করেন। তাঁরা মুসলমানদের ইসলামী আদর্শের রূপায়ণে উৎসাহিত করে বলেন—ইসলাম একমাত্র আল্লাহ্‌র ধর্ম। খিলাফত প্রতিষ্ঠার কাজে আল্লাহ্ই তাদের সাহায্য করবেন। সমরক্ষেত্রে তাদের বিজয় সুনিশ্চিত। একজন মুসলিমের জীবনের উদ্দেশ্য কি হওয়া উচিত, তা ব্যাখ্যা করে ইকবাল তাঁর *'মুসলিম'* নামক কবিতায় বলেন :

বন্ধুগণ—

আমি মুসলিম, আমি তওহীদবাদী,
আমি এ সত্যের চির সাক্ষী।
জগত সৃজিলেন আল্লাহ
এ সত্য প্রতিষ্ঠার তরে।
সঁপিলেন আমায়
তওহীদের দায়িত্বভার।
আমার অস্তিত্ব নাঙ্গা জাহানের সাজ;
আমার বিনাশ মানে
মানব জাতির গঞ্জনা।
কম্পিত করে না আমায়
সামরিক উদ্বেগ আর কালের ভ্রুকুটি।
নিশ্চিন্ত রয়েছি স্বজাতির ভাগ্য উন্নয়নে।
হতাশা কী—জানে না আমার স্বভাব,
দিচ্ছে সবায় মোরে সমর-প্রেরণা,
পূর্ণ বিজয়ের পয়গাম।

[মুসলিম : বাংগে দারা ১৯১২]

অনুরূপভাবে গোলাম মোস্তফাও *'মুসলিম'* শীর্ষক একটি কবিতা রচনা করেন (১৯২৪)। তাঁদের ভাবধারায় কতটুকু মিল রয়েছে, তা এ কবিতা দু'টি পাঠ করলেই অনুধাবন করা যায়। এবার গোলাম মোস্তফার *'মুসলিম'*-এর কণ্ঠে তার কর্তব্য, লক্ষ্য এবং দৃঢ় মনোবলের অভিব্যক্তি শুনুন ঃ

মুসলিম মোরা–সত্যসাধক–মিথ্যারে ভয় করি না কভু,
একধারে সারা দুনিয়া দাঁড়াক–একা দাঁড়াইয়া যুঝিব তবু।
হয় না–হ'বে না–কখনো হয়নি–মারিতে মোদের পারেনি কেহ,
চিরকাল তরে বিশ্বে আমরা বসত করিব বাঁধিয়া গেহ।
মুক্তি-সৈন্য আমরা খোদার–খোদা আমাদের রয়েছে সাথে,
চির দুর্জয় বিশ্বে আমরা, মরণ নাহিক কাহারো হাতে।
ধর্ম মোদের ইসলাম–সে যে আল্লাহ্‌র খোদ হাতের গড়া,
ইসলাম সাথে লড়িতে আসা–সে আল্লারি সাথে লড়াই করা।
ন'স্ ন'স্ তুই ছোট ন'স্ তুই–হীন ন'স্–তোর বিরাট খ্যাতি,
মুসলিম তুই–বিশ্বাস কর্–জগতের মাঝে শ্রেষ্ঠ জাতি।
[মুসলিম ঃ বুলবুলিস্তান]

মুসলিম ঐতিহ্য বর্ণনায় ইকবাল ও গোলাম মোস্তফার ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁরা জাতির অতীত গৌরব, শৌর্য-বীর্য এবং ধ্যান-ধারণাকে কোথাও কথিকাকারে, কোথাও গল্পের মাধ্যমে, আবার কোথাও কল্পনার আল্পনায় চিত্রিত করেন এবং জাতিকে ঐতিহ্য-গর্বিত করে তোলার চেষ্টা করে তাদের মনে হারানো মর্যাদা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার প্রেরণা দান করেন। কবিদ্বয় পৃথিবীর বিভিন্ন মুসলিম কৃষ্টিকেন্দ্রের অতীত কীর্তিমালাকে বিদগ্ধ কবি-মানসের রঙে রাঙিয়ে জগদ্বাসীর নয়নপটে পরিস্ফুট করার প্রয়াস পান। দিল্লী, কনস্টান্টিনোপল, বাগদাদ, স্পেন, কর্ডোভা, গ্রানাডা–কোনটাই তাঁদের কাব্য থেকে বাদ পড়েনি। কেবল কৃষ্টি-কেন্দ্রই নয়, যেসব মহাপুরুষের উদ্যম-উদ্দীপনায়, ত্যাগ ও তিতিক্ষায় ইসলামী ইতিহাসের স্বর্ণময় অধ্যায়গুলো রচিত হয়েছে, কবিদ্বয় জগদ্বাসীর সামনে তাঁদেরও আকর্ষণীয় ভাষায় পরিচয়দান করেন। তাঁদের জীবনাদর্শকে গভীর ভক্তি সহকারে পাঠকদের কাছে উপস্থাপিত করেন। কবি ইকবাল তাঁর *'বিলাদে ইসলামিয়া'* (বাংগে দারা)' 'তারানায়ে মিল্লী', 'মসজিদে কুরতোবা', 'তারেক কী দোয়া', 'নাদির শাহ' (বালে জিব্রীল) শীর্ষক কাব্যে ইসলামের অতীত শান-শওকত যে ব্যথা-ব্যদনার সাথে বিধৃত করেছেন, তা পাঠকের মনে রেখাপাত না করে পারে না। মাওলানা হালী এবং মাওলানা শিবলী অবশ্য উর্দূ সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্য বর্ণনায় প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেন, কিন্তু ইকবাল তাঁর অসাধারণ প্রতিভা, দুর্নিবার ইসলামী জোশ এবং হৃদয়স্পর্শী ভাষায় যেভাবে ইসলামের অতীতকে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন, তা ইতিপূর্বে আর কখনো দেখা যায়নি।

বাংলা সাহিত্যেও অনুরূপভাবে মীর মোশাররফ হোসেন, মোজাম্মেল হক, ইসমাইল হোসেন সিরাজী এবং কায়কোবাদের ন্যায় অনেক কবিই মুসলিম গৌরবের চিত্র অংকিত করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু গোলাম মোস্তফার ন্যায় আর কোনো কবি ইসলামের ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও শিক্ষাকে এত ব্যাপকভাবে রূপদান করতে সক্ষম হয়েছেন বলে মনে হয় না। তাঁর 'পরিচয়', 'বিজয় উল্লাস','স্বাধীন মিসর', 'হিন্দু মুসলমান', 'মুসলিম', 'ভবিষ্যতের স্বপ্ন' শীর্ষক কবিতাগুলো পাঠ করলে ইসলামী শান-শওকতের জ্বলন্ত ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠে। 'অগ্নি পরীক্ষা', 'রাখাল বালক', 'মরণ বরণ', 'প্রতিফল'—এসব কবিতাকে ইসলামী আদর্শের প্রতিচ্ছবি বৈ আর কি বলা যেতে পারে ?

বাগদাদের পুণ্য কাহিনী বর্ণনা করে ইকবাল বলেন ঃ

মুসলিম গৌরবের লীলাভূমি—
দিল্লী নগরী;
তারি জুড়ি বাগদাদ—
মুসলিম ঐতিহ্যপুরী।
নয় কি এ ভূমি 'এরাম বাগের' সমতুল ?
হেথা পড়েছে বহু নায়েব-রসূলের কদম।
শোভিত করেছে এ বাগের কলি
দুনিয়ার সমগ্র কানন।
হেথা রয়েছে ওঁদের মাজার,
কাঁপতো যাঁদের ভয়ে
রোমের অধিপতি।

[বিলাদে ইসলামিয়া ঃ বাংগে দারা]

এবার বাগদাদের কীর্তিগাথা শুনুন গোলাম মোস্তফার কণ্ঠে ঃ

পুণ্য শ্লোক হারুনের সেই স্বপ্নপুরী
বাগদাদের কথা ? শুন তবে, —এই দেশ
সভ্যতায়, জ্ঞান-গর্বে, শিল্প গরিমায়
ছিল অনুপম বিশ্বে। এ মহানগরী
মোসলেমের গর্বভূমি ! সম্রাট 'মামুন'
ছিল যবে অধিষ্ঠিত এই সিংহাসনে
কী গৌরব বাগদাদের আছিল তখন !
'রসায়ন', 'বীজ' আর 'জ্যোতিষ', 'দর্শন'
উন্নতির পরাকাষ্ঠা লভিল হেথায়।

ইকবাল ও গোলাম মোস্তফা ছিলেন জীবনের কবি, যৌবনের কবি, শক্তির কবি। ইসলাম

কর্মের ধর্ম, শক্তির ধর্ম। এ ধর্মে মানবের সারাটি জীবনই কর্মক্ষেত্র, সমরক্ষেত্র। এ ধর্ম মানুষকে শেখায় কর্মতৎপরতা এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা। এ ধর্ম আরো শিক্ষা দেয় মানসিক ও দৈহিক শক্তির। কুরআন ইরশাদ করছে ঃ

"মহৎ কার্য সম্পাদনকে আল্লাহ অবশ্যই ভালবাসেন।"

এটা জানা কথা যে, মহৎ কার্য সম্পাদন করতে হলে বরণ করতে হয় দুঃখ-কষ্ট, ঝুঁকি নিতে হয় আঘাত-সংঘাতের। কুরআনে রয়েছেঃ *"মুশকিলের সাথেই রয়েছে আসান।"* জীবনযুদ্ধে কষ্ট ও বিপদকে জয় করতে হলে যেমন দরকার মনোবলের, তেমনি দরকার দৈহিক ও বৈষয়িক শক্তির। আল্লাহ বলেছেন ঃ *"তোমরা যথাসাধ্য শক্তি অর্জন কর।"* রসূলে করীম (সঃ) বলেছেন ঃ *"সবল মুমিন দুর্বল মুমিনের চাইতে অধিকতর শ্রেয়।"*

ইকবাল ও গোলাম মোস্তফা ছিলেন কুরআনের আদর্শে উদ্বুদ্ধ। তাঁরা জীবনসংগ্রামে দৃঢ়তার সাথে বাধা-বিপত্তির মুকাবিলা করার শিক্ষা দেন। তাঁদের মতে, আপদ-বিপদে ঝুঁকি গ্রহণ করার নামই জীবন, আর এ জীবনী-শক্তির নামই যৌবন।

ইকবাল ঃ *"আগার খাহী হায়াত আন্দার খাতার জী"*—বেঁচে থাক সংকটের মাঝে যদি চাও জীবন। *"পুখ্তাতর হ্যায়-গারদিশে পায়হাম-সে-জামে যিন্দেগী"* উপর্যুপরি বিপদেই অধিকতর দৃঢ় হয় জীবনের পেয়ালী।

গোলাম মোস্তফা ঃ

আঘাতে আঘাতে জীবন মোদের গর্জিয়া ওঠে নূতন করি।

ইসলামের মর্মানুসারে ইকবাল এবং গোলাম মোস্তফা দুর্বলতাকে পছন্দ করেননি। তাঁরা এটাকে মনে করেন জীবনের ব্যাধি। কারণ তা ডেকে আনে ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনের মৃত্যু। এই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরা জাতিকে শক্তি, সামর্থ্য এবং শৌর্য-বীর্যের শিক্ষা দেনঃ

ইকবাল ঃ

হ্যায় জুর্‌মে যায়ীফী কী সাযা মরগে-মুফাজাত—
দুর্বলতার শাস্তি—আকস্মিক মৃত্যু।
আছা-না হো-তো-কালীমী হ্যায়-কারে-বে-বুনইয়াদ—
নুবুয়ত ভিত্তিহীন, যদি না হয় মুসার (আঃ) যষ্টি।

গোলাম মোস্তফা ঃ

দৃপ্তগর্বে জেগে ওঠ, তবে বাধা-বন্ধন দু'পায়ে দলি'
আঘাত সহিয়া বাঁধন কাটিয়া চলারেই মোরা জীবন বলি।

ইকবাল ও গোলাম মোস্তফা ছিলেন তদবীরে বিশ্বাসী। তাঁরা মনে করেন, মানুষ স্বয়ং আপন ভাগ্যের নিয়ন্ত্রক। মানুষ যেভাবে তদবীর এবং কাজ করে, ঠিক সেভাবেই রচিত হয় তার তক্‌দীর। মানুষ আপন কর্মবলে আত্মাকে বলিষ্ঠ করতে সক্ষম হলে আল্লাহ্ তার ইচ্ছামাফিকই তক্‌দীর নির্ধারণ করে দেন।

ইকবাল ও গোলাম মোস্তফা

ইকবাল ঃ

উঁচু কর ব্যক্তিত্ব, জিজ্ঞাসিবেন
আল্লাহ তকদীর লেখার আগে—
বল—কি তোমার সাধ ?

গোলাম মোস্তফা স্বজাতির দুঃখ-দৈন্য দেখে মর্মাহত হন। মুসলিম জাতি তদবীর বলে আপন তক্‌দীর লিখতে জানে না বলে তিনি দুঃখের হাসি হেসে বলেন ঃ

শত নিপীড়ন দৈন্য সহিয়া,
মুসলিম চলে জীবন বহিয়া !
ললাট-লিখন জানে না ইহারা,
দেখে হেসে খাই লুটোপুটি !
কাল হবে যারা বাদ্‌শা—তারাই
ভিক্ মাঙে আজি মুঠি মুঠি।

[ভবিষ্যতের স্বপ্ন ঃ বুলবুলিস্তান]

ইকবাল ও গোলাম মোস্তফা মনে-প্রাণে মুসলিম জাতির জাগরণ এবং তার সর্বাঙ্গীন প্রতিষ্ঠা কামনা করেন। জাতির দরদে তাঁদের মন ছিল কানায় কানায় ভরা। জাতির আশানুরূপ উন্নতি না দেখে তাঁরা ব্যাকুল হয়ে তাঁদের অতীত গৌরবকে আল্লাহ্‌র সামনে তুলে ধরে আবদার করে বলেন ঃ হে আল্লাহ্‌, তোমার অস্তিত্ব এবং খেলাফত রক্ষার জন্য এত কিছু করা সত্ত্বেও মুসলিম জাতির এহেন দুর্গতি !

ইকবাল ঃ

দূর করেছি মোরা ধরাপৃষ্ঠের
অন্যায় অবিচার;
মুক্ত করেছি মানব জাতিকে
পরাধীনতার কবল থেকে।
আবাদ করেছি তোমার কাবা ঘর
সেজদার মিনতি দিয়ে।
ধারণ করেছি বক্ষে
তোমার পবিত্র কুরআন,
তবুও তোমার অভিযোগ—
'আমরা নই কৃতজ্ঞ'।
তাই যদি হয়, তবে
তুমিও নও মহানুভব !

[শিকওয়া ঃ বাংগে দারা]

গোলাম মোস্তফার ভাষায় ঃ

বলিব আমরা—"এয় খোদা, মোরা কাফের নহিত—মুসলমান
সারা দুনিয়ায় যুগে যুগে তোমার মহিমা করেছি গান।
তোমারে বলত চিনিত কে ?
চিনায়েছি মোরা লোকে লোকে !
মোরা দলে দলে সৈন্য সাজিয়া উড়ায়েছি তব জয়-নিশান !
এত সেবা আর এত প্রাণপাত—সকলি কি আজ বৃথা হবে ?
প্রতিদান কিছু পাব না আমরা ? বঞ্চিত হয়ে রব সবে ?

[শবে-বরাত]

ইকবাল ও গোলাম মোস্তফা আল্লাহ্‌র দরবারে কেবল অভিযোগ এবং আবদার করেই ক্ষান্ত হননি, তাঁরা বিধাতার দরগায় আত্মসমর্পণ করে জাতির মুক্তি ও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য মিনতি সহকারে দোয়াও করেন।

ইকবাল ঃ

হে খোদা—
জাগাও মুসলিমের মনে
প্রাণময় আশা;
উষ্ণ হোক তাদের পরাণ,
দীপ্ত হোক তাদের জান।
জাগাও তাদের মনে
বিপদের অনুভূতি।
শেখাও তাদের ভাবী দিনের ভাবনা
আজিকার বিপর্যয়ে।

[দোয়াঃ বাংগে দারা]

গোলাম মোস্তফা ঃ

শবে-বরাতের রাত্রিতে আজি চাহি নাকো শুধু ধন ও মান,
সবার ভাগ্যে দিও খুশী—জাতিরে দিওগো মুক্তিদান !
জাগরণ লিখো নসিবে তার,
দিও সাধ প্রাণ বড় হ'বার,
নব গৌরবে বিশ্বে আবার দাঁড়ায় যেন এ মুসলমান !

[শবে-বরাত ঃ বুলবুলিস্তান]

ইকবাল ও গোলাম মোস্তফা

ইকবাল ও গোলাম মোস্তফা ছিলেন আশাবাদী কবি। তাঁরা মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন, মুসলিম জাতির এ দুর্গতি আর বেশী দিন স্থায়ী হবে না। অচিরেই তারা আপন অতীত গৌরব ফিরে পাবে। আবার তারা নেতৃত্ব দেবে পৃথিবীকে। তাদেরই সৌজন্যে প্রতিষ্ঠিত হবে পৃথিবীর শান্তি।

ইকবাল ঃ

ফুটে উঠ্‌ছে মুসলিমের আঁখি জলে
বৈশাখের বারি চিহ্ন।
সৃষ্টি হবে আবার রত্নরাজি
খলীলুল্লার দুনিয়ায়।
ফিরে আসছে আবার ঐক্য চেতনা
ইসলামের রোশন মিল্লাতে।
সুশোভিত হবে আবার ফুলে ফলে
হাশেমী রসূলের ধর্ম।

[তুলুয়ে ইসলাম ঃ বাংগে দারা]

গোলাম মোস্তফা ঃ

মারহাবা ! একি ! মরি ! মরি !
সারা দুনিয়ায় জেগেছে আবার
ইসলাম—নব বেশ ধরি !
উড়িছে নিশান অর্ধচন্দ্র
নকীব হাঁকিছে জলদ-মন্ত্র
জাগো মুসলিম, মুক্তি জিহাদে
এস এস সবে ত্বরা করি'
ধরায় মুক্তি আনিব আমরা।
বাধা বিঘ্ন অপসরি।

ইকবাল ও গোলাম মোস্তফা ভাল করেই জানতেন, কেবল বুলি আওড়ালেই মুক্তি আসে না। যোগ্যতা অর্জন না করে নেতৃত্ব দেয়া কখনো সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন সত্যপরায়ণতা, বীরত্ব এবং ইনসাফের। তাঁরা মুসলিম জাতিকে এসব গুণের অধিকারী হবার জন্য তাগিদ করেন। পৃথিবীর নেতৃত্বভার গ্রহণের জন্য তাদের প্রতি আহবান জানান।

ইকবাল মুসলমানদের প্রতি লক্ষ্য করে বলেন ঃ

আবার পড় তুমি সততা, বীরত্ব,
আর ইনসাফের সবক।
তোমাকেই নিতে হবে আবার

আল্লামা ইকবাল
দুনিয়ার নেতৃত্বভার।

গোলাম মোস্তফা ঃ

সত্যের তরে কার প্রাণে
জাগিয়াছে আজি-দুঃখ বোধ !
সত্য পথের কই পথিক—
মিথ্যার সাথে করে বিরোধ ?
অবহেলা করি শয়তানে
কে যাবি মরিতে ময়দানে ?
এস এস আজি সেই তরুণ,
কর এ ব্যর্থ রক্ত-রোধ।

[কোরবানী]

ইকবাল ও গোলাম মোস্তফা ইসলামী আদর্শবাদী কবি হলেও তাঁরা কেবল মুসলিম জাতিরই কবি নন। তাঁদের শিক্ষা-দীক্ষা সকল দেশের জন্য, সকল জাতির জন্য। তাঁরা মুসলিম ঘরে জন্ম নিয়েছেন বলেই ইসলামী আদর্শে উদ্বুদ্ধ হননি। তাঁরা বিভিন্ন ধর্ম নিয়ে গভীর চিন্তা-ভাবনা করে অনুধাবন করলেন যে, ইসলামই একমাত্র ধর্ম, যা মানব সমস্যার সমাধান দিতে পারে। তাঁরা ইসলামকে নিছক বিশ্বাসের বস্তু বলে মনে করেননি। তাঁদের মতে, ইসলাম পৃথিবীর সকল মানুষের জন্য একটা পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। এ আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েই তাঁরা ইসলামী আদর্শ প্রচারে ব্রতী হন। এটা পরিষ্কার কথা যে, ইকবাল এবং গোলাম মোস্তফা মুসলিম জাতিকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্য অর্জনের শিক্ষা দিয়েছেন। তাই বলে কি তাঁরা জাতিকে অমুসলিমদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছেদ করতে বলেছেন বা তাদেরকে অবজ্ঞার চোখে দেখার নির্দেশ দিয়েছেন ? তা কখনো নয়। তাঁরা জানতেন, ইসলামের বিধানমতে, মুসলিম জাতি অমুসলিম জাতির প্রতি এমন উদারতা প্রদর্শন করতে পারে, যা তারা অমুসলিম জাতির কাছে আশাই করতে পারে না। মুসলিম জাতি দুনিয়ার সকল মানুষকে আদম-জাত ভাই মনে করে এবং তাদের মঙ্গল কামনা করে। পৃথিবীর সকল মানুষকে আপন করে নেয়ার মাঝেই রয়েছে মুসলিম জাতির স্বাতন্ত্র্য। ইকবাল মুসলিম জাতির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন ঃ

সকল জাতি থেকে আলাদা মুসলিম জাতি,
সকল জাতির বন্ধুও আবার এ জাতি।

তিনি আরো বলেন ঃ

কায়েম হোক বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব,
ছড়িয়ে পড়ুক ভালবাসা—
এ হলো ইসলামের মর্মবাণী,
এ হলো প্রকৃতির আহ্বান।

গোলাম মোস্তফার ভাষায়ঃ

আজিও যাহারা আসিছে লড়িতে সেই দীন ইসলামের সাথে
শত্রু নহেক'—বন্ধু তাহারা, হাত মিলাইব তাদের হাতে !
'আল-কিমিয়ার' আবিষ্কারক মুসলিম মোরা জানি যে জাদু,
শত্রুরে করি বন্ধু আমরা—বেদনারে করি মধুর স্বাদু।

কেবল কাব্যেই নয়, গদ্য রচনা এবং বক্তৃতার মাধ্যমেও ইকবাল এবং গোলাম মোস্তফা ইসলামী আদর্শ ব্যাপকভাবে প্রচার করেন। অনুবাদ-সাহিত্য সৃষ্টি করেও গোলাম মোস্তফা জাতীয় সাহিত্যের পরিসর বৃদ্ধি করেন। তিনি উর্দূ সাহিত্যের প্রথম জাতীয় কাব্য—*'মুসাদ্দাস-ই-হালী'র* মূল অংশের বঙ্গানুবাদ করেন; ইকবালের গুরুত্বপূর্ণ কবিতাসমূহকে বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত করেন। সেগুলো *'কালামে ইকবাল'* নামে প্রকাশিত হয়। তিনি কুরআন মজীদের আংশিক বাংলা তরজমা করেন। এছাড়া 'বিশ্বনবী', 'মরু দুলাল', 'ইসলাম ও জিহাদ', 'ইসলাম ও কমিউনিজম', 'বনি আদম', 'হযরত আবু বকর' প্রভৃতি পুস্তকে ইসলামী বিষয়াদির উপর পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেন। ইসলামী গযল রচনা করেও তিনি জনগণের অন্তরে ইসলামী জোশ সৃষ্টি করার প্রয়াস পান।

ইকবাল ও গোলাম মোস্তফার নিকট এটা সুবিদিত ছিল যে, ইসলামের বিধি অনুসারে রাজনীতি ও ধর্মনীতি পরস্পর সম্পৃক্ত। ধর্ম ছাড়া রাজনীতি স্বৈরাচারে পরিণত হয়, আবার শাসন ক্ষমতা ছাড়াও ধর্মীয় বিধি-বিধান নিষ্ক্রিয় হয়ে দাঁড়ায়। তাঁরা দেখলেন, কুরআন মুসলিম জাতিকে রাজনীতি এবং রাষ্ট্রনীতি শিক্ষা দেয়। তাই তাঁরা ধর্মের নিরাপত্তা ও সংহতি বিধানের জন্য মুসলিম জাতিকে জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেন। বস্তুত দ্বি-জাতিতত্ত্বের উপর ভিত্তি করেই পাকিস্তান অর্জিত হয় এবং পাকিস্তান থেকেই আমরা আযাদ বাংলাদেশ লাভ করি। আবার এটাও সত্য যে, দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তি রচিত হয় ধর্মীয় চেতনার উপর। এ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে খুব সহজেই অনুমিত হয় যে, ইকবাল ও গোলাম মোস্তফার জাতীয় সাহিত্য ও তাঁদের ধর্মীয় আদর্শের প্রচার পাকিস্তান ও বাংলাদেশ অর্জনের পথে কতখানি সহায়ক ছিল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রতি গোলাম মোস্তফার অবদান সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বাংলাদেশের জনপ্রিয় কবি জসীম উদ্দীন মরহুম লিখেছেনঃ

"পাকিস্তান আন্দোলনের প্রতীক কবি হিসাবে যদি কাহারও নাম উল্লেখ করিতে হয়, তবে বাঙ্গালী মুসলমান সাহিত্যিকদের সকলের নামের আগে গোলাম মোস্তফার নাম উল্লেখ করিতে হয়। তাঁহার নিজের অজান্তে তিনি তাঁহার কাব্যসাধনায় এই পাকিস্তান অর্জনের সাধনাই করিয়াছেন। এই প্রশংসা নজরুলের প্রাপ্য নয়। যদিও অতিভক্তির সঙ্গে কেহ কেহ নজরুলের প্রতি এই প্রশংসা আরোপ করিয়া থাকেন, কিন্তু নজরুলের কাব্যাদর্শ যদি বাঙ্গালী মুসলমানেরা গ্রহণ করিত, তবে ভারত স্বাধীন হইত, কিন্তু মুসলমানরা পাকিস্তান অর্জন করিতে পারিত না।"

আমরা কবি গোলাম মোস্তফার জীবদ্দশায় হয়তো তাঁর সাহিত্যের সত্যিকার মূল্যায়ন করতে পারিনি। আমরা যদি অজান্তে এ ব্যাপারে কোন নৈতিক অবহেলা করে থাকি, তবে এখন আমাদেরকে এর তদারক করা উচিত। তাঁকে অন্যতম জাতীয় কবিরূপে আখ্যায়িত করা উচিত। কবি নিজেও সুধীমহলে আশানুরূপ কদর না পেয়ে বলেছিলেন ঃ

আমার যাবার পরে হয়ত তখন
করিবে সবাই আসি অশ্রু বরষণ
বসাইবে শোক সভা, বিরচিবে গান
উচ্ছ্বসিত প্রশংসার বাণী দিবে দান
কি ফল ফলিবে তাহে ? সেই
শোক গাথা,
সে ক্রন্দন, সে উচ্ছ্বাস, সে বিরহ
ব্যথা
মোর কাছে পৌঁছিবে না।

ইকবাল ও গোলাম মোস্তফার ভাবধারায় যথেষ্ট মিল থাকলেও তাঁদের মধ্যে যে গরমিলটুকু রয়েছে, তাও লক্ষ্য করার মতো। ইকবাল ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত কবি, দার্শনিক, আইনবিদ ও বিচক্ষণ রাজনীতিক। গোলাম মোস্তফা ছিলেন একাধারে কবি, প্রবন্ধকার, জীবনীকার, অনুবাদক, গীতিকার ও সুরকার। তাঁর নিকট আমরা ইকবালের কাব্য প্রতিভা অথবা দার্শনিক চিন্তাধারা আশা করতে পারি না। পক্ষান্তরে, ইকবালের রচনায়ও আমরা গোলাম মোস্তফার বহুমুখী সাহিত্যিক অবদান দেখতে পাই না। কিন্তু মানসিকতার দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে তাঁদের মধ্যে তেমন কোন বিশেষ পার্থক্যই পরিলক্ষিত হয় না। তাঁদের উভয়ের অন্তর ছিল ইসলামী জোশে ভরা। তাঁরা অতীতের দিকে ফিরে যেতে চাননি; বরং অতীত মুসলমানদের অনাড়ম্বর জীবনপদ্ধতি, সরলতা এবং আল্লাহ প্রেমকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন।

ইকবাল তাঁর জীবনের প্রধান অংশ অতিবাহিত করেন একজন আইনজীবী ও রাজনীতিকরূপে। গোলাম মোস্তফা তাঁর বেশীর ভাগ কর্মজীবন ব্যয় করেন একজন সরকারী স্কুল শিক্ষকরূপে। তাই রাজনীতি ছিল তাঁর আওতার বাইরে। তবুও তাঁর অন্তর ছিল আযাদীর প্রেরণায় পরিপূর্ণ। সরকারী কর্মচারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি লেখার মাধ্যমে আযাদী আন্দোলনে ইন্ধন যুগিয়েছেন প্রচুর। অবশ্য, এঁদের কারুর লেখায় মাওলানা যফর আলী খাঁ, ব্রজ নারায়ণ চকবসত, জোশ মালীহাবীদী, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, নজরুল ইসলাম প্রমুখের ন্যায় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সরাসরি বিদ্রোহ দেখা যায় না।

ইকবাল পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখেছেন, কিন্তু এর বাস্তবরূপ স্বচক্ষে দেখার সুযোগ তাঁর ভাগ্যে জোটেনি। এ দিক থেকে গোলাম মোস্তফাকে বিশেষ ভাগ্যবান বলতে হয়। তিনি আপন স্বপ্নসাধ মেটাতে সক্ষম হন। বাংলা ভাষাভাষী কবিদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম পাকিস্তানবাদকে জনপ্রিয় করে তোলার চেষ্টা করেন। হিন্দুদের সাংস্কৃতিক ও সাম্প্রদায়িক

অভিযানের ফলে মুসলিম বাংলায় যে নিরাশা ও হতাশার অন্ধকার নেমে এসেছিল, তা দূর করার জন্য তিনি জাতীয় সাহিত্যের আলোকবর্তিকা নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন। কবিকুঞ্জে তাঁকেই সর্বপ্রথম পাকিস্তান ও পাকিস্তানী পতাকার গান গাইতে দেখা যায়। এক যুগেরও বেশীকাল ধরে তিনি স্বহস্তে পাকিস্তানের সেবা করেন। পাকিস্তানী তরুণদের ইসলামী আদর্শে অনুপ্রাণিত করার জন্য বহু কবিতা রচনা করেন। বহু প্রবন্ধ লিখে তিনি সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে উদ্‌ভূত নব নব সমস্যাবলীর সমাধান করার প্রয়াস পান।

ইকবাল ও গোলাম মোস্তফা উভয়ই জাতীয় জাগরণের কবি, মানসিক বিপ্লবের কবি। তাঁরা অবসাদগ্রস্ত জাতির মনে আত্মবিশ্বাস ও স্বাতন্ত্র্যবোধ জাগিয়েছেন, স্বাধীনতা অর্জনের পথে জাতিকে বিপুল সহায়তা করেছেন। জাতি উভয়ের কাছে ঋণী। জাতীয় জাগরণ ও আযাদী আন্দোলনের ইতিহাসে তাঁদের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

[সৌজন্যে ঃ মুসলিম জাগরণে কয়েকজন কবি-সাহিত্যিক]

ইকবাল-কাব্যের শিল্পরূপ

মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজ উল্লাহ্‌

কোনো কবি বা শিল্পীকে যখন তাঁর ব্যক্তি-প্রতিভার স্বরূপ এবং ভাবনাগতির কেন্দ্রবিন্দু অনুসারে কোন একটি বিশেষ পরিচয়ে চিহ্নিত করা হয় তখন স্বভাবতঃই তাঁর সামগ্রিক সৃজনকর্মের বৈচিত্র্যের প্রতি অবিচারের আশঙ্কা অনিবার্য হয়ে উঠে। কারণ, কবি বা শিল্পী তাঁর মানসগঠনের ধারা এবং জীবনদর্শন ও জীবনবোধের স্বাতন্ত্র্য অনুযায়ী কোনো একটি বিশেষ প্রবণতা বা চিন্তাধারার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন সত্য এবং কোনো কোনো কবি-শিল্পীর সমগ্র সৃজনলীলাই এই বিশেষ প্রবণতা এবং চিন্তাধারাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত ও উচ্ছলিত হয়, কোনো মহৎ কবি-শিল্পীই সৃজনকর্মে বৈচিত্র্যহীনতার চার দেয়ালে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেন না।

শিল্পী-সাধনায় বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য স্থাপন এবং অভ্যন্তরীণ সৃজনলীলায় আত্মার বহুমুখী বিচ্ছুরণই তাঁর লক্ষ্য। আত্মার মাধুর্য এবং চিন্তার বর্ণাভায় নিজের রচনাকে সমুজ্জ্বল ও বৈচিত্র্যময় করে তোলাই তাঁর শিল্প-সাধনার লক্ষ্য। এ উদ্দেশ্য সাধনের অভিপ্রায়ে তিনি সৃজনকর্মে বিভিন্ন আঙ্গিকের অনুসরণ করেন, ভাবের বিস্তৃতি ঘটান এবং শব্দ ও ছন্দ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্রতী হন। বিচিত্রমুখী চিন্তাধারা যেমন তাকে তার ভাবনাগতির কেন্দ্রমূলে নিয়ে যায়, তেমনি বিভিন্ন রূপ-রং ও সুর এক সুষমাময় ঐক্যে, আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা ও সংহতিতে সমগ্র রচনাকে দৃঢ়নিবদ্ধ করে তোলে।

কিন্তু এর জন্যে একটি বিশেষ মানসপ্রবণতা ও ভাবনা-চিন্তার সাথে সুদৃঢ় প্রত্যয় ও সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিশক্তি চাই। এই দৃষ্টিশক্তির কল্যাণেই একটি বিশেষ বাণীর বাহক এবং সুদৃঢ় প্রত্যয়ের উচ্চকণ্ঠ ঘোষক হওয়া সত্ত্বেও কবি-শিল্পীর পক্ষে সামগ্রিক দৃষ্টি সম্ভব হয়, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের দ্যোতনা সৃষ্টি স্বাভাবিক হয়ে উঠে। কারণ, খণ্ডিত ব্যাখ্যা নয়, জীবনের সমগ্র ছবি চোখের সামনে ফুটিয়ে তোলা এবং তার মধ্যে সম্পূর্ণ বোধ সঞ্চারিত করাই মহৎ কবি বা শিল্পীর লক্ষ্য; এবং এ কারণেই মহৎ কবি-শিল্পী খণ্ডত্বের বিপর্যয়ের ব্যাখ্যায় শুধু ভাঙ্গনের ছবি আঁকেন না, তিনি গঠনের ক্ষেত্রে গভীর জীবনবোধ এবং শিল্প দৃষ্টিকেও কাজে লাগান। শিল্পীর এই ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অমিয় চক্রবর্তী বলেন : *'একটি স্বচ্ছপটে প্রাত্যহিকের যথার্থরূপ নিরীক্ষণ করা শিল্পীর স্বধর্ম। তিনি দেখান ঘটনার আবর্ত, বিচিত্রের সংঘাত— সমন্বয় অথচ স্থায়ী ভূমিকার উপরে নীলাম্বর, দৃশ্যে অদৃশ্যে মিলিয়ে এই পার্থিব আশ্চর্যতা। কিছুকে বাদ দিয়ে নয়, সবকে নিয়ে এই শিল্প ধারণা-ধ্যানের বিলীনতায় প্রত্যক্ষকে হারিয়ে যে ধরনের আধ্যাত্মিক দূরদর্শিতা তা নয়, অথচ কাছের অসংখ্যকে কেবলমাত্র স্বার্থের ও তথ্যের বন্দীশালা বানিয়ে যে বাস্তবতাকেও দূরে রাখা। কথাটা শুনতে সহজ কিন্তু মিলিয়ে দেখার দৃষ্টিশক্তি শিল্পীর সহজাত, অন্যের পক্ষে দুরূহ।'*

বিচিত্রকে এবং বৈপরিত্যকেও—একই আধারে সমন্বিত করে সমগ্রের আলোক প্রত্যক্ষ করার এই যে শিল্পীসুলভ সহজাত দৃষ্টিশক্তি, তা কবির অধিকারে থাকলেও, পাঠক সাধারণভাবে কবির রচনায় তার পূর্ব ধারণাবশতঃই একটি বিশেষ জীবনাদর্শ বা মনোভঙ্গির পরিচয় অন্বেষণ করে। বিশেষতঃ *'দার্শনিক কবি', 'বিদ্রোহী কবি', 'জীবনবাদী কবি'*, ইত্যাকার বিশেষ অভিধায় যাঁরা চিহ্নিত তাঁদের কবিতায় সমগ্রতা, শিল্পরূপ, সৌন্দর্যবোধ ও রূপসৃষ্টির দিকে পাঠকের দৃষ্টি সাধারণভাবে আকৃষ্ট হয় না। কারণ, অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাঠক পূর্ব-ধারণাবশতঃই তাঁদের কবিতায় *'দার্শনিকতা' 'বিদ্রোহের বাণী'* কিংবা *'জীবনবাদের স্বরূপ'* অনুসন্ধান করেন। অথচ এই ক'টি বিশেষ প্রবণতাও যে তাঁদের কবিতায় শিল্পের নিয়ম মেনে, বর্ণসুষমার হাত ধরে এসেছে, এ সত্য-বিস্মৃতিই তখন প্রধান হয়ে ওঠে।

পাঠকের মনে কবিতার প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন ও বিচিত্র ধরনের হতে পারে। পাঠকের মানসগঠন, মনস্তাত্ত্বিক স্বরূপ এবং কল্পনাশক্তি ও গ্রহণেচ্ছু মনের প্রকৃতির উপর এই প্রতিক্রিয়ার ধারা নির্ভরশীল। কবি যখন কবিতা রচনা করেন তখন তিনি পাঠকের মনের উপর এই কবিতার প্রতিক্রিয়া কি হবে তা ভাবেন না, যদিও কোন 'লালিত গোপন' বক্তব্য বা আকাঙ্ক্ষার কথা পাঠকের মনে সঞ্চারিত করে দিতে অভিলাষী হন। পাঠকের সহমর্মিতা তার অনুকূলে হবে কি-না এভাবনায় উদ্বেল না হলেও, মনের তরঙ্গাভিঘাত ভাষার ধারা-স্রোতে তখন মুক্তি খোঁজে। যদিও আপন মনের অন্তরালে বক্তব্যের যে অভিঘাত তা পাঠকের চেতনায়ও আঘাত হানবে— এমন একটি বিনীত ও নমিত আকাঙ্ক্ষা কবির মনে উচ্চকিত থাকা বিচিত্র নয়। পাঠক তার মনের গড়ন, কবিতার অভিজাতে সাড়া দেবার মতো পূর্ব-প্রস্তুতি এবং কল্পনাশক্তি অনুসারে কবিতা থেকে অনেক কিছু পেতে চায়। কেউ কবিতার ছন্দোধ্বনিতে মুগ্ধ হন, কিন্তু ছন্দোধ্বনির অন্তরালে সৃষ্টিপ্রেরণা বা বেদনাবোধের যে নিঃশব্দলীলা রয়েছে, রূপে-রঙে কবির সৃষ্টিতে যা প্রকাশ পেয়েছে—তা তার চেতনায় কোনরূপ রেখাপাত করে না। কোন কোন পাঠক কবিতায় মোহনীয় শব্দ আবিষ্কার করেন—সেই শব্দের আকর্ষণে তার চেতনা আলোড়িত বিলোড়িত হয়। কোনো কোনো পাঠক হয়তো ছন্দ, শব্দ, উপমা-উৎপ্রেক্ষা-রূপক ও চিত্রকল্পের আশ্রয়ে কিংবা প্রতীকের ব্যঞ্জনায় যে বক্তব্য প্রকাশিত তাতেই তৃপ্তি খোঁজেন, কিন্তু এ সবের সমন্বয়ে যে ঐন্দ্রজালিক রূপ-দৃষ্টি, তার দিকে ফিরে তাকান না; অথচ একজন সত্যিকার কবিকে চিনে নিতে হলে এ সবের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

'দার্শনিক কবি', 'বিদ্রোহী কবি', 'জীবনাবাদী কবি' কিংবা *'গতিবাদের কবি'* ইত্যাদি যে অভিধায়ই চিহ্নিত হোন না কেন, তিনি যে কবি—এই পরম সত্য মেনে নিতে হলে তাঁর কাব্যে ভাব এবং রূপের শিল্পসম্মত সমন্বয়ের নিরিখেই অগ্রসর হতে হবে। কারণ, কাব্যে ভাব, আঙ্গিক ও রূপের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। এই তিনের মেলবন্ধনেই কাব্যের প্রাণ। অমিয় চক্রবর্তীর ভাষায় বলা যায় : 'কাব্য যেখানে প্রাণবন্ত, অর্থাৎ কাব্য পদবাচ্য, সেখানে রূপ আছে ভাব নেই এমন হতেই পারে না। লিরিকের আশ্চর্য ভাবকে তার প্রকাশ থেকে আলাদা করে দেখবার কি উপায় আছে ? ভাব নেই কিন্তু কবিতার রূপ আছে এমন হলে রূপের আশ্চর্যতাই থাকে

না এবং এ-সত্যও অনস্বীকার্য যে, বিশেষ ভাব বিশেষ আঙ্গিককে আশ্রয় করে মুক্তি পায় বিশেষ ছন্দোধ্বনি এবং ছন্দোস্পন্দনের মধ্যেই ভাবের মুক্তি। কিন্তু নির্দিষ্ট অভিধায় চিহ্নিত কবির রচনায় ভাব ও টেকনিকের মেলবন্ধন এবং শিল্পসম্মত ও সুখকর সমন্বয়ের পরিচয় অন্বেষণ না করে সাধারণত পাঠক ভাব কিংবা বক্তব্যের ব্যাপ্তি অনুসন্ধান করে গভীরতার স্বাদ পেতে চায়। ফল দাঁড়ায় এই যে, যে সমগ্রতার গুণে তিনি কবি তার দিকেই আর নজর পড়ে না। এবং এ-কারণে তাঁর কবিতার শিল্পরূপ নিরীক্ষণ বা বিচার গৌন হয়ে দাঁড়ায়।

'দার্শনিক কবি' ইকবালের কাব্য-বিচার ও তাঁর কবিমানসের পরিচয় তুলে ধরার ক্ষেত্রেও এই বিপর্যয় লক্ষ করা গেছে। অর্থাৎ যে সৃজনী প্রতিভার গুণে ইকবাল কবি এবং যে-রূপের গুণে তাঁর কবিতা যথার্থই কবিতা, তার দিকে পিঠ ফিরিয়ে কবিতায় প্রকাশিত ভাব এবং বক্তব্যের গভীরতা ও সুদূরপ্রসারিতা আবিষ্কারেই আমাদের প্রচেষ্টা নিয়োজিত হয়েছে। অনস্বীকার্য যে, শুধু রূপ সৃষ্টিতেই ইকবালের কবি-প্রতিভা নিয়োজিত হয়নি। কোনো মহৎ কবি প্রতিভাই এমন ভাবালুতায় নিমজ্জিত হয় না। শুধু আনন্দের সাহিত্য সৃষ্টিতে কিংবা *'আর্টস ফর আর্টস সেকে'* যাঁরা তৃপ্তি খোঁজেন তাঁরাও কোনো না কোনো ভাবদেহকে অবলম্বন করেন। হয়তো সে ভাব ব্যঞ্জনায় আত্মমুগ্ধতার আতিশয্য থাকে, হয়তো তা বৃহত্তর জীবন বা জীবনবোধকে স্বীকার করে নেয় না, কিন্তু তার অন্তরালে থাকে স্বতঃপ্রবাহিত এক ব্যক্তিচৈতন্য বা অনুভূতির ফল্গুধারা। রূপে-রঙে-রসে তাকেই তিনি সমুজ্জ্বল করে তোলেন।

ইকবালের মতো *'দার্শনিক ও জীবনবাদী'* কবি যাঁরা তাঁরা একটি সুনির্ধারিত বক্তব্যকেই কাব্যে শৈল্পিকগুণে অভিষিক্ত করে প্রকাশ করেন। প্রত্যয়ী ধ্যান-ধারণা, বিশেষ জীবনাদর্শ বা জীবনবোধের লালনে তাঁদের কবিতা রূপময় এবং নিছক বক্তব্যের তোড়ে শিল্পের বাঁধন ছিন্ন নয়। ভাব ও রূপের মনোহর সমন্বয় কবিশক্তিরই পরিচয় বহন করে। ইকবালের কবিতায় প্রথাসিদ্ধ মতে নিছক দার্শনিকতা কিংবা বিশেষ বক্তব্যের অনুসন্ধান না করে ভাব ও রূপের মেলবন্ধন ঘটেছে কোন প্রক্রিয়ায় তা সন্ধানে ব্রতী হলে দেখা যাবে যে, ইকবালের দার্শনিকতা তাঁর কবিতার শিল্পরূপেরই অন্য নাম। কারণ, তাঁর কবিতায় দর্শন বা বিশেষ জীবনবোধ ও প্রত্যয় শিল্পের সমন্বয়ের মধ্যে দিয়েই প্রকাশ পেয়েছে।

কবির ব্যক্তিত্বের আধার থেকেই কবিতা উৎসারিত এবং তা চেতনার অসংখ্য মণিবর্গের সমুজ্জ্বল। তিনি যা প্রত্যক্ষ করেন, যা গভীরভাবে উপলব্ধি করেন এবং যা ব্যাপক অভিজ্ঞতা ও ইন্দ্রিয়ানুভূতির মাধ্যমে অর্জন করেন তা-ই রূপমহিমায় ধরা দেয় কবিতায়। ইকবালের কবিতায়ও তাঁর জীবনাদর্শ, জীবনানুভূতি ও অভিজ্ঞতা শিল্পরূপের প্রতীক হয়ে ধরা দিয়েছে। ধ্যান, অনুধ্যান ও অধ্যয়নের মাধ্যমে তিনি যা অর্জন করেছেন তা-ই নিজস্ব চেতনা ও ব্যক্তিত্বের স্পর্শে তাঁর রচনায় নবসৃষ্টিতে পরিণত। স্মৃতি-অনুস্মৃতি সবকিছু মিলিয়ে অম্লানরূপ ও মহিমা লাভ করেছে তাঁর বিচিত্রধর্মী কবিতায়। রসবেত্তাদের মতে : *স্বল্প শক্তিমান কবি ঐতিহ্যের অনুকরণ করেন, শক্তিমান কবি ঐতিহ্যের নব-রূপায়ণ ঘটান এবং শক্তিহীন কবি ঐতিহ্যকে অস্বীকার করেন।* এই নিরিখে ইকবালের কবি-প্রতিভার বিচার করতে গেলে

আমরা এক দুর্লভ সৃজনী-প্রতিভার সাক্ষাত লাভ করবো। ইকবাল তাঁর কবিতায় ঐতিহ্যের অন্ধ অনুসরণ করেননি, তিনি আপন সৃজনী-প্রতিভা ও প্রয়াসে ঐতিহ্যকে নতুন মহিমা দিয়েছেন, নতুন তাৎপর্যে গরীয়ান করে তুলেছেন।

স্মরণীয় যে, ইকবালের কবিতায় ঐতিহ্যের এই নবরূপায়ণ শুধু ভাব এবং রূপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। যে জীবন-দর্শন ও ঐতিহ্যবোধের উত্তরাধিকার ইকবাল অর্জন করেছেন তা যেমন তাঁর কবিতায় নবসৃষ্টির মহিমা লাভ করেছে তেমনি ভাব-সম্পদের মতো কাব্যের রূপসৃষ্টির ক্ষেত্রেও তিনি নবসৃষ্টির মহিমা সঞ্চারিত করেছেন। কাব্যের টেকনিক বা আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ইকবালের সাফল্য যেমন বিস্ময়কর, তেমনি নব উদ্‌ভাসিত টেকনিকে কবিতার ঐন্দ্রজালিক রূপ সৃষ্টিতেও তাঁর পারঙ্গমতা দুর্লভ শিল্পীজনোচিত। ইকবালের কাব্যের মূলের সঙ্গে যাদের সাক্ষাৎ পরিচয় নেই, অনুবাদের মাধ্যমেই যাঁরা কবি-দার্শনিক ইকবালকে জানেন, তাঁদের পক্ষে ইকবাল-কাব্যের বিস্ময়কর শিল্পরূপ এবং অন্তঃসত্তার পরিচয় লাভ অসম্ভব; কারণ অনুবাদে মূলের ভাব ধরা দিলেও অনেক ক্ষেত্রেই এর শিল্পরূপ ধরা দেয় না, ফলে অনুবাদ পাঠের মাধ্যমে 'দার্শনিক' ইকবালকে জানা সম্ভব হলেও, কবি ইকবালকে জানা সর্বক্ষেত্রে সম্ভব হয় না, তাঁর শিল্প দক্ষতা থেকে যায় পাঠকের বোধের পরপারে। অধিকন্তু ইকবাল একজন মহৎ দার্শনিক কবি—এই সত্য এত বেশী প্রচারিত যে, তাঁর কাব্যের শিল্পরূপ বা মহিমা আবিষ্কারের পথে এ এক প্রবল বাধা। এই পরিস্থিতিরই চিত্র তুলে ধরেছেন প্রখ্যাত উর্দু কবি ফয়েজ আহমদ ফয়েজ।

ইকবাল সম্পর্কে ফয়েজ বলেছেন ঃ *'তাঁর দর্শন ও জীবনের অন্যান্য দিক নিয়ে যতো লেখা প্রকাশিত হয়েছে তার তুলনায় তাঁর কবি-প্রতিভা ও সৃষ্টির ঐন্দ্রজালিক শক্তিমত্তা সম্পর্কে খুব কম বিশ্লেষণমূলক আলোচনা হয়েছে। অথচ তাঁর বাণীর প্রাণবস্তু এবং শক্তির উৎস হচ্ছে তাঁর কবিতা।'* ফয়েজের লেখা থেকে জানা যায়, উর্দূ কাব্যে ইকবাল অর্ধ ডজন নতুন ছন্দ প্রবর্তন করেন, প্রথম সার্থকভাবে নামবাচক বিশেষ্য ব্যবহার করেন এবং অসংখ্য নতুন শব্দ আমদানী করেন। অপরিচিত ধ্বনি, শব্দ ও বিশেষ্য পদ ব্যবহারের মাধ্যমে ইকবালের কাব্যিক ব্যঞ্জনা সৃষ্টির কৌশল সম্পর্কে ফয়েজ বলেন ঃ *'ইকবালের মতো আর কোন কবি উর্দূ কবিতায় ব্যঞ্জন ও স্বরবর্ণের এতখানি ধ্বনি-বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে পারেননি। এ পদ্ধতির তিনিই উদগাতা। আর ইকবালের অন্বেষা হলো বিশ্ব-জগত ও মানুষ, বিশ্বজগতের মুখোমুখি মানুষ। তাঁর কবিতার শেষ কথা হলো ঃ মানুষের কথা, মানুষের বিশ্বের কথা, মানুষের একক মর্যাদার কথা।'*

ফয়েজের দৃষ্টিতে, এই মূল্যবোধই ইকবালের কবি-কীর্তিকে অতুলনীয় মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছে।'

কোন মহৎ কবিকে 'দার্শনিক' 'বিদ্রোহী' কিংবা 'জীবনবাদী' ইত্যাদি যে অভিধায়ই চিহ্নিত করা হোক না কেন, তাতে তাঁর মহত্ত্ব এবং সৃজনী-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য বিন্দুমাত্রও ক্ষুন্ন হয় না; দ্রষ্টা শেক্‌সপীয়র বলেছেন, গোলাপকে যে নামেই অভিহিত করা হোক না কেন, সে তার

সুরভি বিলাবেই। ইকবালের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখনীয় যা তা হচ্ছে এই যে, ইকবাল কাব্যকেই 'দর্শনে' এবং 'দর্শনকেই' কাব্যে পরিণত করার ঐন্দ্রজালিক শক্তিমত্তা প্রদর্শন করেছেন। তাঁর কবিতার অন্তঃপ্রবাহে যেমন দর্শনের ফল্গুধারা বহমান, তেমনি দর্শনেও কবিতার সৌন্দর্য বিচ্ছুরিত।

ইকবালের দর্শন বস্তুত একজন মহৎ কবিরই জীবন-দর্শন—যা ব্যক্তিত্বে এবং স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জ্বল। উল্লেখনীয় যে, প্রত্যেক জীবনশিল্পী কবিরই একটি বিশেষ চিহ্নিত দর্শন থাকে—এই দর্শনই তাঁর কাব্যের প্রাণসত্তা। নিছক সৌন্দর্যবাদী বা সৌন্দর্যবিলাসী কবির সঙ্গে এখানেই জীবনশিল্পী কবির মৌলিক পার্থক্য। 'দার্শনিক কবি' হিসাবে ইকবালকে চিহ্নিত করার ফলে ইকবালের মহৎ মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হয়নি সত্য এবং এর ফলে তাঁর কাব্যের রূপ-সৌন্দর্যও ক্ষুন্ন হয়নি বিন্দুমাত্র এও স্বীকার্য। কিন্তু অনস্বীকার্য যে, এই বিশেষ অভিধা সাধারণ পাঠকের মনে এবং কোথাও মেধাবী পাঠকের মনেও প্রায় নিয়তির মতো একটি পূর্ব নির্ধারিত ধারণার জন্ম দিয়েছে। ফলে, ইকবালের বিশিষ্ট ও স্বতন্ত্র জীবনদর্শনজাত কবিতা কাব্যের গরিমা কতখানি—এ নিয়ে কখনো কখনো প্রশ্ন উত্থাপিত হতে শোনা গেছে। ইকবালের কাব্য পাঠে যতখানি অভিনিবেশ দরকার তা ব্যয় না করে অনেক বুদ্ধিজীবীকে এমন মন্তব্য করতেও শোনা গেছে যে, ইকবাল কবি নন, তিনি দার্শনিক মাত্র। আমরা যারা ইকবাল কাব্যের মূলের সৌন্দর্য ও স্বাদ থেকে বঞ্চিত, দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো ছাড়া যাদের গত্যন্তর নেই, তাদের মুখেই সাধারণত এমন মূঢ় মন্তব্য শোনা যায়। অথচ আমরা অনুবাদে বহু বিদেশী মহৎ কবি-সাহিত্যিকের রচনার সৌন্দর্য ও স্বাদ উপভোগ করতে উদ্যোগী হই—তাঁদের রচনার শিল্পরূপের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতে দ্বিধা করি না। কিন্তু ইকবালের ক্ষেত্রে আমাদের প্রয়াস সীমাবদ্ধ এবং এর ধারা পূর্ব-নির্ধারিত এই কারণে যে, আমরা ইকবালকে দার্শনিক কবি এবং মুসলিম পুনর্জাগরণের নায়ক হিসাবেই জেনেছি।

অথচ একটু অভিনিষ্ঠ এবং সহমর্মিতায় অনুপ্রাণিত হয়ে ইকবাল কাব্যপাঠে ব্রতী হলে লক্ষ্য করা যাবে যে, ইকবালের কবিতা ভাবের সঙ্গে মনোহর রূপের সমন্বয়েই মহৎ এবং মাধুর্যময়। তাঁর স্বতন্ত্র জীবন-দর্শন যেমন কবিতাকে সারবান করেছে তেমনি তাঁর ব্যাপক জীবনদৃষ্টি ও দুর্লভ সৃজনক্ষমতা দিয়েছে স্বাস্থ্য ও লাবণ্যের আভা। ইকবাল-কাব্যের সৌন্দর্য-মহিমা শুধু এর বহিরাঙ্গেই বিদ্যুতের মতো ঝলসিত নয়, এর অন্তঃপ্রবাহেও বিচ্ছুরিত। এই সৌন্দর্য অবলোকন এবং উপভোগের জন্যে চাই বিশেষ দৃষ্টিশক্তি ও উপভোগ-ক্ষমতা। বিশেষ রসদৃষ্টি, কাব্য উপভোগ-ক্ষমতা এবং সহমর্মিতা নিয়ে অগ্রসর হলে ইকবাল কাব্যপাঠে পাঠক যে উপঢৌকন পাবেন তার পরিচয় দিতে গেলে অমিয় চক্রবর্তীর ভাষায় বলা যায়ঃ '*কবি ইকবালের কাব্য কাননে বিচরণ করলে সৌরভি কুঞ্জ দেখতে পাব, খররৌদ্র ধূলিতে শ্যামলচ্ছায়া মেলে আছে, অগন্য মনোহর বীথি আহ্বান করে নিয়ে যায় গভীর ভাবনার নির্দেশে। বাক্যে ভঙ্গি, রসের উচ্ছল মাধুর্য এবং দিগন্ত দৃষ্টিময় ব্যঞ্জনা তার বহু কবিতায় উপকর্ষের যে ভাষা পেয়েছে তা উর্দু বা পারসিক ধ্বনিকে অতিক্রম করে সর্বমানবের*

চিত্তচারী।' (সাম্প্রতিকঃ পৃঃ ১২৯)।

অনুবাদে মূলের সৌন্দর্যের সাক্ষাত লাভ সঙ্গত কারণেই সম্ভব নয়। অনুবাদ কাশ্মীরী শালের উল্টো পিঠের মতো। বিশেষ করে কাব্যের অনুবাদে ভাবদেহের পরিচয় মিললেও রূপসৌন্দর্য এবং কাব্যের মনোহর লাবণ্যের সাক্ষাত সব সময় মেলে না। স্বল্প শক্তিমান অনুবাদকের হাতে পড়ে এ কারণেই বহু মহৎ কবির কাব্যের বিপর্যয় ঘটেছে। অনুবাদের দরুন সমগ্র বিশ্বপটভূমিকায় রবীন্দ্রকাব্যের মহিমা যে নিষ্প্রভ হয়ে এসেছে এ দুঃসংবাদ বুদ্ধদেব বসু সম্প্রতি তাঁর একটি রচনায় পরিবেশন করেছেন। অবশ্য অনুবাদের নবসৃষ্টিও সম্ভব। ফিটজেরাল্ড বা কান্তি ঘোষের মতো অনুবাদকের হাতে পড়লে অনুবাদকাব্য নবসৃষ্টির মহিমা পায়। ইকবালের জন্যে দুর্ভাগ্যের কথা এই যে, অনেক অক্ষম অনুবাদকের হাতে তাঁর কাব্যের মহিমা ও মাধুর্য লাঞ্ছিত হয়েছে। বিশেষ করে বাংলা ভাষায় যাঁরা ইকবাল-কাব্যের অনুবাদ করেছেন তাঁদের অনেকেই সৃজনক্ষমতার অভাবে এবং আক্ষরিকভাবে মূলানুগ হবার মূঢ় বাসনায় উদ্দীপিত হয়ে ইকবাল-কাব্যের বিপর্যয় ডেকে এনেছেন। তাঁরা এ সত্য বিস্মৃত হয়েছেন যে, অনুবাদ অর্থ মূলের ভাষান্তর মাত্র নয়, মূল সৌন্দর্যের নবরূপায়ণও বটে। নবসৃষ্টির মহিমায় মাধুর্যময় এবং আকর্ষণীয় করে তুলতে না পারলেও অনুবাদ বিপর্যয়কেই প্রশ্রয় দেয়। উল্লেখিত অনুবাদকের কল্যাণে আমরা 'দার্শনিক' ইকবালকে পেয়েছি বটে, কিন্তু কবি ইকবালকে অনেক ক্ষেত্রেই হারিয়েছি। আশার কথা এই যে, কয়েকজন প্রতিভাধর কবি ও সহমর্মী ইকবাল কাব্যের অনুবাদে তাঁদের শ্রম ও সাধনা নিয়োজিত করেছেন। ফলে ইকবাল-কাব্যের দর্শনের সাথে সাথে তার সৌন্দর্য এবং লাবণ্য মহিমাও অনুবাদে সঞ্চারিত হয়েছে। এসব অনুবাদ পাঠে স্পষ্টতই হৃদয়ঙ্গম করা সহজ যে, ইকবাল শুধু আত্মার রহস্য সন্ধানী এবং আত্মসত্তার উদ্বোধনকারী মহৎ দার্শনিক নন, তিনি মহৎ কবিও।

শুধু ভাবস্বরূপ নয়, কাব্যের শিল্পরূপ অনুসন্ধানও একজন মহৎ কবির কাব্যবিচার এবং নবমূল্যায়নের জন্য অপরিহার্য। ভাবকে যিনি ভাষায় ও রূপরসে হৃদয়-সংবেদ্য এবং মনোহর করে তোলেন তিনিই যথার্থ কবি। অবশ্য, ভাবকে আশ্রয় করে ভাষা কি রূপে ও রসে অভিষিক্ত হবে তা নির্ভর করে কবি-প্রতিভা ও তাঁর মানসগঠনের ওপর। আঙ্গিকের অনুসরণ, শব্দবিন্যাস, উপমা-উৎপ্রেক্ষা, চিত্রকল্প ও রূপপ্রতীক সৃষ্টি ইত্যাদির ক্ষেত্রে দক্ষতার পরিমাপেই একজন সৃজনশীল কবির প্রতিভার মূল্যায়ন সম্ভব। সৃজনধর্মী কবি শুধু আলংকারিক উপকরণ হিসাবেই এসব ব্যবহার করেন না, তিনি এসবে নতুন প্রাণ-সঞ্চার করে কাব্য-ভাবনার প্রকৃতি অনুসারে গতিময় করে তোলেন। কবি উপমা-উৎপ্রেক্ষা, চিত্রকল্প ও রূপপ্রতীকের আশ্রয় গ্রহণ করেন বক্তব্যের মধ্যে গভীরতা এবং কাব্যদেহে সত্তার আভা ও লাবণ্য সঞ্চারের জন্য—অতএব শুধু আলংকারিক ভাষাতেই যে উপমা বিন্যস্ত হবে এমন নয়, আটপৌরে এবং বক্তব্য-প্রধান বিষয়মূলক কবিতাতেও উপমার সৌন্দর্য দীপ্ত হতে পারে। উপমায় ভারাক্রান্ত করা নয়, তীক্ষ্মদ্যুতি এবং গতিময়তা সৃষ্টিই সৃজনী প্রতিভাধর কবির লক্ষ্য। শক্তিমান কবি শুধু প্রচলিত উপমার চতুর ব্যবহার করেই ক্ষান্ত হন না, তিনি

নবতর রীতিতে এ সবের আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা ও আন্তঃসম্পর্ক মেনে নিয়ে নতুনভাবে তা প্রয়োগ করেন। কোন একটি বিশেষ ঘটনা বা অভিজ্ঞতা—তা সুখের, বেদনার বা আতঙ্কের, যা-ই হোক না কেন, প্রত্যক্ষ বা অতি সহজগ্রাহ্য উপায়ে তিনি ব্যক্ত করেন না, তিনি তা প্রকাশ করেন রহস্যময়রূপে, উপমা, উৎপ্রেক্ষা, চিত্রকল্প কিংবা রূপপ্রতীকের সহায়তায়। একটি কবিত্বময় বস্তুর সঙ্গে অপর একটি বস্তুর উপমা সহজ, কিন্তু মহৎ প্রতিভাধর কবি এমন সহজ সৃষ্টিতে তৃপ্ত হন না, তিনি জটিল উপমাকে ভাবনার পাড়ে চারুশিল্পের মতো বয়ন করেন। রঙ ও রেখার নিজস্ব স্বতন্ত্র অনুভূতি সেখানে ধরা দেয়।

ইকবাল-কাব্য পাঠে এই সৃজন-মহিমার বিচ্ছুরিত আভাই আমরা প্রত্যক্ষ করি। শুধু ভাব-মাহাত্ম্য নয়, রূপ-মাহাত্ম্যেও যে ইকবালের কবিতা অপরূপ—এই সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াই। কিছু উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি স্পষ্ট করা যাক। ইকবাল তাঁর জীবনাদর্শ, জীবনানুভূতি এবং স্বতন্ত্র জীবন-দর্শন ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে কাব্যের ভাষা এবং আঙ্গিকের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তাঁর বক্তব্য এবং ভাবনা উৎসারিত হয়েছে গভীর উপলব্ধি ও অনুভূতি থেকে, আর এ কারণেই তা প্রত্যক্ষতার বন্ধন অতিক্রম করে অনেকখানি রহস্যময় চরিত্র অর্জন করেছে। যে গভীর জীবনানুভূতি ইকবালের কাব্যে উৎসারিত তা দুর্লভপ্রতিভার স্পর্শে সঞ্জীবিত না হলে হয়তো আটপৌরে বক্তব্যের ধার ছুঁয়ে যেত। কিন্তু ইকবালের সৌন্দর্যদৃষ্টি ও অপরিমেয় কল্পনাশক্তি তাকে করে তুলেছে ব্যঞ্জনাময়। উপমা, উৎপ্রেক্ষা, চিত্রকল্প ও রূপপ্রতীকের সাহায্যে ইকবাল তাঁর বক্তব্যকে করে তুলেছেন সৃজনধর্মী—অনিঃশেষ তাৎপর্যময়। ইকবাল প্রথাগত পদ্ধতিতে উপমা, উৎপ্রেক্ষা, চিত্রকল্প কিংবা রূপপ্রতীকের ব্যবহার করেননি। বহু ব্যবহারে এসব কাব্যউপকরণ জীর্ণ হয়, লাবণ্য সঞ্চারের ক্ষমতা হারায়—এ বোধ ছিল ইকবালের সহজাত। তিনি নিজের সৃজন-প্রতিভার স্পর্শে উপমা, উৎপ্রেক্ষা; চিত্রকল্প, রূপপ্রতীক ইত্যাদিকে নবরূপে সংগঠিত এবং সঞ্জীবিত করে নিয়েছেন। শব্দ ও ধ্বনির নবতর ব্যবহার এবং নবসৃষ্টিতে ইকবালের পারদর্শিতা কতখানি, এ বিষয়ে আমাদের সাক্ষ্যদান কঠিন। কারণ, দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা ইকবাল-কাব্যের মূলের স্বাদ থেকে বঞ্চিত। তবে, এ ব্যাপারে ফয়েজ আহমদ ফয়েজের মতো বিশ্রুত উর্দূ কবির মন্তব্য আমাদের অনুকূলে। তিনি এক্ষেত্রে ইকবালের বিস্ময়কর অবদানের বিষয়ে আমাদের আলোকদান করেছেন। ইকবাল যে উপমা-উৎপ্রেক্ষা, চিত্রকল্প সৃষ্টি ও রূপকের ব্যবহারে অন্যান্য বিশ্ব-বিশ্রুত মহৎ কবিদের মতোই সুদক্ষ—এর পরিচয় আমরা অনুবাদ পাঠেই পেতে পারি। শুধু একটি গভীর অভিনিবেশ, রসবোধ এবং দৃষ্টিশক্তি এর জন্য অপরিহার্য। ইকবাল উপমা ও রূপপ্রতীকের ভাষায় কি ভাবে কথা বলেন নীচের কবিতাংশ থেকেই তা স্পষ্ট ঃ

দুরন্ত দস্যুর মত
যখন প্রোজ্বল সূর্য
হানা দিল শর্বরীর' পরে

আমার ক্রন্দন ধারে
শিশির সিঞ্চিত হল।
গোলাবের মুখ
নার্গিসের ঘুম ঘোর
মুছে নিল।
মোর অশ্রুকণা,
উজ্জীবিত তৃণদল
উল্লাসে ছড়ায়ে যায়।
আমারি সে একাগ্র আবেগে।

*

জামশীদের পাত্র হতে
উজ্জ্বল আমার ধূলি
জানে সংজ্ঞা তার
জন্ম যে নেয়নি আজো
ধূলিরুক্ষ ধরিত্রীর বুকে।
শিকার ক'রেছে মোর চিন্তাধারা
সেই হরিণীকে
বাহিরে আসেনি আজো সে এখনো
অনস্তিত্ব অন্ধকার থেকে;

*

প্রাচীর দিগন্ত হতে উঠে এল
প্রভাতের যে রশ্মি আমার,
সঞ্চিত রাহির ঘন অন্ধকার
সহজে সে করিল লুণ্ঠন,
একটি শিশির বিন্দু ঠাঁই নিল
পৃথিবীর; গোলাবের দিকে।

*

কত কবি জন্ম নিল সে মহাকবির
মৃত্যু শেষে
আমাদের রুদ্ধ আঁখি খুলেছিল যে

নিজের ছবির আলোকে
মাজারের মৃত্তিকায় যেমন গোলাব কুঁড়ি
দীর্ণ করে সুপ্ত পর্ণাধার
নিঃসীম শূন্যতা থেকে নূতন
দিগন্ত পানে
যাত্রা শুরু হল পুনর্বার।

*

যদি ও কুঁড়ির স্বপ্নে গোলাকার গুলশান
না জাগে আমার
তবে ফাগুনের মেঘচ্ছায়া
মূল্যহীন কৃপা তার ছায়া
ব্যর্থতার

*

আঁখি তারকার মত হতে পারি—
দৃষ্টিমান মানুষের কাছে,
বিশ্বের শ্রাবণে যেন যেতে পারি
আমি সুর হয়ে;
কাব্যের সুষমা যেন পরম ঐশ্বর্যময়
হয় লেখনীতে :
আমার কান্নায় যেন জেগে উঠে
শুষ্ক তৃণ
অশ্রুসিক্তঃ প্রাণের প্রান্তরে

[পূবাণী, অনুবাদ ঃ ফররুখ আহমদ]

রূপের নেকাব উঠিয়ে নিতে ঐ
অপরূপ মুখের পর
কি চাহে আজ ? মুখর দিনের
নগর না এই বনভবন।।

[গজল ও গীতিকা]

বাসনার মর্মমূলে মানুষের
জয়-বার্তা

খোঁজে আকর্ষণ।
জীবন-শিকারী এক আকাঙ্ক্ষার
মাঠে তার ফাঁদ
সুন্দরের কাছে আনে আকাঙ্ক্ষা ?
প্রেমের সুসংবাদ।

*

কবির অন্তর মাঝে নেকাব তুলিয়া নেয়
সে চির সুন্দর
সিনাই পাহাড় থেকে সৌন্দর্যের
তীব্র দ্যুতি
পাঠায় খবর ;
দৃষ্টিতে সুন্দর তার নিমেষে সুন্দরতর
প্রিয়তর অপূর্ব যাদুতে।
বুলবুল শিখেছে গান
অফুরন্ত, ওষ্ঠ পটে
গোলাবের রক্তাধর বর্ণে তার হয়েছে উজ্জ্বল,
তার অনুরাগে জ্বলে পতঙ্গের
প্রেমী বক্ষতল ?
প্রেম-কাহিনীর পটে সেই তো
জাগায় রঙ সুতীব্র উজ্জ্বল।
তার সুরজাল হেথা বয়ে আনে
মোহময় যাদু অপরূপ,
একটি কেশের সাথে টেনে আনে
পর্বতের সমগ্র স্বরূপ,
চাঁদ-সিতারার সাথে
চিন্তার সহস্র পাড়ি দেয় একা,
জানেনা কুরূপা পৃথ্বীর ; সৃষ্টি করে
এ সৌন্দর্য লেখা।।

[অনুবাদ ঃ ফররুখ আহমদ]

দুর্বার তরঙ্গ এক বয়ে গেল তীর

তীব্র বেগে,
বলে গেল : আমি আছি যে মুহূর্তে
আমি গতিমান ;
যখনি হারাই গতি সে মুহূর্তে
আমি আর নহি।

[অনুবাদ : ফররুখ আহমদ]

উদ্ধৃতাংশ থেকে লক্ষণীয় যে, জীবনবাদী ও স্বতন্ত্র জীবনদর্শনে বিশ্বাসী ইকবালের কবিতায় তার আত্ম সত্তার রহস্য-সন্ধান এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশের আকুতি, উপমা-উৎপ্রেক্ষা রূপক ও প্রতীকের ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যঞ্জনাধর্মী ও তাৎপর্যময় রূপ পরিগ্রহ করেছে। সৃজনী প্রতিভাধর কবি ইকবাল জানেন যে, উপমাই কবিতা নয়, উপমাতেই কবিত্ব এবং এ কারণেই তিনি কাব্যকে উপমায় ভারাক্রান্ত না করে অনিবার্য উপমার সাহায্যে কবিতার আবেগ ও ব্যঞ্জনাকে মর্মগ্রাহী করে তুলেছেন। বক্তব্যপ্রধান কবিতায়ও ইকবালের সৃজনী-প্রতিভার স্পর্শে এই মাধুর্য সঞ্চারিত হয়েছে। উপমার ব্যবহার, চিত্রকল্প সৃষ্টি, দৃশ্য রচনা ও সাদৃশ্য অন্বেষণে ইকবালের দক্ষতা বিস্ময়কর। অনুবাদে মূলের প্রতিরূপ সৃষ্টি কিংবা সৌন্দর্য-সন্দর্শন সম্ভবপর নয়, তবু এ থেকেই ইকবালের ঐন্দ্রজালিক সৃজন-ক্ষমতার পরিচয় স্পষ্ট :

বিক্ষিপ্ত সূর্যের আলো ডুবে গেছে
নীল নদী জলে
নিভে গেছে সে ঔজ্জ্বল্যতার—
শুধু এক বিন্দু ভাসে প্রতিকূলে
স্রোত-আবর্তনে
সেই সূর্য আলোক-ধারার
বিশুদ্ধ রক্তের ফোঁটা আকাশের অববাহিকায়
গোধূলিতে হলো গতিশীল,
উত্তপ্ত সূর্যের শিরা ছিন্ন ভিন্ন
করেছে কি
অস্ত্রাঘাত প্রকৃতি-নিখিল ?
সন্ধ্যার বধূর কানে দীপ্তিমান
দামী মুক্তা
এ-আকাশ নিল চুরি করে।
অথবা রূপালী মীন নিঃশব্দে যে
সঞ্চারিত

নীল নদী জলের ভিতরে ?

[নতুন চাঁদ]

এখন অবশ হাতে বেহেশতের
সুরিখানা থেকে
সুরার পেয়ালা নিয়ে আসে—
রঙিন সুরার রঙ বিকেলের শেষ–
সীমানায়
লাল হয়ে লেগেছে আকাশে।
দিনের কাফেলা চলে দ্রুত থেকে
আরও দ্রুততায়
দৃশ্য তার হয়ে যাবে শেষ,
গোধূলিকে মনে হয় মৃত সেই
স্তিমিত সূর্যের
যেন চিন্তা-ভস্ম অবশেষ।

[রাভী তীরে]

সাদৃশ্য-অন্বেষণ, দৃশ্য রচনা ও কবি কল্পনায় ইকবালের পারঙ্গমতা বিস্ময়কর। অধিকন্তু চিত্রকল্পের অসংলগ্ন উপস্থিতির মাধ্যমে নয়, বরং কল্পনা-প্রতিভা ও অনুভূতির মিশ্রণের সহায়তায় তিনি কাব্যকে জীবন্ত ও গতিশীল করে তুলেছেন। ইকবালের ব্যবহৃত উপমা, উৎপ্রেক্ষা এবং সৃষ্ট চিত্র-কল্প স্থানু বা স্থবির নয়, সৃজন-নৈপুণ্যে সবকিছুই গতিশীল ও স্পন্দমান ঃ

হিমেল রোশ্‌নীতে লীন সুপ্তিমগ্ন
আমার জাহানে
বিদেহী ছায়ার মতো কেন তুমি
কর সঞ্চরণ
না-উন্মাদ বেদনায় ? বাক্যহীন
ওষ্ঠাধর তব
সদ্যস্ফুট গোলাবের দল—যথা মৌন
আকুতিতে
গভীর নৈঃশব্দ জাগে; যেন তারি
হাওয়াতে উধাও
সুরভির মতো তব বেদনার্ত আত্মার আকুতি

ভেসে চলে—
তারাভরা আকাশের জড়োয়া প্রাঙ্গণে
কি সম্মতি মোতির হাটে তুমি কি সে
বিভ্রান্ত জহুরী—
প্রলুব্ধ নয়ন অথবা হয়তো এ চাঁদের
রূপালি স্রোতের মাঝে তুমি এক সন্তরণশীল
মীনপরী ;
শ্রান্ত পানির ঘূর্ণীরা
দরিয়ার তলদেশে নিমজ্জিত বিষন্ন
শয্যায়
ঘুমের পরশে সেথা নিমীলিত নয়ন
তাদের ;
চঞ্চল তরঙ্গদল মাথা রেখে তটভূমি 'পরে
মধুর তন্দ্রায় লীন।

[রাত্রি ও কবি– অনুবাদ ঃ তালিম হোসেন]

আকাশের উপত্যকায় সূর্যের কত
আলোকচ্ছটা
বিচ্ছিন্ন সূর্যের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের এ
যেন কোলাকুলি।

[আশার ঝিলিক– অনুবাদ ঃ নেয়ামাল বাসির]

সুরভী ফুলের ? নাকি ওগুলো
বনপরীদের শারি
ঐ যে পরেছে যারা সুরঙিন
সুনীল পীতাভ শাড়ী ?
ভোরের বাতাস শিশির বিন্দু
দিয়েছে ফুলের 'পরে
সুরুজ দিয়েছে মুক্তামালার রশ্মি
সোহাগ ভরে।

[ফুলের অঙ্গ ভরে ঐ]

ধূসর চাঁদের আলো কেমন নীরব

আল্লামা ইকবাল

হয়ে আছে
সমস্ত গাছের শাখা-প্রশাখা নড়ে না
একটিও
উপত্যকা-সুরকার সেও আজ নীরব
নিশ্চুপ
অজস্র পর্বতশ্রেণী সুবজ পোশাকে.
আচ্ছাদিত
মূর্ছাহত সৃষ্টি যেন ঘুমমগ্ন রাত্রির
শিয়রে।

[একটি সন্ধ্যা– অনুবাদঃ আবদুস সাত্তার]

মরু-প্রান্তরে উষার দৃশ্য ? অতি
মনোরম চমৎকার
সূর্য-উৎস-তাই থেকে ওঠে আলোকনদীর
লহর ধার।
সীমাহীন রূপ উচ্ছসি ওঠে
স্বভাব-নেকাব করিয়া ভেদ
হৃদয় নয়ন ভরে আনন্দে,
রহেনা দুঃখ, রহেনা খেদ।
রাত্রিতে বুঝি বৃষ্টি হয়েছে
কোহেল নামের বুকের 'পর
বিদায়ী মেঘেরা পরাইয়া গেছে
জাফরানী আর নীল চাদর।
বায় বিশুদ্ধ, শান্ত-শীতল ঢ'লিয়া পড়েছে
খেজুর শাখ
কাজেমার প্রতি বালুকণা পেল
ময়ুরের মতো উজ্জ্বল পাখ।

[প্রেম ও কামনা– অনুবাদ ঃ আবুল কালাম মুস্তফা]

ভাবের সম্মোহন, আবেগের তুর্ণগতি এবং রূপ সৃষ্টির দক্ষতায় অতুলনীয় কবি ইকবালের গীতিকবিতায় গভীর অনুভূতি, রূপ ও মাধুর্য অধিকতর মোহনীয় হয়ে উঠেছে বলে ইকবাল-কাব্যবেত্তাদের অভিমত। এ সম্পর্কে অমিয় চক্রবর্তী কিছু স্মরণীয় মন্তব্য করেছেন। তাঁর ভাষায় ঃ

'শিশু-পুত্র জাওইদকে আশীর্বাদ করে লেখা তাঁর গীতি কবিতাগুলিতে ইকবালের প্রচ্ছন্ন কারুণ্য যেন সান বাঁধানো পথের ধারে পুষ্পিত হয়ে উঠেছে। তাঁর বিদ্রূপসজাগ বুদ্ধিকে এড়িয়ে উর্ধ্বে তুলেছে মৃদু রঙিন কবিতার গুচ্ছ। কিছু কবিতা 'গোল টেবিল' বৈঠক-এর সময়ে ইংলণ্ড থেকে লিখে পাঠিয়েছিলেন ; বাকি কয়েকটি মৃত্যুর অনতিপূর্বে রচিত। এপিগ্রাম এবং দ্রুতরসাত্মক বাক্যের বাহনে যিনি ব্যাপক ও তথ্যবহুল কাব্য লিখতে অভ্যস্ত ছিলেন, তাঁর রচনায় এমনি করে কখন একটি সহজ বেদনার বাঁশি বেজে উঠত, যাঁরা ইকবালের ধারালো কাব্যের দরজা থেকে ফিরে এসেছেন তাঁরা সে সুর শোনেননি।' বিনয়নম্রসাধক কবি তাঁর পুত্রকে ডেকে বলছেন ঃ

খুঁজে নাও তোমার স্থান প্রেমের রাজ্যে,
সৃষ্টি করো নূতন যুগ, নূতন প্রভাত
নূতন সন্ধ্যাগুলি।
ঈশ্বর যদি দিয়ে থাকেন তোমায়
প্রকৃতিকে বোঝবার চিত্ত
বিনিময় করো টুলিপ-গোলাবের
নীরবতায়
তোমার অন্তরঙ্গতা।
আমার এ-পথ নয় ধনীর,
গরীব মানুষের পথ আমার
বিকিয়ো না আপনাকে
গরীব হয়েই হোক তোমার নাম।

নিজেকে তিনি অনেক সময় বলতেন মুসাফির, গান-গাইয়ে, আর কিছু নয়। ধন বা প্রতাপের পথ তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে কখনো মাড়াননি।

মিলের চুমকি-বসানো, অনুপ্রাসবহুল চকমকি ছন্দের জোড়া-জোড়া পদ-রচনা মাঝখানে গীতিকাব্যরসের পরিপূর্ণ আবির্ভাব যেমন বিস্ময়কর তেমনি মধুর। ধরা পড়ত, ইকবাল শুধুমাত্র শিল্পদক্ষ পরিবেশধর্মী এমনকি স্বধর্মের শ্রেষ্ঠ প্রচারী কবি নন, সঙ্কটযুগের দ্বন্দ্বকেই তিনি আশ্চর্য প্রকাশ করেননি, তাঁর প্রথমপর্বের সূর্যকাল শেষ পর্যন্ত অন্তরে অনাচ্ছন্ন ছিল, কাব্যের সূত্রে গাঁথা হয়েছিল তারই অম্লানরাগিনী। আসন্ন দুর্যোগের পরে মুশকিল আসান-এর বাণী তাঁর কাব্যে ধ্বনিত হয়েছিল কি না জানি না, কিন্তু ঝড়ের দোলায় তিনি ভয় করেননি; তাঁর কাব্যতরী ঘাটে এসে নোঙ্গর বেঁধেছিল পশ্চিমী আসন্নতায় নির্ভয় দেবার জন্যে। তাঁর কাব্যকে দেখে শেষ পর্যন্ত চেনা যেত, তার গড়ন দর-উজানী, তাতে ছুঁয়ে আছে উত্তাল দিগন্তরেখা। –(সাম্প্রতিক ঃ পৃঃ ১২৮)

[সৌজন্যে ঃ সাহিত্য ও সাহিত্যিক]

আযাদ মুসলিম রাষ্ট্রের স্বপ্ন

মূল ঃ ডঃ মুহম্মদ ইকবাল

সৈয়দ আবদুল মান্নান অনূদিত

[১৯৩০ সালের ২৯শে ডিসেম্বর এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত নিখিল-ভারত মুসলিম লীগের ঐতিহাসিক অধিবেশনে আল্লামা ইকবাল প্রদত্ত সভাপতির ভাষণ।]

ভদ্রমণ্ডলী ! ভারতে মুসলিম রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও কার্যকলাপে সর্বাধিক সংকট-সন্ধিক্ষণে আপনারা নিখিল ভারত মুসলিম লীগের এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করার জন্য আমায় আহবান করে যে সম্মান প্রদর্শন করেছেন, তার জন্য আমি আপনাদের কাছে গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। নিঃসন্দেহে এই বিরাট জনসমাবেশে এমন বহু লোক আছেন, যাঁরা আমার অপেক্ষা বহুগুণে রাজনৈতিক জ্ঞানে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এবং যাঁদের রাজনীতি জ্ঞানের প্রতি আমি উচ্চতর শ্রদ্ধা পোষণ করি। সুতরাং আজকের এই জনসমাবেশ যে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আহূত হয়েছে, তৎসম্পর্কে আমি কোনো নির্দেশ দেবার দাবী করলে তা প্রগলভতার সামিল হবে। আমি কোনো দলের নেতা নই ; কোনো নেতার অনুসরণ আমি করি না। আমি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশ ব্যয় করেছি ইসলামের সযত্ন অধ্যয়নে– ইসলামের কানুন ও রাষ্ট্রব্যবস্থা, তার তমদ্দুন, তার ইতিহাস ও সাহিত্য অধ্যয়নে। আমার মনে হয়, ইসলামের প্রাণবস্তুর সাথে এই অবিরাম সংযোগের ফলে তা আমার উপলব্ধিতে যেভাবে প্রকাশ লাভ করেছে, তার ফলে বিশ্বজনীন সত্য হিসাবে ইসলামের তাৎপর্য সম্পর্কে আমি এক ধরনের অন্তর্দৃষ্টির অধিকার লাভ করেছি। তার মূল্য যা-ই হোক, ভারতের মুসলিম জনগণ ইসলামের প্রাণবস্তুর প্রতি সত্যিকারভাবে আস্থাশীল থাকতে দৃঢ় সংকল্প ধরে নিয়ে আমি আপনাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্পর্কে পথনির্দেশ করার প্রয়াস পাবো না, বরং আমার মতে যে-সব প্রধান প্রধান নীতি দ্বারা সে-সব সিদ্ধান্তের সাধারণ প্রকৃতি নির্ধারিত হবে, তা সুস্পষ্টভাবে আপনাদের চেতনায় আনয়ন করবার ক্ষুদ্রতর কর্তব্য আমি পালন করতে চেষ্টা করবো।

একথা অস্বীকার করা যায় না যে, একটি সঠিক নৈতিক আদর্শ ও বিশেষ ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থা হিসাবে *ইসলামই* ভারতের মুসলিম জনগণের জীবন-ইতিহাসে প্রধান গঠনমূলক উপাদান হয়ে আছে।

বিশেষ ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থা বলতে আমি বুঝি আইনসংক্রান্ত একটি বিশেষ ধারা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও একটি সুনির্দিষ্ট নৈতিক আদর্শে অনুপ্রাণিত সামাজিক কাঠামো। তা থেকে এমন সব মৌলিক আবেগ ও আনুগত্য জন্ম নিয়েছে, যা বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি ও শ্রেণীকে *[group]* ঐক্যবদ্ধ করে শেষ পর্যন্ত তাদেরকে এক সুনির্দিষ্ট জাতিতে পরিণত করে। প্রকৃতপক্ষে, একথা বললে মোটেই অতিরঞ্জন হবে না যে, সম্ভবত ভারতই দুনিয়ার একমাত্র দেশ, যেখানে ইসলাম জাতি গঠনকারী শক্তি হিসাবে সবচাইতে বেশী কাজ করেছে। অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতেও

সমাজ *[society]* হিসাবে ইসলামের কাঠামো প্রায় সম্পূর্ণরূপে গড়ে উঠেছে সুনির্দিষ্ট নৈতিক আদর্শে অনুপ্রাণিত তমদ্দুন হিসাবে ইসলামের কার্যকারিতার মাধ্যমে। আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে, মুসলিম সমাজ তার উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য ও অভ্যন্তরীণ ঐক্য সহকারে রূপ লাভ করেছে ইসলামী তমদ্দুনের সংশ্লিষ্ট কানুন ও অনুশাসনের চাপে। অবশ্য ইউরোপীয় রাজনৈতিক চিন্তাধারায় যে ধারণাসমূহ প্রকাশ লাভ করছে, তাতে ভারত ও ভারতের বাইরের বর্তমান যুগের মুসলিমদের দৃষ্টিভঙ্গিতে দ্রুত পরিবর্তন আসছে। এসব ধারণায় অনুপ্রাণিত আমাদের সমাজের তরুণতর লোকেরা ইউরোপের বিবর্তন ধারার মূলীভূত তথ্যসমূহের সমালোচনামূলক উপলব্ধি ব্যতীতই সে-সব ধারণাকে নিজ নিজ দেশে জীবন্ত শক্তি *[Living force]* হিসাবে দেখবার জন্য আগ্রহান্বিত। ইউরোপে খৃষ্টধর্ম বলতে বুঝাতো একটা নিছক সন্ন্যাস-আশ্রম-আশ্রয়ী বিধানকে *[monastic order]*, যা ক্রমে ক্রমে বিকাশ লাভ করেছে এক বিরাট গির্জা প্রতিষ্ঠানে *[church organisation]*। লুথারের প্রতিবাদ অভিযান চালিত হয়েছিলো গির্জা-প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে, পার্থিব ধরনের কোন রাষ্ট্র বিধানের *[polity]* বিরুদ্ধে নয় এবং তার সুস্পষ্ট কারণ ছিল এই যে, খৃষ্টধর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট তেমন কোনো রাষ্ট্র শাসনব্যবস্থার অস্তিত্বই ছিলো না। এই প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে লুথারের বিদ্রোহ করার যৌক্তিকতাও পুরোপুরিই ছিলো ; যদিও আমার মনে হয়, তিনি তখন এ সত্য উপলব্ধি করেননি যে, ইউরোপের তখনকার চলতি অবস্থায় তাঁর বিদ্রোহ শেষ পর্যন্ত নীতি সম্পর্কিত বহুবিধ জাতীয় তথা সংকীর্ণতর পদ্ধতির জন্ম দিয়ে যীশুর বিশ্বজনীন নীতিবাদকে বিপর্যস্ত করবে। এম্নি ক'রে রুশো ও লুথারের ন্যায় ব্যক্তিদের উদ্যোগে চালিত বুদ্ধি-বৃত্তিসংক্রান্ত আন্দোলনের অভ্যুত্থানের ফল হোল এককে পরস্পর সমন্বয়হীন বহুতে *[mutually ill-adjusted many]* পরিণত করা, মানবীয় দৃষ্টিভঙ্গির জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে রূপান্তর এবং তার বাহন হিসাবে প্রয়োজন হোল দেশের ধারণার মতো অধিকতর বাস্তবাশ্রয়ী ভিত্তির এবং তা' বিকাশ লাভ করতে লাগলো জাতীয় ধারায় পরিকল্পিত বিভিন্ন রাষ্ট্র-শাসনপদ্ধতির মাধ্যমে। জাতীয় ধারার অর্থ হোল ঃ যে ধারায় অঞ্চলকে স্বীকার করা হয় রাজনৈতিক সংহতির একমাত্র নীতি হিসাবে। আপনারা যদি ধর্মসংক্রান্ত ধারণাকে সম্পূর্ণরূপে পারলৌকিক ব্যাপার বলে ধরে নিয়ে বিবেচনা করতে শুরু করেন, তা'হোলে ইউরোপে খৃষ্টধর্মের যে পরিণতি হয়েছে, তা' সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। নীতিবাদ ও রাষ্ট্র-শাসনব্যবস্থার জাতীয় পদ্ধতি দ্বারা যীশুর বিশ্বজনীন নীতিবাদ বিপর্যস্ত হয়েছে। ফলে , ইউরোপ যে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে বাধ্য হয়েছে, তা' হচ্ছে ঃ ধর্ম হোল ব্যক্তিবিশেষের ঘরোয়া ব্যাপার এবং মানুষের পার্থিবজীবনের সাথে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই।

ইসলাম মানুষের একত্বকে *[unity]* আত্মা ও বস্তুর সমন্বয়াতীত দ্বৈতবাদে *[duality]* বিভক্ত করে না। ইসলামে আল্লাহ ও বিশ্বপ্রকৃতি, আত্মা ও বস্তু, উপাসনাগার *[church]* ও রাষ্ট্র পরস্পরের পরিপূরক *[organic]* । মানুষ অন্যত্র অবস্থিত আত্মিক জগতের খাতিরে উপেক্ষণীয় এক অপবিত্র জগতের বাসিন্দা নয়। ইসলামের কাছে বস্তুই হচ্ছে আত্মা, যে স্থান ও কালের মধ্যে আপনাকে উপলব্ধি করে। ইউরোপ সম্ভবত ম্যানিসিয় চিন্তাধারা

[Manichaean Thought] থেকে আত্মা ও বস্তুর দ্বান্দ্বিক মতবাদকে নির্বিচারে গ্রহণ করেছিলো। ইউরোপের শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়কগণ আজ এ প্রারম্ভিক ভ্রান্তি উপলব্ধি করছেন, কিন্তু তাঁদের রাজনীতিকরা পরোক্ষভাবে দুনিয়াকে বাধ্য করছেন তাকে প্রশ্নাতীত মতবাদ বলে স্বীকার করে নিতে। আত্মিক ও পার্থিবের মধ্যে এই ভ্রান্তিমূলক বিভেদ সৃষ্টি ইউরোপের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক চিন্তাধারাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে এবং প্রকৃতপক্ষে তার ফল হয়েছে ইউরোপীয় রাষ্ট্র-জীবন থেকে খৃষ্টধর্মের পূর্ণ নির্বাসন। এর ফলে গড়ে উঠেছে মানবীয় স্বার্থের পরিবর্তে জাতীয় স্বার্থ দ্বারা প্রভাবিত পরস্পর সামঞ্জস্যহীন *[ill-adjusted]* রাষ্ট্রগোষ্ঠী। এই পরস্পর সামঞ্জস্যহীন রাষ্ট্রগোষ্ঠী খৃষ্টধর্মের নীতি ও বিশ্বাসসমূহকে পদদলিত করার পর আজ প্রয়োজন অনুভব করছে এক ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্রের, অর্থাৎ সেই ঐক্যের প্রয়োজনই সে অনুভব করছে, যা' খৃষ্টীয় গির্জা-প্রতিষ্ঠান বুনিয়াদীভাবে তাদেরকে দান করেছিলো, অথচ খৃষ্টের মানব-ভ্রাতৃত্বের আলোকে তার সংস্কার সাধনের পরিবর্তে লুথারের প্রেরণায় সে ঐক্যকে ধ্বংস করাই তারা যুক্তিযুক্ত মনে করেছিলো। ইসলামী জাহানে অবশ্য কোনো লুথারের আবির্ভাব এক অসম্ভব ব্যাপার ; কারণ এখানে মধ্যযুগীয় খৃষ্টধর্মের অনুরূপ কোন গির্জা-প্রতিষ্ঠান নেই, যার জন্য কোনো ধ্বংসকারীর প্রয়োজন হোতে পারে। ইসলামী জাহানে আমাদের রয়েছে এক বিশ্বজনীন রাষ্ট্র-শাসনব্যবস্থা এবং তার মূলনীতিসমূহ নাযিল হয়েছিলো বলে বিশ্বাস করা হয় ; কিন্তু আধুনিক দুনিয়ার সাথে আমাদের বিধানকর্তাদের সংযোগের অভাবে তার কাঠামোর নতুন সমন্বয় বিধান করে তাতে নতুনতর শক্তি সঞ্চার করবার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। ইসলামী জাহানে জাতীয় ধারণার চূড়ান্ত ভাগ্য কি হবে, তা' আমি বলতে পারি না। ইসলাম ইতিপূর্বে বিভিন্ন ভাবধারা-প্রকাশক বহু ধারণাকে যেমন আত্মস্থ করে নতুন রূপদান করেছে, তেমনি এই ধারণাকেও আত্মস্থ করে নতুন রূপদান করবে, না এই ধারণার প্রভাবে সে তার নিজস্ব কাঠামোর গতিশীল রূপান্তর বিধান করবে, সে সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা শক্ত। সেদিন লিডেনের (হল্যাণ্ড) অধ্যাপক ওয়েনসিঙ্ক আমার কাছে লিখেছেন : *'It seems to me that Islam is entering upon a crisis through which Christianity has been passing for more than a century. The great difficulty is how to save the foundations of religion when many antiquated nations have to be given up. It seems to me scarcely possible to state what the out come will be for christianity, still less what it will be for Islam'* — ' আমার মনে হয়, খৃষ্টধর্ম গত এক শতকের অধিককাল যে সংকট অতিক্রম করে চলেছে, ইসলামও তেমনি এক সংকট-পরিস্থিতিতে প্রবেশ করছে। যেমন বহু প্রাচীন ধারণাকে উচ্ছেদ করবার প্রয়োজন রয়েছে, তেমনি কি করে ধর্মের বুনিয়াদ বাঁচিয়ে রাখা যাবে, সেটাই হচ্ছে এক জটিল সমস্যা। খৃষ্টধর্মের জন্য কি পরিণাম প্রতীক্ষা করছে, তা' বলা আমার কাছে সম্ভব মনে হয় না, আরো অসম্ভব হচ্ছে ইসলামের পরিণাম নির্ধারণ করা।' বর্তমান মুহূর্তে জাতীয় ধারণা *[national idea]* মুসলিম দৃষ্টিভঙ্গিকে গোষ্ঠীকেন্দ্রিক করে তুলেছে এবং এম্নি করে বাস্তবক্ষেত্রে ইসলামের মানবীয় কার্যকলাপের গতি রুদ্ধ করছে। এই গোষ্ঠী-চেতনার *[racial consciousness]* জন্মলাভের ফলে

অন্যতর মানের জন্ম হোতে পারে এবং এমনকি, তা' ইসলামী মানের বিপরীতধর্মী হোতেও পারে।

আমি আশা করি, আমার এই সুস্পষ্ট তত্ত্বমূলক *[academic]* আলোচনার জন্য আপনারা আমায় ক্ষমা করবেন। নিখিল-ভারত মুসলিম লীগের এই অধিবেশনে ভাষণ দান করার জন্য আপনারা এমন একটি লোককে মনোনীত করেছেন, ভৌগোলিক সীমাবন্ধন থেকে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিকে মুক্ত করার জীবন্ত শক্তি হিসাবে ইস্‌লাম সম্পর্কে যে হতাশাবাদী নয়, ব্যক্তি ও রাষ্ট্র-জীবনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসাবে ধর্মের প্রতি যে আস্থা পোষণ করে এবং যার চূড়ান্ত বিশ্বাস যে, ইস্‌লাম নিজেই নিয়তির নিয়ামক এবং সে কোনো নিয়তির নির্দেশে চালিত হবে না। এই ধরনের মানুষ যে কোনো বিষয়কে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে না দেখে পারে না। আপনারা মনে করবেন না, আমি যে সমস্যার আভাস দিচ্ছি, তা' নিছক কাল্পনিক ব্যাপার। এ হচ্ছে একটি অত্যন্ত জীবন্ত ও বাস্তব সমস্যা, যার সম্পর্ক রয়েছে জীবন ও আচরণ-পদ্ধতি হিসাবে ইস্‌লামের উপাদানের সাথে। একমাত্র এরই সঠিক সমাধানের উপর নির্ভর করছে ভারতে সুনির্দিষ্ট সাংস্কৃতিক সত্তা হিসাবে আপনাদের ভবিষ্যত। আজকের দিনে ইস্‌লামের সম্মুখে যে সংকট-পরিস্থিতি এসে হাজির হয়েছে, আমাদের ইতিহাসে এর চাইতে বৃহত্তর সংকট ইস্‌লামের সম্মুখে আর কখনো আসেনি। একটি জাতির সম্মুখে তাদের সামাজিক কাঠামোর বুনিয়াদী নীতিসমূহ সংশোধন, পুনর্বিশ্লেষণ অথবা অগ্রাহ্য করার স্বাধীনতা অবলম্বনের পথ উন্মুক্ত হয়েছে, কিন্তু কোনো নতুন পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হবার আগে তারা কি করতে যাচ্ছে, সে সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে বিবেচনা করতে যাওয়ার অপরিহার্য প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। যেভাবে আমি এই জরুরী সমস্যার আলোচনা করছি, তাতে কারুর মনে করা উচিত হবে না যে, যাঁরা স্বতন্ত্র ধারায় চিন্তা করেন, আমি তাঁদের সাথে কলহ করতে চাই। আপনাদের একটি মুসলিম জনসমাবেশ এবং আমার মনে হয়, আপনারা ইস্‌লামের ভাবধারা ও আদর্শের প্রতি সত্যিকার আনুগত্য রক্ষা করতে আগ্রহান্বিত। সুতরাং আমার একমাত্র ইচ্ছা, বর্তমান পরিস্থিতিতে যা আমি সত্য বলে সততার সাথে বিশ্বাস করি, তা-ই সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা। কেবলমাত্র এই পন্থায়ই আমার পক্ষে সম্ভব হবে আমার নিজস্ব আলোক অনুযায়ী আপনাদের রাজনৈতিক কার্যকলাপের পথে আলোক সঞ্চার করা।

তা' হোলে আমাদের সমস্যা কি এবং তার তাৎপর্যই বা কি ? ধর্ম কি একটি ঘরোয়া ব্যাপার মাত্র ? আপনারা কি দেখতে চান যে, ইতিপূর্বে ইউরোপে খৃষ্টধর্ম যে পরিণতির সম্মুখীন হয়েছে, ইসলামী জাহানেও নৈতিক ও রাজনৈতিক আদর্শ হিসাবে ইসলাম সেই একই পরিণতি লাভ করুক ? ধর্মীয় মনোভাব যেখানে কোনো স্থান লাভ করে না, তেমনি ধরনের জাতীয় রাষ্ট্র-শাসনব্যবস্থা চালু করার জন্য রাষ্ট্র-শাসনব্যবস্থা হিসাবে ইসলামকে অগ্রাহ্য করে নৈতিক আদর্শ হিসাবে তাকে বাঁচিয়ে রাখা কি সম্ভব ? ভারতে যেখানে মুসলিম জনগণ সংখ্যালঘু হয়ে আছে, সেখানে এ প্রশ্নটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ধর্ম যে একটি ঘরোয়া ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, এ মতবাদ কোনো ইউরোপীয়ের মুখে বিস্ময়কর নয়। ইউরোপে সন্ন্যাসবাদী বিধান হিসাবে খৃষ্টধর্ম বস্তু জগতকে অস্বীকার করে এবং আত্মিক জগতের দিকে তার পূর্ণ

দৃষ্টিনিবদ্ধ করে বিশেষ যৌক্তিক চিন্তাধারার পথ ধরে তার সংশ্লিষ্ট মতবাদের দিকে চালিত হয়। রাসূলে করিমের (দঃ) যে ধর্মীয় অভিজ্ঞতা কোরআন শরীফে বর্ণিত হয়েছে, তার প্রকৃতি অবশ্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। নিছক জীবতাত্ত্বিক ঘটনা বলতে আমরা যা বুঝি এ কেবল সেই ধরনের অভিজ্ঞতা নয়—যা' অভিজ্ঞতা লাভকারীর নিজের ভিতরে ঘটে এবং সামাজিক পারিপার্শ্বিকতার উপর যার কোনো প্রতিক্রিয়া অপরিহার্য নয়। এ হচ্ছে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা *[individual experience]*, যা' সমাজবিধানের জন্ম দেয়। এর অব্যবহিত পরিণাম হচ্ছে সন্দেহমুক্ত, আইনগত ধারণা সহকারে একটি বিশেষ রাষ্ট্র-শাসনব্যবস্থার বুনিয়াদ *[fundamentals]* সৃষ্টি এবং তার মূল প্রত্যাদেশের ভিত্তিযুক্ত বলেই পৌরজীবনে তার তাৎপর্য ছোট করে দেখা চলে না, সুতরাং ইসলামের ধর্মীয় আদর্শ মৌলিক দিক দিয়ে তার সৃষ্ট সমাজবিধানের সাথে সম্পর্কযুক্ত। এক্‌কে অগ্রাহ্য করলে পরিণামে অপরকেও অগ্রাহ্য করতে হয়। সুতরাং জাতীয়ধারা সম্বলিত বিশেষ রাষ্ট্র-শাসনব্যবস্থা *[polity on national lines]* গড়ে তুলতে গেলে যেখানে তার অর্থ হয় ইসলামী সংহতির নীতিকে বিপর্যস্ত করা, যে কোনো মুসলিম সে ধরনের ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা চিন্তাও করতে পারে না।

এই সমস্যাই আজকের দিনের ভারতীয় মুসলিম জনগণের সামনে প্রত্যক্ষভাবে ধরা দিচ্ছে। রেনান বলেন ঃ *'Man is enslaved neither by his race, nor by his religion, nor by the course of rivers, nor by the direction of mountain ranges. A great aggregation of men, sane of mind and warm of heart, creates a moral consciousness which is called a nation.'* — 'মানুষ তার বংশ, তার ধর্ম, নদীসমূহের গতি অথবা পর্বতমালার দিক-নির্দেশের দাস হয়ে থাকে না। এক বিরাট মানব-সমষ্টি মানসিক সুস্থতা ও অন্তরের উষ্ণতা সহকারে যে নৈতিক চেতনা সৃষ্টি ও নবতর মানসিক আবেগের সম্পদে সমৃদ্ধ করার দীর্ঘ ও কঠোর ধারা অতিক্রম করার প্রয়োজন হোলেও এই ধরনের সংগঠন সম্পূর্ণ সম্ভব। কবীরের শিক্ষা ও আকবরের ধর্মবিশ্বাস দেশের জনগণের কল্পনা আকৃষ্ট করল ভারতে এ সম্ভাবনা সত্যে পরিণত হোত। অভিজ্ঞতায় অবশ্য দেখা যায় যে, ভারতের বিভিন্ন জাতীয় দল *[caste units]* ও ধর্মীয় দলের *[religious units]* মধ্যে তাদের নিজ নিজ স্বতন্ত্র সত্তাকে এক বৃহত্তর সমগ্রে বিলীন করে দেবার কোনো প্রবণতার আভাস পাওয়া যায় না। প্রত্যেক দল *[group]* তার সমষ্টিগত অস্তিত্ব সম্পর্কে তীব্রভাবে সচেতন। রেনানের ধারণা অনুযায়ী জাতির *[nation]* উপাদান সন্নিবেশ করার মতো নৈতিক চেতনা গড়ে তোলার জন্য যে মূল্য দেবার প্রয়োজন, ভারতের জাতিসমূহ সে মূল্য দিতে প্রস্তুত নয়। সুতরাং এক ভারতীয় জাতির ঐক্য খুঁজতে হবে বহুকে অস্বীকার করার ভিতরে নয়, বরং বহুর পারস্পরিক ঐক্য ও সহযোগিতার ভিতরে। সত্যিকার রাজনীতিজ্ঞান সত্যকে অস্বীকার করতে পারে না, তা' যতোই পীড়াদায়ক হোক্। যেরূপ পরিস্থিতির অস্তিত্ব নেই, তার অস্তিত্ব কল্পনা করাই একমাত্র পন্থা নয়, বরং একমাত্র পন্থা হচ্ছে বাস্তব সত্যকে স্বীকার করা এবং তাকে আমাদের সর্বোত্তম কল্যাণের জন্য ব্যবহার করা। এদিক দিয়ে ভারতীয় ঐক্য আবিষ্কার করার উপরই প্রকৃতপক্ষে ভারতের ও এশিয়ার ভাগ্য নির্ভর করে। ভারতই হচ্ছে ক্ষুদ্রতর এশিয়া। তার অধিবাসীদের অংশবিশেষের

সাংস্কৃতিক সাদৃশ্য রয়েছে এশিয়ার পূর্ব অঞ্চলের জাতিসমূহের সাথে এবং অপর অংশের সাদৃশ্য রয়েছে মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ার জাতিসমূহের সাথে। ভারতে যদি কোনো কার্যকর সহযোগিতার নীতি খুঁজে বের করা যায়, তা' হোলে তা' এই প্রাচীন দেশে শান্তি ও পারস্পরিক সদিচ্ছা আনয়ন করবে—যে দেশ তার অধিবাসীদের সহজাত অক্ষমতার কারণের চাইতেও বেশী করে তার ঐতিহাসিক অবস্থানের কারণে এত দীর্ঘকাল দুঃখ ভোগ করেছে। এই নীতিই একই সময়ে এশিয়ার সম্পূর্ণ রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করবে।

এটা অবশ্য অত্যন্ত বেদনাদায়ক যে, এমনি একটা অভ্যন্তরীণ ঐক্যের নীতি খুঁজে বের করার জন্য আমাদের এতদিনের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। কেন সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হোল ? সম্ভবত আমরা পরস্পরের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করি এবং ভিতরে ভিতরে পরস্পারের উপর আধিপত্য করার লক্ষ্য পোষণ করি। অবস্থাবিশেষে আমরা যেসব একচেটিয়া অধিকার লাভ করেছি, পারস্পরিক সহযোগিতার উচ্চতর স্বার্থের খাতিরেও আমরা সম্ভবত তা'ত্যাগ করতে পারছি না এবং আমরা আমাদের আত্মকেন্দ্রিকতাকে *[egoism]* গোপন করছি জাতীয়তাবাদের আবরণে। বাইরে আমরা মহৎ অন্তঃকরণবিশিষ্ট দেশাত্মবোধের প্রেরণা যোগাই, কিন্তু ভিতরের দিকে আমরা জাতি বা গোষ্ঠীবিশেষের মতোই সংকীর্ণমনা। সম্ভবত আমরা স্বীকার করতে চাই না যে, প্রত্যেক দলেরই তার নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য অনুযায়ী অবাধ আত্মবিকাশের অধিকার রয়েছে। কিন্তু আমাদের ব্যর্থতার কারণ যা-ই হোক, আমি এখনো আশান্বিত। ঘটনাপ্রবাহ কোনো বিশেষ ধরনের অভ্যন্তরীণ ঐক্য প্রতিষ্ঠার দিকেই প্রবাহিত হচ্ছে বলে মনে হয়। মুসলিম মন সম্পর্কে আমি যতোটা পর্যবেক্ষণ করতে সক্ষম হয়েছি, তা'তে আমার একথা ঘোষণা করতে কোনো দ্বিধা নেই যে, ভারতীয় মুসলিম তার নিজস্ব ভারতীয় আবাসভূমিতে নিজস্ব তমদ্দুন ও ঐতিহ্যের ধারা অনুযায়ী পূর্ণ ও অবাধ আত্মবিকাশের অধিকারী, স্থায়ী সাম্প্রদায়িক মীমাংসার বুনিয়াদ হিসাবে এই সত্য স্বীকৃত হোলে সে ভারতের আযাদীর জন্য তার সর্বস্ব পণ করতে প্রস্তুত থাকবে। প্রত্যেক দলই তার নিজস্ব ধারায় অবাধ আত্মবিকাশের অধিকারী, এই নীতি কোনো সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার মনোভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত নয়। সাম্প্রদায়িকতার অস্তিত্ব অনস্বীকার্য। যে সম্প্রদায় অপরের প্রতি অসদিচ্ছার মনোভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত, সে নীচ ও ঘৃণার্হ। অপর সম্প্রদায়সমূহের রীতি-নীতি, কানুন, ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসনের প্রতি আমি উচ্চতম শ্রদ্ধা পোষণ করি। এমনকি, কোরআন শরীফের শিক্ষা অনুযায়ী প্রয়োজন হোলে তাদের উপাসনাগারসমূহ সংরক্ষণ করাও আমার কর্তব্য। তথাপি যে সাম্প্রদায়িক দল আমার জীবন ও আচরণের উৎস এবং যার ধর্ম, যার সাহিত্য, যার চিন্তাধারা, যার তমদ্দুন আমায় বাস্তবে রূপায়ণ করেছে এবং আমার চেতনায় যার সম্পূর্ণ অতীত এক জীবন্ত কার্যকর উপাদান হিসাবে পুনরুজ্জীবন লাভ করেছে, সেই বিশেষ সাম্প্রদায়িক দলটিকে আমি ভালোবাসি। এমনকি, নেহ্রু রিপোর্টের প্রণেতাগণও সাম্প্রদায়িকতার এই উচ্চতর বৈশিষ্ট্যের মূল্য স্বীকার করেন। সিন্ধুর পৃথকীকরণের আলোচনা করতে গিয়ে তাঁরা বলেন : *'To say from the larger*

view-point of nationalism that no communal provinces should be created, is, in a way, equivalent to saying from the still wider international view-point that there should be not separate nations. Both these statements have a measure of truth in them. But the staunchest internationalist recognises that without the fullest national autonomy it is extraordinarily difficult to create the international state, So also without the fullest cultural autonomy, and communalism in its better aspect is culture, it will be difficult to create a harmonious nation.' –

'কোনো সাম্প্রদায়িক প্রদেশ সৃষ্ট হওয়া উচিত নয়, জাতীয়তাবাদের বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এরূপ বলারই সমার্থক যে, কোনো স্বতন্ত্র জাতির অস্তিত্ব থাকা উচিত নয়। এই উভয় উক্তির মধ্যেই কতকটা সত্য নিহিত রয়েছে। কিন্তু সর্বাধিক নিষ্ঠাবান আন্তর্জাতিকতাবাদীও স্বীকার করেন যে, পূর্ণতম জাতীয় স্বাধিকার ব্যতীত আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র গড়ে তোলা অত্যধিক দুরূহ। তেমনি পূর্ণতম সাংস্কৃতিক স্বাধিকার ব্যতীত এক ঐক্যবদ্ধ জাতি গড়ে তোলাও কঠিন, কেননা শ্রেষ্ঠতর বৈশিষ্ট্য সহকারে সাম্প্রদায়িকতার নামই হচ্ছে সংস্কৃতি।'

সুতরাং ভারতের মতো দেশে এক ঐক্যবদ্ধ সামগ্র্যগঠনের জন্য উচ্চতর বৈশিষ্ট্য সহকারে সাম্প্রদায়িকতা অপরিহার্য। ভারতীয় সমাজের ইউনিটসমূহ ইউরোপীয় দেশসমূহের মতো আঞ্চলিক নয়। ভারত বিভিন্ন ভাষাভাষী ও বিভিন্ন ধর্মের অনুযায়ী বিভিন্ন মানব-সমষ্টির সমন্বয়ে গঠিত এক মহাদেশ। তাদের আচরণ এক সাধারণ গোষ্ঠী-চেতনা দ্বারা মোটেই নির্ধারিত নয় *[not at all determined by a common rance consciousness]*। এমনকি, হিন্দুরাই এক সমজাতীয় *[homogeneous]* মানব-গোষ্ঠী গড়ে তোলেনি। সাম্প্রদায়িক দলসমূহের অস্তিত্ব স্বীকার না করে ভারতে ইউরোপীয় গণতন্ত্রের নীতি প্রয়োগ করা যেতে পারে না। সুতরাং ভারতের ভিতরে এক মুসলিম ভারত গড়ে তোলার জন্য উত্থাপিত মুসলিম দাবী যুক্তিসংগত। আমার মতে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় মুসলিম সম্মেলনের *[All Parties Muslim Conference]*, গৃহীত প্রস্তাব সম্পূর্ণরূপে এক ঐক্যবদ্ধ সামগ্র্যগঠনেরই মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত এবং তা' তার অন্তর্গত বিভিন্ন সাম্প্রদলের নিজ নিজ সত্তাকে বাধাগ্রস্ত করার পরিবর্তে বরং তাদের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনাকে পূর্ণ বিকশিত করার পরিপূর্ণ সুযোগ তাদেরকে দেবে। এই সভা উক্ত প্রস্তাবে বিধৃত মুসলিম দাবীসমূহ জোরের সাথে সমর্থন করবেন, সে সম্পর্কে আমার কোনো সন্দেহ নেই। ব্যক্তিগতভাবে আমি উক্ত প্রস্তাবে বিধৃত দাবীসমূহের চাইতেও কিছুটা বেশী অগ্রসর হোতে চাই। আমি পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্তানকে এক অখণ্ড রাষ্ট্রে গ্রথিত দেখতে চাই। বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিতর অথবা বৃটিশ সাম্রাজ্যের বাইরে স্বায়ত্ত-শাসনাধিকার, এক

ঐক্যবদ্ধ *[consolidated]* উত্তর-পশ্চিম ভারতীয় মুসলিম রাষ্ট্র গঠন আমার কাছে মুসলমানদের, অন্তত উত্তর-পশ্চিম ভারতের মুসলমানদের চূড়ান্ত ভাগ্যলিপি বলে মনে হয়। প্রস্তাবটি নেহ্‌রু কমিটির সামনে পেশ করা হয়েছিলো। এই প্রস্তাব কার্যকর হলে তা' হবে বাস্তবে পরিচালনার পক্ষে অত্যন্ত অনুপযোগী রাষ্ট্র *[a very unwieldy state]*, এই যুক্তিতে তারা প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য করেছিলেন। আয়তনের দিক বিবেচনা করলে এ কথা সত্য; জনসংখ্যার দিক দিয়ে এই প্রস্তাবে পরিকল্পিত রাষ্ট্র বর্তমানের কোনো কোনো ভারতীয় প্রদেশ অপেক্ষাও ছোট হবে। আম্বালা বিভাগও সম্ভবত অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ কতিপয় জেলার বহির্ভুক্তি তাকে পরিধির দিক দিয়ে আরো অল্পপরিসর ও অধিকতর মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ করবে এবং তার ফলে এই নবগঠিত রাষ্ট্র তার এলাকার মধ্যে অমুসলিম সংখ্যালঘুদেরকে কার্যকরভাবে সংরক্ষণের অধিকতর সামর্থ্য লাভ করবে। এই ধারণায় হিন্দু বা বৃটিশ জনগণের কোনোরূপ আতংকের কারণ নেই। ভারত দুনিয়ার সর্ববৃহৎ মুসলিম দেশ। এ দেশে সাংস্কৃতিক শক্তি হিসাবে ইসলামের জীবন সবচাইতে বেশী করে নির্ভর করে তাকে এক নির্দিষ্ট অঞ্চলে কেন্দ্রীভূতকরণ *[centralisation in a specified territory]*। ভারতীয় মুসলমানদের যে সর্বাধিক জীবন্ত অংশ বৃটিশ সরকারের অসংগত আচরণ সত্ত্বেও তাদের সামরিক ও পুলিশ বিভাগের চাকরি দ্বারা এ দেশে বৃটিশ শাসন চালু রাখা সম্ভব করেছে, তাদেরকে এমনি করে কেন্দ্রীভূত করার পরিণামে ভারতের ও এশিয়ার সমস্যা সমাধান হবে। এর ফলে তাদের দায়িত্ববোধ তীব্রতর হবে এবং তাদের দেশাত্মবোধের মনোভাব প্রবলতর হবে। এমনি করে ভারতীয় রাষ্ট্রের ভিতর পূর্ণ সুবিধা লাভ করলে উত্তর-পশ্চিম ভারতীয় মুসলিম জনগণ বিদেশী হামলার বিরুদ্ধে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ রক্ষক বলে প্রমাণিত হবে। সে হামলা ধারণার *[ideas]* হোক্ অথবা বেয়নেটেরই হোক। শতকরা ৫৬ ভাগ মুসলিম জনসংখ্যা নিয়ে পাঞ্জাব ভারতীয় সামরিক বাহিনীর শতকরা ৫৪ ভাগ লোক সরবরাহ করে থাকে। নেপালের স্বাধীন রাষ্ট্র থেকে নিযুক্ত ১৯ হাজার গুর্খাকে বাদ দিলে পাঞ্জাবী সৈন্যদের সংখ্যা দাঁড়ায় সমগ্র ভারতীয় সামরিক বাহিনীর শতকরা ৬২ ভাগ। এই শতকরা হারের মধ্যে ভারতীয় সামরিক বাহিনীতে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তান থেকে সংগৃহীত প্রায় ৬ হাজার সশস্ত্র সৈন্যকে ধরা হয়নি। বৈদেশিক হামলা থেকে ভারতের সংরক্ষণ ব্যবস্থায় উত্তর-পশ্চিম ভারতীয় মুসলিমদের সম্ভাবনার হিসাব এ থেকে আপনারা সহজেই করে নিতে পারেন। রাইট অনারেবল মিঃ শ্রীনিবাস শাস্ত্রী মনে করেন, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এলাকায় স্বায়ত্তশাসিত মুসলিম রাষ্ট্র সৃষ্টির জন্য মুসলিমদের এই দাবীর পশ্চাতে রয়েছে 'জরুরী অবস্থায় ভারত সরকারের উপর চাপ দেবার উপায় অর্জনের জন্য' *[to acquire means of exerting pressure in emergencies on the Government of India]* তাদের ইচ্ছা। আমি তাঁকে স্পষ্টভাবে বলতে পারি, তিনি যে ধরনের উদ্দেশ্য

আমাদের প্রতি আরোপ করেন, মুসলিম দাবী তা' থেকে উদ্‌ভূত নয়; এর মূলে রয়েছে অবাধ আত্মবিকাশের অকৃত্রিম আকাঙ্ক্ষা, যা' সমগ্র ভারতের উপর স্থায়ী সাম্প্রদায়িক আধিপত্য লাভের উদ্দেশ্যে জাতীয়তাবাদী হিন্দু রাজনীতিকদের পরিকল্পিত ইউনিটধারী ধরনের শাসনব্যবস্থায় প্রকৃতপক্ষে অসম্ভব।

হিন্দুদেরও এরূপ কোনো ভয়ের কারণ নেই যে, স্বায়ত্তশাসিত মুসলিম রাষ্ট্র সৃষ্টির অর্থ হবে এইরূপ রাষ্ট্রে এক ধরনের ধর্মীয় শাসন *[religious rule]* প্রবর্তন। ইসলামের ক্ষেত্রে ধর্মশব্দটি যে অর্থে প্রয়োগ করা যেতে পারে, তা' আমি আগেই আপনাদেরকে বলেছি। প্রকৃতপক্ষে ইসলাম কোনো যাজকতন্ত্র *[church]* নয়। এ হচ্ছে রুশোর এ ধরনের চিন্তা করার বহুপূর্বে নিয়মবদ্ধ সমাজ ব্যবস্থা *[contractual organism]* হিসাবে পরিকল্পিত এক রাষ্ট্র এবং তা' এমন এক নৈতিক আদর্শ *(ethical ideal)* দ্বারা অনুপ্রাণিত, যাতে মানুষকে বিশ্বের কোনো বিশেষ অংশ দ্বারা পরিচিত ভূমিকেন্দ্রিক প্রাণী *[earth-rooted creature]* হিসাবে ধরা হয় না, বরং তাদেরকে ধরা হয় সামাজিক সংগঠনের *[social mechanism]* নীতি অনুযায়ী আত্মিক সত্তা হিসাবে এবং সেই সংগঠনের জীবন্ত অংশ হিসাবে তার অধিকার ও কর্তব্য নির্ধারিত রয়েছে। কিছুকাল আগে *'টাইম্‌স্ অব্ ইণ্ডিয়া'* ভারতীয় ব্যাংকিং ইঙ্কুয়ারী কমিটি সম্পর্কে এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে যা' বলেছিলেন, তা' থেকে মুসলিম রাষ্ট্রের প্রকৃতি বিচার করা যেতে পারে। পত্রিকাটিতে উল্লেখ করা হয়েছিলো: *'In ancient India, the State framed laws regulating the rates of interest but in Muslim times, although Islam clearly forbids the realisation of interest on money loaned, Indian Muslim States imposed no testrictions on such rates'* — প্রাচীন ভারতে রাষ্ট্র সূদের হার নিয়ন্ত্রিত করে আইন প্রণয়ন করতো, কিন্তু ইসলামে ঋণ হিসাবে নিয়োজিত অর্থের সূদগ্রহণ সুস্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ হোলেও ভারতীয় মুসলিম রাজ্যসমূহ এইরূপ হারের উপর কোনোরূপ নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেননি।' সুতরাং আমি ভারতের ও ইসলামের শ্রেষ্ঠ স্বার্থের খাতিরে একটি ঐক্যবদ্ধ *[consolidated]* মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের দাবী জানাচ্ছি। ভারতের পক্ষে এর ফলে সম্ভব হবে *[power]* অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার ভারসাম্য বিধান করে নিরাপত্তা ও শান্তি কায়েম করা; ইসলাম এতে আরব সাম্রাজ্যবাদের ছাপ থেকে মুক্তি লাভের এবং তার কানুন, তার শিক্ষা ও তার সংস্কৃতিকে সুসংহত করে তার নিজস্ব বুনিয়াদী ভাবধারা ও আধুনিক কালের ভাবধারার সাথে তাদের ঘনিষ্ঠ সংযোগ বিধানের সুযোগ পাবে।

সুতরাং এটা সুস্পষ্ট যে, ভারতে আবহাওয়া, জাতি, ভাষা, ধর্মমত ও সামাজিক পদ্ধতির অসংখ্যবিধ বৈচিত্র্য বিবেচনায় ভাষা, জাতি, ইতিহাস, ধর্মের ঐক্য অর্থনৈতিক স্বার্থের সাদৃশ্যের বুনিয়াদে স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্রসমূহ গড়ে তোলাই হচ্ছে ভারতে এক স্থায়ী শাসনতান্ত্রিক কাঠামো কায়েম করবার একমাত্র সম্ভাব্য পন্থা। সাইমন রিপোর্ট অনুযায়ী ফেডারেশনের ধারণায় জনপ্রিয় পরিষদ *[popular assembly]* হিসাবে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদ তুলে দিয়ে তাকে ফেডারেল রাষ্ট্রসমূহের এক প্রতিনিধি পরিষদে পরিণত করা। আমি যা' বলেছি, সেই অনুযায়ী এতে অঞ্চল পুনর্বিভাগেরও প্রয়োজন হবে। রিপোর্টে উভয়বিধ সুপারিশ রয়েছে। এই ব্যাপার সম্পর্কে রিপোর্টে প্রকাশিত মনোভাব আমি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি এবং প্রস্তাব করি যে, সাইমন রিপোর্টের সুপারিশ অনুযায়ী অঞ্চল পুনর্বিভাগের ক্ষেত্রে দু'টি শর্ত অবশ্য পূরণ করতে হবে। নতুন শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের আগেই অবশ্য এ কার্যটি করতে হবে এবং তা' এমনভাবে পরিকল্পিত হবে, যাতে সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান চূড়ান্তভাবে করা যেতে পারে। সঠিক পুনর্বিভাগের ফলে ভারতের শাসনতান্ত্রিক বিতর্কের ক্ষেত্রে যুক্ত ও পৃথক নির্বাচনের প্রশ্ন স্বতঃই বিলুপ্ত হবে। হিন্দু জাতি মনে করে যে, পৃথক নির্বাচন জাতীয়তাবাদের ভাবধারার পরিপন্থী, কারণ 'জাতি' *[nation]* বলতে সে বোঝে এক ধরনের সর্বজনীন সংযোগ, যাতে কোনো সাম্প্রদায়িক সত্তা *[communal entity]* তার নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য *[private individuality]* বজায় রাখতে পারবে না। এরূপ পরিস্থিতির অস্তিত্ব অবশ্য নেই। তার অস্তিত্ব থাকা বাঞ্ছনীয়ও নয়। ভারত হচ্ছে জাতি ও ধর্মের বহুবিধ বৈচিত্র্যের দেশ। এর সাথে মুসলিমদের, বিশেষ করে পাঞ্জাবের মুসলিমদের সাধারণ অর্থনৈতিক হীনতা, তাদের সীমাহীন ঋণ এবং বর্তমানে গঠিত কয়েকটি প্রদেশে তাদের অপ্রচুর সংখ্যাগরিষ্ঠতা মিলিয়ে বিবেচনা করুন, তা'হলেই আমাদের পৃথক নির্বাচন পদ্ধতি বজায় রাখার জন্য উদ্বেগের তাৎপর্য সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন। এরূপ একটি দেশে এবং এরূপ পরিস্থিতিতে আঞ্চলিক নির্বাচন দ্বারা সর্বপ্রকার স্বার্থের উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব লাভ করা যায় না এবং তাতে অবশ্যম্ভাবীরূপে মুষ্টিমেয় লোকের শাসন *[oligarchy]* কায়েম হোতে বাধ্য। যদি এমনভাবে প্রদেশগুলোর সীমানা চিহ্নিত করা যায়, যাতে অপেক্ষাকৃত সমজাতীয় সম্প্রদায়সমূহের ভাষাগত, গোষ্ঠীগত, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ঐক্য *[linguistic, racial, culturaal and religious unity]* কায়েম করা সম্ভব হবে, তা'হলে নিছক আঞ্চলিক নির্বাচন পদ্ধতিতেও ভারতীয় মুসলিমদের কোনো আপত্তি থাকতে পারে না।

কিন্তু কেন্দ্রীয় ফেডারেল রাষ্ট্রের *[Central Federal State]* ক্ষমতার প্রশ্ন সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে ভারতীয় পণ্ডিতদের ও ইংল্যাণ্ডের পণ্ডিতদের প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্রে উদ্দেশ্যের সূক্ষ্ম পার্থক্য *[subtle difference]* রয়েছে। বর্তমানে যেভাবে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব রয়েছে, ভারতীয় পণ্ডিতরা তাতে নাড়াচাড়া দিতে চান না। তাঁদের কাম্য হচ্ছে যে, কেন্দ্রীয় আইনসভাকে তাঁরা অব্যাহত রাখবেন, তার কাছে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের পূর্ণ দায়িত্ব থাকবে এবং সেখানে মনোনীত সদস্যের অস্তিত্ব না থেকে তাদেরই প্রতিনিধিত্ব আরো বলিষ্ঠ হবে। পক্ষান্তরে, ইংল্যাণ্ডের পণ্ডিতরা উপলব্ধি করেন যে, দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার পথে আরো কিছুটা অগ্রসর হলে কেন্দ্রে গণতন্ত্র প্রবর্তন তাদের স্বার্থের প্রতিকূলে কাজ করবে এবং

বর্তমানে তারা যে ক্ষমতা ভোগ করছেন, তার সবটুকুই কেন্দ্রের হাতে চলে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে তাই তাঁরা গণতন্ত্রের প্রয়োগক্ষমতা কেন্দ্র থেকে প্রদেশসমূহের উপর ন্যস্ত করেছেন। নিঃসংশয়ে তাঁরা ফেডারেশনের নীতি প্রবর্তন করেছেন এবং বিশেষ প্রস্তাব পেশ করে তার প্রারম্ভ সূচনা করেছেন; তথাপি মুসলিম ভারতের দৃষ্টিতে যে-সব বিবেচনার বুনিয়াদে এই নীতির মান নির্ধারিত হচ্ছে, তা' থেকে তাঁদের বিবেচনা সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। মুসলিম জনগণ ফেডারেশন দাবী করে, কারণ এ-ই হচ্ছে বিশেষ করে ভারতের সর্বাধিক জটিল সমস্যার অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান। রয়াল কমিশনের সদস্যবৃন্দের ফেডারেশন সম্পর্কিত মনোভাব নীতির দিক দিয়ে সঠিক হলেও তাঁদের লক্ষ্য ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত রাজ্যসমূহের *[federal states]* দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা বলে মনে হচ্ছে না। প্রকৃতপক্ষে, ভারতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা দ্বারা বৃটিশের পক্ষে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, তার হাত থেকে রেহাই পাবার পন্থাউদ্‌ভাবনের বেশী এতে কিছুই করা হয়নি এবং এতে সাম্প্রদায়িক সমস্যাকে পূর্ববৎ অমীমাংসিত রেখে তাকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করা হয়েছে।

সুতরাং এটা সুস্পষ্ট যে, প্রকৃত ফেডারেশনের কথা বলতে গেলে তাৎপর্যের দিক দিয়ে সাইমন রিপোর্টে প্রকৃতপক্ষে ফেডারেশনের নীতির বিপরীত ব্যবস্থা করা হয়েছে। নেহ্‌রু রিপোর্ট কেন্দ্রীয় পরিষদের *[Central Assembly]* হিন্দু সংখ্যাধিক্য উপলব্ধি করে এক ইউনিটারী ধরনের সরকার প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত করে ফেলেছেন। কারণ, এই ব্যবস্থায় সারা ভারতে হিন্দু আধিপত্য কায়েম রাখা সম্ভব হবে; সাইমন রিপোর্টে কৃত্রিম ফেডারেশনের সূক্ষ্ম আবরণের অন্তরালে বৃটিশ আধিপত্য অক্ষুন্ন রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর আংশিক কারণ হচ্ছে বৃটিশ জাতি এতকাল ধরে যে ক্ষমতা ভোগ করে এসেছে, সে ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়াতে তারা স্বাভাবিকভাবেই অনিচ্ছুক এবং তার আংশিক কারণ হচ্ছে, ভারতে আন্তঃ-সাম্প্রদায়িক সমঝোতা না হলে সে ক্ষমতা তাদের নিজের হাতে রাখার পক্ষে একটি টেকসই অজুহাত খাড়া করা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে। স্বায়ত্তশাসিত ভারতে ইউনিটারী সরকার প্রবর্তন আমার মতে সোজা কথায় অভাবনীয়। যাকে বলে *'রেসিডুয়ারী ক্ষমতা'*, তা' সম্পূর্ণরূপে স্বায়ত্তশাসিত রাজ্যসমূহের উপর ন্যস্ত করতে হবে এবং ফেডারেল রাজ্যগুলোর প্রকাশ্য স্বাধীন সম্মতিক্রমে প্রদত্ত ক্ষমতাই কেবল কেন্দ্রীয় ফেডারেল স্টেটের এখ্‌তিয়ারভুক্ত থাকবে। সত্যিকার ফেডারেশনের নীতি অস্বীকৃত হবে অথবা যাতে মুসলিম জনগণকে একটি স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সত্তা হিসাবে স্বীকার করা না হবে, ভারতীয় মুসলিম জনগণকে তাতে সম্মতি দান করতে আমি কখনো উপদেশ দেবো না।

সম্ভবত বৃটিশ কর্তৃক এই পরিবর্তনের সর্বাধিক কার্যকর পন্থা আবিষ্কৃত হবার দীর্ঘকাল পূর্বেই কেন্দ্রীয় সরকারের কাঠামোয় পরিবর্তন সাধনের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিলো। সে কারণেই বরং খানিকটা বিলম্বে ঘোষণা করা হয়েছিলো যে, গোল টেবিল বৈঠকে ভারতীয় রাজন্যবর্গের অংশগ্রহণ অপরিহার্য। ভারতীয় জনগণের, বিশেষ করে সংখ্যালঘুদের কাছে এ এক ধরনের বিস্ময়কর ব্যাপার যে, ভারতীয় রাজন্যবর্গ গোল টেবিল বৈঠকে সর্বভারতীয় ফেডারেশনে যোগদানের পক্ষে নাটকীয়ভাবে সম্মতি জানিয়েছেন এবং তার ফলে যে হিন্দু প্রতিনিধিরা ইউনিটারী ধরনের সরকার প্রতিষ্ঠার পক্ষে সমর্থনে কোনোরূপ আপোষ করতে রাজী ছিলেন

না, তাঁরাও ফেডারেল পরিকল্পনার প্রস্তাবে নির্বিকার সম্মতি দিয়েছেন। এমনকি, যে মিঃ শাস্ত্রী মাত্র কয়েকদিন আগে ভারতের জন্য একটি ফেডারেল পরিকল্পনার সুপারিশ করায় স্যার জনের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন, তিনিও আকস্মিকভাবে তার মত পরিবর্তন করে ফেললেন এবং বৈঠকের প্রকাশ্য অধিবেশনে তার মানসিক পরিবর্তন ঘোষণা করে ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রীকে তার উপসংহার বক্তৃতায় একটা অত্যধিক চমকপ্রদ মন্তব্য করবার সুযোগ দিলেন। যে বৃটিশ সম্মেলনে ভারতীয় রাজন্যবর্গের অংশ কামনা করেছিলেন এবং যে হিন্দুরা অকুণ্ঠচিত্তে সর্বভারতীয় ফেডারেশনের বিবর্তন মেনে নিয়েছেন, তাদের উভয়ের কাছে এসব ব্যাপারের একটা বিশেষ অর্থ রয়েছে। আসল ব্যাপার হচ্ছে যে, ভারতীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে মাত্র কয়েকজন মুসলিম, ফেডারেশন পরিকল্পনায় তাদের অংশগ্রহণের ফলে দু'টো উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে। একদিকে এতে সর্ব-ভারতীয় ফেডারেল এসেম্বলীতে হিন্দুদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ হবে। আমার মনে হয়, রাজন্যবর্গের মধ্যস্থতায় বৃটিশ রাজনীতিকরা চাতুর্যের সাথে কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের ব্যাপারে হিন্দু-মুসলিম মতানৈক্যের সুবিধা গ্রহণ করছেন এবং রাজন্যবর্গও দেখতে পাচ্ছেন যে, এই পরিকল্পনায় তাদের স্বেচ্ছাতন্ত্রী শাসন *[despotic rule]* কায়েম রাখার পক্ষে উৎকৃষ্টতর নিরাপত্তার সম্ভাবনা রয়েছে। মুসলিম জনগণ যদি এই ধরনের পরিপল্পনায় নীরব সম্মতি জ্ঞাপন করে, তার ফলে সোজাসুজি ভারতে রাজনৈতিক সত্তা হিসাবে তাদের সমাপ্তি ত্বরান্বিত হবে। কেন্দ্রীয়-ফেডারেল এসেম্বলীতে বৃহত্তম দল হিসারে হিন্দু রাজন্যবর্গ দ্বারাই এভাবে সৃষ্ট ভারতীয় ফেডারেশনের নীতি নিয়ন্ত্রিত হবে। সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের *[Imperial Concern]* ক্ষেত্রে তাঁরা সব সময়েই সরকারকে সমর্থন করবেন এবং দেশের অভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থায় তাঁরা হিন্দু প্রাধান্য বজায় রাখার ও তাকে বলিষ্ঠ করায় সাহায্য করবেন। অন্য কথায়, এই পরিকল্পনার লক্ষ্য মনে হচ্ছে হিন্দু ভারত ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে এক ধরনের সমঝোতা—তোমরা আমায় ভারতে চিরস্থায়ীভাবে কায়েম করে রাখ, আর তার প্রতিদানে আমি তোমাদেরকে অন্যান্য ভারতীয় সম্প্রদায়কে স্থায়ী দাসত্বে আবদ্ধ করে রাখার জন্য হিন্দু একনায়কত্বের *[Hindu Oligarchy]* অধিকার দান করছি। সুতরাং যদি ভারতীয় প্রদেশসমূহকে সত্যিকার স্বায়ত্তশাসিত রাজ্যে রূপান্তরিত করা না হয়, তা'হলে ভারতীয় ফেডারেশন পরিকল্পনায় রাজন্যবর্গের অংশগ্রহণের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কেবলমাত্র একথাই বলতে হবে যে, এটা হচ্ছে প্রকৃত ক্ষমতা হস্তচ্যুত না করে সংশ্লিষ্ট সকল দলকে খুশী করার জন্য বৃটিশ রাজনীতিকদের সুচতুর পরিকল্পনা। তাঁরা চান মুসলিম জনগণকে ফেডারেশন কথাটি দিয়ে খুশী করতে, হিন্দুদেরকে কেন্দ্রে সংখ্যাগরিষ্ঠতা দিয়ে এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদেরকে–তারা রক্ষণশীল *[Tory]* হোক অথবা শ্রমিক দলীয় *[Labourite]* হোক—সত্যিকার ক্ষমতার সারবস্তু দিয়ে খুশী করতে।

ভারতে হিন্দু রাজ্যের সংখ্যা মুসলিম রাজ্যের সংখ্যা থেকে বহুগুণে অধিক এবং দেখার ব্যাপার হচ্ছে, বৃটিশ ভারত ও ভারতীয় দেশীয় রাজ্য থেকে গৃহীত প্রতিনিধিবর্গকে শতকরা ৩৩ ভাগ আসন লাভের দাবী মেটানো হবে। আমি আশা করি, গোল-টেবিল বৈঠকে আলোচিত ফেডারেল পরিকল্পনার তাৎপর্য সম্পর্কে মুসলিম প্রতিনিধিবৃন্দ পূর্ণরূপে অবহিত রয়েছেন। প্রস্তাবিত সর্বভারতীয় ফেডারেশনে মুসলিম প্রতিনিধিত্বের প্রশ্ন এখনো আলোচনা

করা হয়নি। রয়টারের সংক্ষিপ্ত বিবরণীতে বলা হয়েছে : *'The interim report contemplates two chambers in the federal legislature, each containging representatives of both of British India and States, the proportion of which will be a matter of subsequent consideration under the heads which have not yet been referred to the Sub-Committee.'* —অন্তর্বর্তী রিপোর্টে ফেডারেল আইনসভায় দু'টি পরিষদের পরিকল্পনা করা হয়েছে এবং তার প্রত্যেকটিতে বৃটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যসমূহের প্রতিনিধিত্বের অনুপাত বিভিন্ন দফায় পরবর্তী বিবেচনার বিষয় হবে এবং সে দফাগুলো এখনো সাব-কমিটির হাতে ন্যস্ত করা হয়নি।' আমার মতে, সংখ্যানুপাতের প্রশ্ন হচ্ছে সবচাইতে বেশী গুরুত্বপূর্ণ এবং তা' পরিষদের কাঠামো সংক্রান্ত মূল প্রশ্নের সাথে একই সময়ে বিবেচনা করা উচিত ছিলো।

আমি মনে করি, কেবলমাত্র বৃটিশ ভারতীয় ফেডারেশন থেকে শুরু করাই হোত সর্বোত্তম পন্থা। যে ফেডারেল পরিকল্পনা গণতন্ত্র *[demomracy]* ও স্বেচ্ছাতন্ত্রের *(despotism)* অসাধু সংযোগে জন্ম নিয়েছে, তা' বৃটিশ ভারতকে ইউনিটারী কেন্দ্রীয় সরকারের বিষাক্ত আবহাওয়া থেকে মুক্তি দিতে পারে না। এ ধরনের ইউনিটারী শাসন পদ্ধতি বৃটিশ জাতি, বৃটিশ-ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় ও ভারতীয় দেশীয় রাজন্যবর্গের সর্বাধিক কল্যাণের বাহক হতে পারে; কিন্তু মুসলিম জনগণের জন্য এগারোটি ভারতীয় প্রদেশের পাঁচটিতে পূর্ণ রেসিডুয়ারী ক্ষমতাসহ সংখ্যাগরিষ্ঠতার অধিকার এবং ফেডারেল এসেম্বলীর মোট সদস্যসংখ্যার মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষিত না হলে এতে তাদের কোনো কল্যাণই আসতে পারে না। বৃটিশ ভারতীয় প্রদেশসমূহের সার্বভৌম ক্ষমতা লাভের কথা বলতে গেলে ভূপালের মহামান্য নওয়াব, স্যার আকবর হায়দারী ও মিঃ জিন্নার মর্যাদা অপ্রতিদ্বন্দ্বী। অবশ্য, ভারতীয় ফেডারেশনে রাজন্যবর্গের অংশগ্রহণের দিক বিবেচনা করে বৃটিশ ভারতীয় পরিষদে আমাদের প্রতিনিধিত্বের দাবীকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখতে হবে। এ প্রশ্নটি ভারতীয় এসেম্বলীতে মুসলিমদের অংশের প্রশ্নই নয়, বরং এ সর্ব-ভারতীয় ফেডারেল এসেম্বলীতে বৃটিশ ভারতীয় মুসলিম প্রতিনিধিত্বের সাথে জড়িত। এখন আমাদের শতকরা ৩৩ ভাগ প্রতিনিধিত্ব দাবীকে ফেডারেশনে অংশগ্রহণকারী মুসলিম রাজ্যগুলোর অংশ বাদ দিয়ে সর্বভারতীয় ফেডারেল এসেম্বলীতে অনুরূপ হারে প্রতিনিধিত্বের দাবী বলে ধরে নিতে হবে।

ভারতে ফেডারেল শাসন পদ্ধতি সাফল্যজনকভাবে কার্যকর করার পথে অপর যে জটিল সমস্যা রয়েছে, তা' হচ্ছে ভারতের দেশরক্ষা *[defence]* সমস্যা। রয়াল কমিশনের সদস্যবর্গ এ সম্পর্কে তাদের আলোচনায় সামরিক বাহিনীকে সাম্রাজ্যবাদী পরিচালনায় *[Imperial Administration]* রাখার পক্ষে যুক্তি খাড়া করার জন্য ভারতের পক্ষে সর্বপ্রকার ঘাটতির সমাবেশ করে দেখিয়েছেন। কমিশন সদস্যগণ বলেন : *'India and Britain are so related that India's defence cannot now or in any future which is within sight, be regarded as a matter of purely Indian concern. The control and direction of such an army must rest in the*

hands of agents of Imperial Government. —'ভারত ও বৃটেন এমনভাবে সম্পর্কযুক্ত যে, ভারত রক্ষার ব্যাপার বর্তমানে অথবা কোনো কল্পনীয় ভবিষ্যতে নিছক ভারতীয় দায়িত্ব বলে গণ্য হোতে পারে না। এরূপ সামরিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ ও নির্দেশদানের দায়িত্ব সাম্রাজ্যবাদী সরকারের প্রতিনিধিদের হাতে থাকতেই হবে।' এখন এর পরবর্তী অপরিহার্য সিদ্ধান্ত কি এই যে, বৃটিশ কর্মচারী ও বৃটিশ সৈন্যদের সাহায্য ব্যতীত দেশরক্ষার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত বৃটিশ-ভারতের দায়িত্বশীল সরকার গঠনের অধিকার অর্জনের পথে অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত হয়ে থাকবে ? বর্তমান পরিস্থিতিতে শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতির পথে বাধা রয়েছে। নেহরু রিপোর্টে প্রকাশিত মনোভাব বজায় থাকলে ১৯১৭ সালের ২০শে আগস্টের ঘোষণায় বিধৃত চরম লক্ষ্য অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের বিবর্তনের সকল আশা অনির্দিষ্টকালের জন্য ব্যর্থ হবার মতো বিপদ-সম্ভাবনা রয়েছে। উক্ত রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, কোনোরূপ ভাবী পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সামরিক বাহিনীর পরিচালনা ভার একটি নির্বাচিত ভারতীয় আইন-সভার কর্তৃত্বাধীনে ছেড়ে দিতে হবে। তাঁদের যুক্তিকে আরো বলিষ্ঠ করে তোলার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী ধর্ম ও ব্যাপকভাবে ক্ষমতার *[capacity]* পার্থক্যযুক্ত জাতিসমূহের অস্তিত্বের তথ্যের উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। সমস্যাটিকে সমাধানের অতীত বলে প্রতীয়মান করবার চেষ্টা করে মন্তব্য করেছেন : *'The obvious fact that India is not in the ordinary and natural sense, a single nation is nowhere made more plane than in considering the difference between the martial races of India and the rest.'* —'সাধারণ ও স্বাভাবিক অনুভূতিতে ভারত যে এক অখণ্ড জাতি নয়, ভারতের সামরিক গোত্রসমূহের ও অবশিষ্ট অধিবাসীদের মধ্যে পার্থক্য বিবেচনার ক্ষেত্রে সে সুস্পষ্ট সত্যটি যেমন সহজভাবে প্রমাণিত হয়েছে, তেমন আর কোথাও হয়নি।' প্রশ্নটির এসব বৈশিষ্ট্যের প্রতি জোর দেয়া হয়েছে একথা প্রমাণ করে দেখাবার জন্যে যে, বৃটিশ জাতি ভারতকে কেবল বৈদেশিক আক্রমণের বিপদ থেকেই নিরাপদ রাখছে না, বরং তারাই হচ্ছে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ব্যাপারেও 'নিরপেক্ষ অভিভাবক' *[natural guardians]* । অবশ্য ফেডারেশন বলতে আমি যা বুঝি, তাতে ফেডারেল শাসনাধীন ভারতে সমস্যার একটি মাত্র দিক থাকবে; তা' হচ্ছে বাইরের দেশরক্ষা ব্যবস্থা *[external defence]* অভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় প্রাদেশিক সামরিক বাহিনী ছাড়াও ভারতীয় ফেডারেল কংগ্রেস উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে একটি বলিষ্ঠ ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী *[Frontier Army]* গঠন করতে পারেন। সকল প্রদেশ থেকে সংগৃহীত সৈন্যদের কতকগুলো ইউনিট নিয়ে সে বাহিনী গঠন করা যেতে পারে এবং সকল সম্প্রদায় থেকে যোগ্যতাসম্পন্ন ও অভিজ্ঞ সামরিক লোকদেরকে তার অফিসার পদে নিযুক্ত করা যেতে পারে। আমি জানি, ভারতে যোগ্যতাসম্পন্ন সামরিক অফিসারের অভাব রয়েছে এবং রয়াল কমিশনের সদস্যবৃন্দ সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থাপনার পক্ষে যুক্তি খাড়া করার জন্য এই সত্যেরই সুযোগ গ্রহণ করছেন। এ বিষয় সম্পর্কে আমি রিপোর্ট থেকে আর একটি অংশ উদ্ধৃত না করে পারছি না। আমার মনে হয়, এই উদ্ধৃতিটি কমিশন সদস্যদের যুক্তির বিরুদ্ধে সর্বোত্তম যুক্তি হিসাবে পেশ করা যেতে পারে। রিপোর্টে বলা হয়েছে : *'At the present moment, no Indian holding the King's Commission is of higher army rank than*

a captain. There, we believe, 39 captains of whom 25 are in ordinary regimental employ. Some of them are of an age which would prevent their attainting much higher rand, even if they pass the necessary examination before retirement. Most of these have not been through Sandhurst, but, got their Commissions during the Great War.' — 'বর্তমান মুহূর্তে ক্যাপ্‌টেন অপেক্ষা উচ্চতর পদে নিযুক্ত রাজকীয় কমিশনপ্রাপ্ত ভারতীয় সামরিক অফিসার নেই। আমাদের বিশ্বাস, মোট ৩৯ জন ক্যাপ্‌টেন রয়েছে এবং তার মধ্যে ২৫ জন সাধারণ রেজিমেন্টের চাকরিতে নিযুক্ত রয়েছে, তাদের মধ্যে এমন কয়েকজন রয়েছে, যাদের বয়স তাদের অধিকতর উচ্চপদ লাভের অন্তরায় হবে, যদিও তারা অবসর গ্রহণের আগে প্রয়োজনীয় পরীক্ষায় পাস করতে পারে। এদের অধিকাংশই স্যাণ্ডহার্স্টের শিক্ষা লাভ করেনি, কিন্তু তারা কমিশন পেয়েছিলো গত মহাযুদ্ধের আমলে।' এখন এই রূপান্তর সাধনের ইচ্ছা যতোই অকৃত্রিম হোক এবং তার প্রচেষ্টা যতোই ঐকান্তিক হোক স্কীন কমিটি (চেয়ারম্যান ও সামরিক সেক্রেটারী ব্যতীত যার সদস্যবৃন্দের সকলেই ভারতীয়) নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিতে কতকগুলো অপরিহার্য শর্ত *[overriding conditions]*

বিশেষ জোরের সাথে আরোপ করেছেন : *Progress must be contingent upon success being secured at each stage and upon military efficiency being maintained, though it must in any case render such development measured and slow. A higher command cannot be evolved at short notice out of existing cadres of Indian officers, all of junior rank and limited experience. Not until the slender trickle of suitable Indian recruits for the officer class—and we earnestly desire and increase in their numbers flows in,much greater volume, not until sufficient Indians have attained the experience and training requisite to provide all the officers, for, at any rate, some Indian regiments, not until such units have stood the only test which can possibly determine their efficiency, not until Indian officers have qualified by a successful army career for the high command, will it be possible to develop the policy of Indianisation to a point which will bring a completely Indianised army within sight ? Even then years must elapse before the process could be completed.'* — 'অগ্রগতি অবশ্যই নির্ভর করে প্রত্যেক পর্যায়ে সাফল্য অর্জন ও সামরিক যোগ্যতা বজায় রাখার উপর, যদিও যে কোনো ক্ষেত্রে অনুরূপ উন্নয়ন বিধান ধীর ও মন্থরগতি হোতে বাধ্য। বর্তমানে যেসব ভারতীয় অফিসার রয়েছে, তাদের সকলেই জুনিয়র পদে নিযুক্ত ও সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এবং তাদেরকে স্বল্পকালের নোটিশে উচ্চতর কম্যাণ্ডে উন্নীত করা যেতে পারে না। অফিসার পদের জন্য যে স্বল্পসংখ্যক যোগ্যতাসম্পন্ন ভারতীয় এগিয়ে আসছে—এবং আমরা ঐকান্তিকভাবে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি কামনা করি,—যতোদিন না তারা আরো অধিকসংখ্যায় এগিয়ে আসে, যতো দিন না যে

কোনো উপায়ে কতিপয় ভারতীয় রেজিমেন্টের সকল অফিসার পদ পূরণের জন্য যথেষ্টসংখ্যক ভারতীয় প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা গ্রহণ করে, যতোদিন না এই ধরনের ইউনিটসমূহ তাদের যোগ্যতা নির্ধারণের জন্য সম্ভাব্য একমাত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় এবং যতোদিন না ভারতীয় অফিসারগণ সাফল্যপূর্ণ্য সামরিক জীবন দ্বারা উর্ধ্বতন কম্যাণ্ডের যোগ্যতা অর্জন করে, ততোদিন পর্যন্ত কি ভারতীয়করণ নীতির বিবর্তন এমনভাবে সম্ভব হবে, যার ফলে আমরা সামরিক বাহিনীর পূর্ণ ভারতীয়করণের সূচনা দেখতে পাবো ? এমনকি, তখনো এ বিবর্তনের ধারা পূর্ণ করে আনতে বহু বছর অতীত হয়ে যাবে।'

আমি এখন প্রশ্ন করতে চাই : বর্তমান পরিস্থিতির জন্য দায়ী কে ? এর কারণ কি আমাদের যোদ্ধা জাতিসমূহের কোনো সহজাত অযোগ্যতা, না সামরিক শিক্ষাধারার মন্থরগতি ? আমাদের যোদ্ধা জাতিসমূহের সামরিক যোগ্যতা অনস্বীকার্য। সামরিক শিক্ষার ধারা মানবীয় শিক্ষার অন্যবিধ ধারাসমূহের তুলনায় ধীরগতি হোতে পারে। এ ব্যাপারে বিচার করার মতো সামরিক বিশেষজ্ঞ আমি নই। কিন্তু সাধারণ মানুষ হিসাবে আমি অনুভব করি যে, উল্লিখিত যুক্তি দ্বারা এই শিক্ষাধারাকে অন্তহীন বলে ধরে নেয়া হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে ভারতের স্থায়ী দাসত্ব এবং এতে নেহ্‌রু রিপোর্টে পরিকল্পিত সীমান্তরক্ষী বাহিনীর দায়িত্ব একটি দেশরক্ষা কমিটির হাতে ন্যস্ত করার প্রয়োজন আরো বেশী করে দেখা দিয়েছে। পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে এই কমিটির সদস্য নির্ধারণ করা যেতে পারে।

পুনরায় এ ব্যাপারটিও তাৎপর্যপূর্ণ যে, সাইমন রিপোর্ট ভারতের স্থল সীমান্তের প্রশ্নের উপর অসাধারণ গুরুত্ব আরোপ করেছেন, কিন্তু নৌবাহিনীর অবস্থা সম্পর্কে তাঁরা কেবল প্রসংগক্রমে উল্লেখমাত্র করেছেন। ভারত নিঃসন্দেহে তার স্থলসীমান্ত দিয়েই হামলার মোকাবিলা করেছে কিন্তু এ ব্যাপারটি সুস্পষ্ট যে, তার অরক্ষিত সমুদ্রোপকূলের সুযোগ নিয়েই প্রভুরা তার উপর দখল নিয়েছে। এখনকার দিনে স্বায়ত্তশাসিত আযাদ ভারত তার স্থল সীমান্ত অপেক্ষা অধিকতর যত্ন সহকারে সমুদ্রোপকূল রক্ষার ব্যবস্থা করবে।

ফেডারেল শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হোলে মুসলিম ফেডারেল রাজ্যসমূহ ভারতের রক্ষাব্যবস্থার জন্য স্বেচ্ছায় নিরপেক্ষ ভারতীয় সামরিক ও নৌবাহিনী গঠনে সম্মত হবে, সে সম্পর্কে আমার কোনো সন্দেহ নেই। মোগল শাসনের আমলে এই ধরনের নিরপেক্ষ সামরিক বাহিনী বাস্তবে রূপলাভ করেছিলো। প্রকৃতপক্ষে আকবরের আমলে মোটের উপর হিন্দু সেনাপতিদের পরিচালনাধীন বাহিনী দ্বারাই ভারতীয় সীমান্ত রক্ষিত হোত। আমি নিশ্চিত বিশ্বাস পোষণ করি যে, ফেডারেল শাসনাধীন ভারতের বুনিয়াদে একটি নিরপেক্ষ সেনাবাহিনী গঠনের পরিকল্পনা মুসলিম জনগণের মধ্যে দেশাত্মবোধের অনুভূতি তীব্রতর করবে এবং কোনোরূপ হামলার সময়ে ভারতীয় মুসলিম জনগণ সীমান্তের বাইরের মুসলিমদের সাথে যুক্ত হবে বলে যদি কোনো সন্দেহ পোষণ করা হয়, তা' নিরসন করবে।

ভারতের দু'টি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শাসনতান্ত্রিক সমস্যাকে আমার মতে ভারতীয় মুসলিমদের যে দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা উচিত, তা' আমি সংক্ষেপে বিবৃত করবার চেষ্টা করেছি। সাম্প্রদায়িক সমস্যার স্থায়ী সমাধানের উদ্দেশ্যে বৃটিশ ভারতের পুনর্বিভাগই হচ্ছে ভারতীয় মুসলিমদের প্রধান দাবী। অবশ্য, সাম্প্রদায়িক সমস্যার আঞ্চলিক সমাধানের মুসলিম দাবী

যদি উপেক্ষিত হয়, তা'হোলে সেরূপ ক্ষেত্রে আমি নিখিল-ভারত মুসলিম লীগ ও নিখিল-ভারত মুসলিম সম্মেলন কর্তৃক বারংবার উত্থাপিত মুসলিম দাবীসমূহ সর্বাধিক সম্ভব জোরের সাথে সমর্থন করবো। ভারতীয় মুসলিম জনগণ এমন কোনো শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনে সম্মতি দান করতে পারে না, পাঞ্জাব ও বাংলায় স্বতন্ত্র নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের প্রাপ্য সংখ্যাগরিষ্ঠতার অধিকার ব্যাহত করবে, অথবা কোন কেন্দ্রীয় আইন-সভায় তাদের দাবী অনুযায়ী শতকরা ৩৩ ভাগ আসন সংরক্ষণ করার প্রতিশ্রুতি দিতে না পারবে। মুসলিম রাজনীতিকগণ দু'টি ব্যাপারে বিভ্রমে পতিত হয়েছিলেন। তার মধ্যে প্রথম হচ্ছে পরিত্যক্ত লক্ষ্মৌ প্যাক্ট; যার জন্ম হয়েছিলো ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মিথ্যা ধারণার উপর এবং যা' ভারতীয় মুসলিমগণকে ভারতের বুকে কোনরূপ রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের সম্ভাবনা থেকে বঞ্চিত করেছিলো। দ্বিতীয় হচ্ছে তথাকথিত *Punjab Ruralism*-এর খাতিরে ইসলামী সংহতির সংকীর্ণ দৃষ্টিপ্রণোদিত ত্যাগ স্বীকার এবং তার ফলে এমন একটি প্রস্তাবের উদ্‌ভব হয়েছে, যা দ্বারা প্রকৃতপক্ষে পাঞ্জাবের মুসলিম জনগণ সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছে। এখন মুসলিম লীগের কর্তব্য হচ্ছে উক্ত প্যাক্ট ও প্রস্তাব—উভয়ের নিন্দা করা।

সাইমন কমিশন পাঞ্জাব ও বাংলায় বিধিবদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠতার *[statutory majority]* সুপারিশ না করে মুসলিম জনগণের প্রতি বিরাট অবিচার করেছে। কমিশন দাবী করেছে যে, মুসলিম জনগণ হয় লক্ষ্মৌ প্যাক্ট আঁকড়ে থাকবে অথবা যুক্ত নির্বাচন পরিকল্পনায় সম্মত হবে। সাইমন রিপোর্ট সম্পর্কে ভারত সরকারের সিদ্ধান্তে স্বীকার করা হয়েছে যে, উক্ত দলিল প্রকাশের সময় থেকে মুসলিম সম্প্রদায় রিপোর্টে প্রস্তাবিত বিকল্প ব্যবস্থার কোনোটিই মেনে নিতে রাজী হয়নি। উক্ত সিদ্ধান্তে স্বীকার করা হয়েছে যে, দেশের অন্যত্র মুসলিম সংখ্যালঘুদের জন্য তাদের সংখ্যানুপাত অপেক্ষা বেশী আসন *[weightage]* দেয়া হচ্ছে, কেবলমাত্র এ যুক্তিতে পাঞ্জাব ও বাংলার কাউন্সিলে তাদের সংখ্যানুপাত অনুযায়ী প্রতিনিধিত্বে বঞ্চিত করায় ন্যায়সংগত অভিযোগ উত্থাপিত হোতে পারে। কিন্তু ভারত সরকারের সিদ্ধান্তে সাইমন রিপোর্টের কৃত অবিচারের সংশোধন ব্যবস্থা করা হয়নি। পাঞ্জাব সম্পর্কিত ব্যাপারে— এবং এটাই হচ্ছে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ *[crucial]* ব্যাপার—পাঞ্জাব সরকারের সরকারী সদস্যবৃন্দ *[official members]* কর্তৃক তথাকথিত 'সযত্নে রচিত ভারসাম্যযুক্ত পরিকল্পনা' স্বীকার করে নেয়া হয়েছে এবং তাতে সম্মিলিত হিন্দু ও শিখ সদস্যদের উপর পাঞ্জাবী মুসলিমদেরকে দু'টি আসনের সংখ্যাধিক্য ও সামগ্রিকভাবে পরিষদের মোট সদস্য সংখ্যার ৪৯ ভাগ আসন লাভের অধিকার দেওয়া হয়েছে। এটা সুস্পষ্ট যে, পাঞ্জাবের মুসলিম জনগণ পরিষদের সমগ্র আসনসংখ্যার সুস্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ না করে খুশী থাকতে পারে না। অবশ্য, লর্ড আরউইন ও তাঁর সরকার স্বীকার করেন যে, যতোক্ষণ না ভোটাধিকারের *[extension of franchise]* এবং যতোক্ষণ না প্রাদেশিক কাউন্সিলের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য সর্বসম্মতিক্রমে স্বতন্ত্র প্রতিনিধিত্বের দাবী পরিত্যাগ করেন, ততোক্ষণ তাদের সাম্প্রদায়িক নির্বাচন পদ্ধতির যৌক্তিকতা বিনষ্ট হবে না। আমি অবশ্য বুঝে উঠতে পারি না, কেন ভারত সরকার মুসলিম দাবীর যৌক্তিকতা স্বীকার করা সত্ত্বেও পাঞ্জাব ও বাংলায় মুসলিমদের জন্য বিধিবদ্ধ *[statutory]* সংখ্যাগরিষ্ঠতার অধিকার দিতে সাহস পাচ্ছেন না।

ভারতীয় মুসলিম জনগণ এমন কোনো পরিবর্তনেও সম্মতি দিতে পারে না, যাতে সিন্ধুকে স্বতন্ত্র প্রদেশের মর্যাদা দেওয়া না হবে এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশকে হীনতর রাজনৈতিক মর্যাদাসম্পন্ন প্রদেশ হিসাবে গণ্য করা হবে। সিন্ধুকে কেন বেলুচিস্তানের সাথে যুক্ত করে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গড়ে তোলা হবে না, তার কারণ আমি বুঝে উঠতে পারি না। বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর সাথে তার কোনো সাধারণ মিল নেই। জীবন পদ্ধতি ও সত্যতার দিক দিয়ে রয়াল কমিশনের সদস্যগণ একে ভারতের চাইতে মেসোপটামিয়া ও আরবের সাথে অধিকতর সাদৃশ্যযুক্ত দেখতে পেয়েছেন। মুসলিম ভূগোলবিদ মাসুদী দীর্ঘকাল আগে এই সম্পর্কে আবিষ্কার করে বলেছিলেনঃ 'সিন্ধু ইসলাম অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহের নিকটবর্তী দেশ'। উমাইয়া বংশীয় শাসক না-কি মিসরের কথা প্রসংগে বলেছিলেন ঃ 'মিসরের পিঠ রয়েছে আফ্রিকার দিকে ও মুখ রয়েছে আরবের দিকে।' প্রয়োজনীয় পরিবর্তনসহ একই মন্তব্য দ্বারা সিন্ধুর সঠিক অবস্থান ব্যক্ত করা যেতে পারে। তার পিঠ ভারতের দিকে ও মুখ মধ্য এশিয়ার দিকে রয়েছে। তার কৃষিসংক্রান্ত যে-সব সমস্যা বোম্বাই সরকারের কোনো সহানুভূতি জাগাতে পারে না, তার প্রকৃতি বিবেচনা করলে এবং ভারতের মহানগরী হিসাবে করাচীর অবশ্যম্ভাবী বিবর্তনের উপর নির্ভরশীল অন্তহীন বাণিজ্য-সম্ভাবনা সম্পর্কে বিবেচনা করলে তাকে একটি প্রেসিডেন্সীর সাথে যুক্ত করে রাখা আমার মতে বিজ্ঞ-জনোচিত নয়। বর্তমানে উক্ত প্রেসিডেন্সীটি তার প্রতি মৈত্রীভাবাপন্ন হোলেও অদূরভবিষ্যত তার প্রতিদ্বন্দ্বী হবার সম্ভাবনা রয়েছে। আমাদেরকে বলা হচ্ছে যে, আর্থিক অসুবিধার দরুন সিন্ধুকে পৃথকীকরণ বাধা সৃষ্টি হচ্ছে। একটি প্রতিশ্রুতিশীল প্রদেশের স্বাধীন অগ্রগতির সংগ্রামে ভারত সরকার কেন সামরিক অর্থ-সাহায্য দেবেন না, তা' আমি বুঝে উঠতে পারি না।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের কথা বলতে গেলে এই ব্যাপারটি অত্যন্ত পীড়াদায়ক যে, রয়াল কমিশনের সদস্যবৃন্দ প্রকৃতপক্ষে এই প্রদেশের জনগণকে কোনো প্রকার সংস্কারের অধিকার দান করতে অস্বীকার করেছেন। তাঁরা ব্রে কমিটির *[Bray Committee]* চাইতে অনেকখানি পিছনে রয়েছেন এবং তাঁরা যে কাউন্সিলের সুপারিশ করেছেন, তা' হচ্ছে চীফ কমিশনারের স্বেচ্ছাতন্ত্রকে *[autocracy]* ঢাকা দেওয়ার আবরণমাত্র। আফগান জাতির সিগারেট ধরাবার সহজাত অধিকার *[inherent right]* খর্ব করা হয়েছে কেবলমাত্র এই যুক্তিতে যে, সে বারুদের ঘরে বাস করছে। রয়াল কমিশন সদস্যদের রসাল যুক্তিটি যথেষ্ট চিত্তাকর্ষক, কিন্তু তা' কারুর মনে আস্থা জন্মাবার মতো নয়। রাজনৈতিক সংস্কার হচ্ছে আলো, আগুন নয়; এবং প্রত্যেক মানুষেরই আছে আলোর অধিকার, তা' সে বারুদের ঘরেই বাস করুক, আর কয়লার খনিতেই বাস করুক। সাহসী, বিচক্ষণ ও ন্যায়সংগত অধিকার লাভের জন্য দুঃখবরণ করতে দৃঢ়সংকল্প আফগান নিশ্চিতরূপে তাকে আত্মবিকাশের সুযোগে বঞ্চিত করার যে , কোনো প্রচেষ্টার নিন্দা করবে। ইংল্যাণ্ড ও ভারত—উভয়ের স্বার্থের খাতিরে এম্নি একটি জাতিকে সন্তুষ্ট রাখার প্রয়োজন আছে। এই দুর্ভাগা প্রদেশে সম্প্রতি যা' ঘটেছে, তা' হচ্ছে ভারতের অবশিষ্টাংশে স্বায়ত্ত শাসনের নীতি প্রবর্তন সত্ত্বেও

এই প্রদেশের জনগণের প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণের ফল। আমি কেবল এই আশাই পোষণ করি যে, এই প্রদেশের বর্তমান অশান্ত পরিস্থিতি কোনোরূপ বাইরের কারণ *[extraneous causes]* থেকে উদ্‌ভূত, এইরূপ বিশ্বাস পোষণ করে বৃটিশ রাজনীতিকগণ যেনো প্রকৃত পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁদের মনোভাবকে আচ্ছন্ন না করেন।

ভারত সরকারের সিদ্ধান্তে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের জন্য যে সংস্কার ব্যবস্থার সুপারিশ করা হয়েছে, তা'ও সন্তোষজনক নয়। নিঃসন্দেহে এই সিদ্ধান্তে সাইমন রিপোর্ট অপেক্ষা আরো কিছুটা অগ্রসর হয়ে এক ধরনের প্রতিনিধিত্বমূলক *[representative]* কাউন্সিল ও আধা-প্রতিনিধিত্বমূলক মন্ত্রণা-সভার *[semi-representative cabinet]* সুপারিশ করা হয়েছে, কিন্তু তা'তে এই গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম প্রদেশটিকে অন্যান্য ভারতীয় প্রদেশের সমমর্যাদাসম্পন্ন বলে ধরা হয়নি। প্রকৃতপক্ষে আফগান জাতি সহজাতগুণের দিক দিয়ে অপর যে কোনো ভারতীয় জাতি অপেক্ষা গণতান্ত্রিক বিধানের *[democratic institutions]* অধিকতর উপযোগী।

আমার মনে হয়, এখন আমার গোল-টেবিল বৈঠক *[Round•Table Conference]* সম্পর্কে কয়েকটি মন্তব্য করা প্রয়োজন। ব্যক্তিগতভাবে আমি এ বৈঠকের ফলাফল সম্পর্কে আশাবাদী নই। আশা করা গিয়েছিলো যে, সাম্প্রদায়িক কলহের বাস্তব ক্ষেত্র থেকে দূরে এক পরিবর্তিত আবহাওয়ায় অধিকতর সুবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যাবে এবং ভারতের দুই প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে খাঁটি বিরোধ-মীমাংসার ফলে ভারতের মুক্তি নিকটতর হবে। প্রকৃত ঘটনাপ্রবাহ অবশ্য অন্যবিধ পরিস্থিতির উদ্‌ভব করেছে। প্রকৃতপক্ষে, লণ্ডনে সাম্প্রদায়িক প্রশ্নের আলোচনা প্রসংগে পূর্বাপেক্ষা অধিকতর সুস্পষ্টভাবে বৃহৎ সাংস্কৃতিক ইউনিটসমূহের মধ্যে অপরিহার্য বৈষম্য প্রকট হয়ে উঠেছে। তা' সত্ত্বেও ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী স্পষ্টতঃ দেখতে চান না, ভারতের সমস্যা আন্তর্জাতিক, জাতীয় নয়। জানা গেছে, তিনি না-কি মন্তব্য করেছেন যে, 'পৃথক নির্বাচন বজায় রাখার পক্ষে পার্লামেন্টের প্রস্তাব পেশ করা তাঁর সরকারের পক্ষে কঠিন হবে, কারণ যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতি বৃটিশ গণতান্ত্রিক মনোভাবের সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ।' স্পষ্টত তিনি বুঝতে চান না যে, বৃটিশ গণতন্ত্রের আদর্শ একটি বহুজাতি অধ্যুষিত দেশের পক্ষে কোনো কাজে আসতে পারে না এবং সমস্যাটির আঞ্চলিক সমাধানের জন্য পৃথক নির্বাচন পদ্ধতি হচ্ছে নিছক মন্দের ভালো *[a poor substitute]*। সংখ্যালঘু সাব-কমিটিরও কোনো সন্তোষজনক মীমাংসায় পৌঁছবার সম্ভাবনা নেই। সম্পূর্ণ প্রশ্নটি বৃটিশ পার্লামেন্টের সামনে পেশ করতে হবে এবং আমরা কেবল এই আশাই করতে পারি যে, অধিকাংশ ভারতীয় রাজনীতিক থেকে আলাদা ধারায় জাতীয় তীক্ষ্মদর্শী প্রতিনিধিবৃন্দ পরিস্থিতির অভ্যন্তরে দৃষ্টিক্ষেপ করে ভারতের মতো একটি দেশের শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানের মূল পন্থা নির্দেশ করতে সক্ষম হবেন। একজাতিত্বের ভিত্তিযুক্ত ভারতের ধারণা নিয়ে শাসনতন্ত্রের বুনিয়াদ রচনা করলে অথবা বৃটিশ গণতান্ত্রিক মনোভাবের নির্দেশিত নীতিসমূহ ভারতের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে তাকে অলক্ষ্যে গৃহযুদ্ধের জন্যে তৈরী

করা হবে। আমি যতোটা দেখতে পাই, তা'তে এদেশে ততোদিনে কোনো শান্তি আসবে না, যতোদিন না ভারতের বিভিন্ন জাতিকে আকস্মিকভাবে তাদের অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন না করে তাদেরকে অবাধ আত্মবিকাশের সুবিধা দেওয়া হবে।

আমি কথা বলবার সুযোগ পেয়ে আনন্দ অনুভব করছি যে, আমি যাকে ভারতীয় আন্তর্জাতিক সমস্যা বলে অভিহিত করি, আমাদের মুসলিম প্রতিনিধিবৃন্দ তার সঠিক সমাধানের গুরুত্ব পূর্ণরূপে উপলব্ধি করেন। কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্বের প্রশ্ন চূড়ান্তভাবে মীমাংসা হওয়ার পূর্বে সাম্প্রদায়িক প্রশ্নের মীমাংসার জন্য চাপ দেওয়া তাদের পক্ষে সম্পূর্ণ যুক্তিসংগত রয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কথিত বৃটিশ গণতান্ত্রিক মনোভাব সুযোগ গ্রহণের এবং ভারতে প্রকৃতপক্ষে যার অস্তিত্ব নেই, এমন একটা পরিস্থিতি অনুমান করে নেবার দিকে ইংল্যাণ্ডকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে প্রকাশ্যভাবে উদ্‌ভাবিত প্রচারণার *'সাম্প্রদায়িকতা'* কথাটিতে যে খোঁচা রয়েছে, তা'তে কোনো মুসলিম রাজনীতিকের স্পর্শকাতর হওয়া উচিত হবে না। আমাদের বিরাট স্বার্থ বিপন্ন হোতে চলেছে। আমরা সংখ্যায় সাত কোটি এবং ভারতের যে কোনো জাতি অপেক্ষা আমরা বহুগুণে অধিকতর একজাতিত্ববোধসম্পন্ন। প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় মুসলিমরাই একমাত্র ভারতীয় জাতি, যাদেরকে আধুনিক শাব্দিক তাৎপর্য অনুযায়ী সঠিকভাবে একটি জাতি বলে অভিহিত করা যেতে পারে। হিন্দুরা যদিও প্রায় সবদিক দিয়েই আমাদের তুলনায় অধিকতর অগ্রগামী, তথাপি তারা একটি জাতির পক্ষে অপরিহার্য একজাতিত্ববোধ এখনো পর্যন্ত অর্জন করতে পারেনি, অথচ ইসলাম তা' আপনাদেরকে তোহ্‌ফা হিসাবে দান করেছে। নিঃসন্দেহে তারা (হিন্দুরা) একটি জাতিতে পরিণত হবার জন্য আগ্রহান্বিত, কিন্তু একটি জাতিকে রূপায়ণ করার বিবর্তন ধারা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার এবং হিন্দু ভারতের ক্ষেত্রে এর জন্য তাদের সামাজিক কাঠামোকে পুরোপুরি ঢেলে সাজাতে হবে। তুরস্ক, ইরান ও অন্যান্য মুসলিম দেশসমূহ জাতীয় অর্থাৎ আঞ্চলিক ধারায় প্রগতির পথে এগিয়ে যাচ্ছে, এই সূক্ষ্ম অথচ সহজ যুক্তি দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়া মুসলিম নেতৃবৃন্দ ও রাজনীতিকদের পক্ষে সংগত হবে না। ভারতীয় মুসলিম জনগণ সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ অবস্থায় অবস্থিত। ভারতের বাইরের ইসলামী দেশসমূহ জনসংখ্যার দিক দিয়ে সম্পূর্ণরূপে মুসলিম। তথাকার সংখ্যালঘু দলগুলো কোরআনের ভাষায় *'আহ্‌লে কিতাব'*। মুসলিম ও 'আহ্‌লে কিতাবে'র মধ্যে কোনোরূপ সামাজিক প্রতিবন্ধক *[social barriers]* নেই। একজন ইহুদী অথবা একজন খৃষ্টান অথবা একজন জোরোয়াস্তারবাদীর *[Zoroastrian]* স্পর্শে মুসলিমের খাদ্যবস্তু দোষযুক্ত হয় না এবং ইসলামী কানুনে 'আহ্‌লে কিতাবে'র সাথে অন্তর্বিবাহের *[inter-marriage]* অনুমতি রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ইসলাম মানবতার চূড়ান্ত সংযোগ বিধানের জন্য সর্বপথম যে বাস্তব পদক্ষেপ করেছিলো, তা' হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে একই নৈতিক আদর্শ-অনুসারী জাতি-সমূহকে অগ্রসর হয়ে মিলিত হবার আহ্বান জ্ঞাপন। কোরআন শরীফে ঘোষণা হয়েছেঃ يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم

'হে আহ্‌লে কিতাবগণ ! এস, আমরা একত্রে মিলিত হই সেই বাণীর (আল্লার একত্বের) উপর, যা' আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সাধারণভাবে গ্রহণযোগ্য।' [৩:৬৪] ইসলাম ও খৃষ্টধর্মের যুদ্ধবিরহ এবং পরবর্তীকালে বিভিন্ন ধরনের ইউরোপীয় হামলা মুসলিম জাহানে এই আয়াতের অন্তহীন তাৎপর্যের বাস্তব রূপায়ণ হোতে দেয়নি। আজ ইসলামী দেশসমূহে মুসলিম জাতীয়তাবাদের *[Muslim Nationalism]* রূপে তা' ক্রমে উপলব্ধি করা হচ্ছে।

আমার পক্ষে একথা বলা বাহুল্যমাত্র যে, আমাদের প্রতিনিধিবর্গ দিল্লী প্রস্তাবে বিধৃত আমাদের দাবীসমূহ মেনে নিতে বৈঠকের অমুসলিম প্রতিনিধিবৃন্দকে যতোটা রাযী করতে পারবেন, তাই হবে তাদের সাফল্যের একমাত্র নিদর্শন। এই দাবীসমূহ স্বীকৃত না হোলে জাতির সম্মুখে একটি অতি বড়ো সুদূরপ্রসারী গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উদ্‌ভব হবে। তখনই ভারতীয় মুসলিমদের এক স্বতন্ত্র ও সম্মিলিত রাজনৈতিক কর্মপন্থা অবলম্বনের মুহূর্ত সমাগত হবে। যদি আপনাদের আকাংখা ও আদর্শ সম্পর্কে মোটেই আন্তরিকতা থাকে, তা' হোলে আপনাদেরকে অনুরূপ কর্মপন্থা অবলম্বনের জন্য তৈরী হোতে হবে। আমাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ যথেষ্ট রাজনৈতিক চিন্তা করেছেন এবং বর্তমানে যে-সব শক্তি ভারতের ও ভারতের বাইরের জাতিসমূহের ভাগ্য রূপায়ণ করছে, তাঁদের চিন্তাধারা নিশ্চিতরূপে আমাদেরকে তাদের কম্পর্কে কম-বেশী করে সচেতন করে দিয়েছে। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে ঃ অদূর ভবিষ্যতে যে পরিস্থিতির উদ্‌ভব হোতে পারে, এসব চিন্তাধারা কি আমাদেরকে তদনুরূপ কর্মপন্থা অবলম্বনের জন্য প্রস্তুত করেছে ? আমি আপনাদেরকে সুস্পষ্টভাবে বলতে চাই যে, বর্তমান সময়ে ভারতীয় মুসলিম দু'টি অনিষ্টকর অবস্থার ফল ভোগ করছে। প্রথমত হচ্ছে ব্যক্তিত্বের অভাব। স্যার ম্যালকম হেইলী ও লর্ড আরউইন সম্পূর্ণ নির্ভুলভাবে আমাদের ব্যাধি নিরূপণ করে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে বলেছিলেন যে, এই (মুসলিম) সম্প্রদায় নেতা জন্মাতে পারেনি। নেতা বলতে আমি সে-সব লোককে বুঝি, যাঁরা খোদায়ী দান অথবা অভিজ্ঞতা দ্বারা ইসলামের প্রাণবস্তু ও পরিণতি সম্পর্কে তীক্ষ্ম অনুভূতিসম্পন্ন এবং তার সাথে সাথে আধুনিক ইতিহাসের ধারা সম্পর্কেও যাদের তীক্ষ্ম অনুভূতি রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, এ ধরনের লোকেরাই হচ্ছেন এক একটা জাতিকে পরিচালিত করার মতো শক্তিসম্পন্ন, কিন্তু তাঁরা খোদার দান, ফরমাশ মোতাবেক তাঁদেরকে তৈরী করা যায় না। দ্বিতীয় যে অনিষ্টকর অবস্থার দরুন ভারতীয় মুসলিম জনগণ দুর্ভোগ ভুগছে, তা' হচ্ছে এই যে, জাতি তার সহজাত ঐক্যের মনোভাব *[herd instinct]* হারিয়ে ফেলছে দ্রুতগতিতে। এর ফলেই ব্যক্তি ও শ্রেণীবিশেষের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে জাতির সাধারণ চিন্তাধারা ও কর্মকুশলতার ক্ষেত্রে কোন দান না রেখে নিজস্ব পথে জীবন শুরু করা। আমরা ধর্মের ক্ষেত্রে শতাব্দী ধরে যা' করে এসেছি, রাজনীতি ক্ষেত্রেও আজ তা-ই করে যাচ্ছি। কিন্তু ধর্মের ক্ষেত্রে দলীয় কলহ আমাদের সংহতিকে ততোবেশী ক্ষতিগ্রস্ত করে না। তারা (ধর্মীয় দলসমূহ) অন্ততঃপক্ষে আমাদের জাতীয় সংগঠনের জন্য অপরিহার্য নীতির প্রতি মনোযোগী হয়ে থাকে। অধিকন্তু, এই নীতি এমন ব্যাপক ভিত্তিতে পরিকল্পিত হয়েছে যে, কোনো বিশেষ

দলের *[group]* পক্ষে এতটা বিদ্রোহী হওয়া প্রায় অসম্ভব, যাতে সে ইসলামের সাধারণ কাঠামো থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে। কিন্তু আমাদের জাতীয় জীবনের সর্বোত্তম স্বার্থের খাতিরে যখন সম্মিলিত কার্যক্রম অবলম্বনের প্রয়োজন, ঠিক সে মুহূর্তে রাজনৈতিক কর্মপন্থার বৈষম্য মারাত্মক প্রমাণিত হোতে পারে। তা' হোলে কি করে আমরা এ দু'টি অবস্থার প্রতিকার করবো ? প্রথম অনিষ্টকর অবস্থাটির প্রতিকার আমাদের আয়ত্তের মধ্যে নেই। দ্বিতীয় অনিষ্টকর পরিস্থিতির ক্ষেত্রে কোনোরূপ প্রতিকার খুঁজে বের করা আমার কাছে সম্ভব বলে মনে হয়। এ বিষয় সম্পর্কে আমার সুনির্দিষ্ট মতামত রয়েছে, কিন্তু যে পরিস্থিতির আশংকা করা হচ্ছে, প্রকৃতপক্ষে তার উদ্‌ভব না হওয়া পর্যন্ত তা' প্রকাশ করা স্থগিত রাখাই আমি ভালো মনে করি। অনুরূপ পরিস্থিতির উদ্‌ভব হোলে সকল মতানুসারী নেতৃস্থানীয় মুসলিমকে একত্র সমবেত হোতে হবে, কতকগুলি প্রস্তাব গ্রহণের জন্য নয়, বরং চূড়ান্তভাবে মুসলিম মনোভাব নির্ধারণের ও স্থায়ী সাফল্যের পথনির্দেশের জন্য। এই অভিভাষণে আমি এই বিকল্প পন্থার উল্লেখমাত্র করছি, কারণ আশা করি, আপনারা কথাটি স্মরণ রাখবেন এবং ইতিমধ্যে এ সম্পর্কে বিশেষভাবে চিন্তা করবেন।

ভদ্রমণ্ডলী, আমি আমার বক্তব্য শেষ করেছি। উপসংহারে আমি আপনাদেরকে না জানিয়ে পারছি না যে, ভারত-ইতিহাসের বর্তমান সংকট-পরিস্থিতিতে মিল্লাত *[community]* হিসাবে আপনাদের নিজস্ব স্বার্থের খাতিরে ও সমগ্রভাবে ভারতেরও স্বার্থের খাতিরে মুসলিম মিল্লাতের আকাংখা ও উদ্দেশ্যের পরিপূর্ণ সংহতি ও ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। ভারতের রাজনৈতিক দাসত্ব সমগ্র এশিয়ার পক্ষে অন্তহীন দুর্দশার উৎস হয়ে রয়েছে। তার ফলে প্রাচ্যের সঞ্জীবনী-শক্তি হয়েছে দমিত এবং তাকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত করেছে আত্ম-বিকাশের আনন্দ থেকে, যে আত্ম বিকাশের আনন্দ একদা তাকে এক মহান ও গৌরবময় তমদ্দুনের জন্মদাতা করে তুলেছিলো। যেখানে আমাদেরকে বাঁচতে হবে ও মরতে হবে, সেই ভারতভূমির প্রতি আমাদের কর্তব্য রয়েছে। এশিয়ার প্রতি, বিশেষ করে মুসলিম এশিয়ার প্রতিও রয়েছে আমাদের কর্তব্য। যেহেতু মুসলিম এশিয়ার সবগুলো দেশের সম্মিলিত শক্তির তুলনায় একটি মাত্র দেশের সাত কোটি মুসলিম অধিবাসী ইসলামের বহুগুণে অধিকতর মূল্যবান সম্পদ হিসাবে বিবেচিত হোতে পারে, সে কারণে ভারতীয় সমস্যার প্রতি আমরা কেবল মুসলিম দৃষ্টিভংগিতেই তাকাবো না, বরং সে সমস্যাকে আমরা দেখবো ভারতীয় মুসলিমের দৃষ্টিকোণ থেকে। একটি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের প্রতি নিবদ্ধদৃষ্টি সুসংহত আকাংখা ব্যতীত এশিয়া ও ভারতের প্রতি আমাদের কর্তব্য আনুগত্য সহকারে সম্পন্ন করা সম্ভব হোতে পারে না। ভারতের রাজনৈতিক সত্তাসমূহের অন্যতম রাজনৈতিক সত্তা হিসাবে আপনাদের নিজস্ব স্বার্থের খাতিরে এ ধরনের প্রস্তুতির অপরিহার্য প্রয়োজন। আমাদের বিশৃংখল অবস্থা মিল্লাতের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সমস্যার ক্ষেত্রে বহু বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে। আন্তঃ-সাম্প্রদায়িক সমঝোতা সম্পর্কে আমি হতাশাবাদী নই, কিন্তু আমি আপনাদের কাছে এ মনোভাব গোপন করতে পারি না যে, অদূরভবিষ্যতে বর্তমান সংকট পরিস্থিতির মোকাবিলা

করার জন্য মুসলিম মিল্লাতের পক্ষে স্বতন্ত্র কার্যক্রম অবলম্বনের প্রয়োজন আসতে পারে। অনুরূপ সংকটপরিস্থিতিতে স্বতন্ত্র ধারায় রাজনৈতিক কার্যক্রম অবলম্বন কেবল একটিমাত্র উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীভূত একটিমাত্র আকাংখাসম্পন্ন দৃঢ়-সংকল্প জাতির পক্ষেই সম্ভব হোতে পারে। এক ঐক্যবদ্ধ আকাংখার সুসংবদ্ধ সামগ্র্যে পৌঁছা কি আপনাদের পক্ষে সম্ভব ? হাঁ, নিশ্চয়ই সম্ভব। দলীয় স্বার্থ ও ব্যক্তিগত আকাংখার উর্ধ্বে উঠুন ; এবং আপনাদের ব্যক্তিগত *[individual]* ও সমষ্টগত *[collective]* কার্যকলাপ যতোই বস্তুবাদী উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হোক, আপনাদের অনুসৃত আদর্শের আলোকে তার মূল্য নির্ধারণ করতে শিখুন। বস্তু থেকে আত্মার দিকে ফিরে আসুন। বস্তু *[Matter]* হচ্ছে অসমতা *[diversity]*; আত্মাই *[spirit]* আলোকে, জীবন ও ঐক্য। মুসলিম জাতির ইতিহাস থেকে একটি শিক্ষা আমি পেয়েছি। ইতিহাসের যে-কোনো সংকট মুহূর্তে ইসলামই বাঁচিয়ে দিয়েছে মুসলিম জাতিকে, মুসলিম জাতি ইসলামকে বাঁচাননি *[At critical moments in their history it is Islam that has saved the Muslims and not vice versa]*। আজো যদি আপনারা ইসলামের প্রতি আপনাদের দৃষ্টিনিবদ্ধ করেন এবং ইসলামে সমন্বিত চিরন্তন প্রাণ-সঞ্চারী ধারণা থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করার চেষ্টা করেন, তা' হোলে তার ফলে আপনারা কেবল আপনাদের বিচ্ছিন্ন শক্তিকেই পুনরায় সুসংবদ্ধ করবেন, আপনাদের হারানো বৈশিষ্ট্য পুনরুদ্ধার করতে পারবেন এবং তা' দ্বারা আপনারা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যাবার বিপদ-সম্ভাবনা থেকে আত্মরক্ষা করতে পারবেন। কোরআন মজীদের একটি অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ আয়াত থেকে আমরা শিক্ষা পেয়েছি যে, সমগ্র মানবতার জন্ম ও পুনর্জন্ম একটিমাত্র ব্যক্তির জন্ম ও পুনর্জন্মেরই অনুরূপ। জাতি হিসাবে আপনারা যখন মানবতার এই সুন্দরতম *[superb]* ধারণার সর্বপ্রথম বাস্তব অনুসারী হবার দাবীদার, তখন কেন আপনারা জাতি হিসাবে গতিশীল জীবন যাপন করতে ও ব্যক্তির ন্যায় বিশিষ্ট সত্তা অর্জন করতে পারবেন না ? আপাতদৃষ্টিতে আমাদের যেমন প্রতীয়মান হয়, ভারতের পরিস্থিতি ঠিক তেমন নয়, এই উক্তি করে আমি কোনো রহস্যজাল সৃষ্টি করবার চেষ্টা করছি না। এর তাৎপর্য কেবল তখনই আপনাদের কাছে স্পষ্টভাবে ধরা পড়বে, যখন তা' দেখার মতো বাস্তব সমষ্টি-সত্তা *[real collective ego]* আপনারা অর্জন করবেন। কোরআন মজীদের কথায় ঃ

علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم

'মজবুত করে আঁকড়ে ধর তোমার আত্মাকে; যারা বিভ্রান্ত, তারা কেউ তোমার অনিষ্ট করতে পারে না, যদি তুমি হও সত্যপথের অনুসারী।'

[সৌজন্যে ঃ পাকিস্তানের ঐতিহাসিক পটভূমি]

ইকবাল

[১৮৭৭–১৯৩৮]

বিংশ শতকের প্রারম্ভে ভারতীয় রাজনীতিতে এক নব যুগের সূচনা হয় ১৯০৬ সালে ঢাকায় মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠায়। সৈয়দ আহমদের প্রচেষ্টায় যে রাজনৈতিক চেতনাবোধ মুসলমানের জাতীয় জীবনে সূচিত হয় তারই অনুপ্রেরণা এক নব আশার সঞ্চার করে ; নবরূপে প্রকাশিত হয় ইকবালের। তরুণ কবি-দার্শনিক ইকবালের দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবোধ, —সর্বোপরি ধর্মীয় চেতনাবোধ– তার অমর লেখনী প্রসূত কাব্য–কবিতা ভারতীয় মুসলমানের সম্যক অবস্থা বিশ্লেষণে ও অনুধাবনে যথেষ্ট সাহায্য করে। তার সামনে দু'টো প্রশ্নই প্রকট হয়ে দেখা দেয়, একটা ধর্মীয়, আর একটা রাজনৈতিক। *'ইসলামে ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন'*-এ তিনি বলেন, *'আধুনিক মুসলমানদের কাজের অন্ত নেই। অতীতের সংগে যোগসূত্র না হারিয়ে ইসলামী জীবনধারার সমগ্র রূপ সম্বন্ধেই তাকে নতুন করে চিন্তা করতে হবে। এর জন্য আমাদের সামনে একটা পথ রয়েছে, তাহ'ল অত্যন্ত নিরপেক্ষ ও সশ্রদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করা এবং তারই মানদণ্ডে ইসলামের শিক্ষার মর্মানুধাবন করা। তাতে যদি আমাদের পূর্বসুরিদের সংগে মতের মিল না হয় সে জন্য আমাদের তৈরী থাকতে হবে।'* এখানে বৈপ্লবিক দৃষ্টিতে ইসলামের পুনর্গঠনের প্রতি তাঁর আহ্বান। বস্তুতঃ ধর্ম হিসাবে ইসলাম গতিশীল, শক্তি হিসাবে প্রগতিপন্থী– যুগের মন ও মননের সংগে সংগতিসম্পন্ন। ইসলামী স্বরূপের মূর্ত প্রকাশের অভাবে মুসলমান সম্বিতহারা– আত্মচেতনা শূন্য। তাই ঘুমন্ত জাতিকে জাগিয়ে তোলার জন্য তাঁর শাণিত লেখনী দিল প্রাণ সঞ্চারিণী অমর বাণীসমূহ কাব্যে, দর্শনে– যা জীবনের শিক্ষাদর্শনে ভরপুর। তার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সুচিন্তিত রাজনৈতিক মতবাদ– *'ভারতীয় মুসলমানদের সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণাকে স্বতন্ত্রভাবে রূপায়িত করতে হলে তাদের জন্য একটা স্বতন্ত্র আবাসভূমি চাই।'* এ মর্মকথা সকলের চোখের সামনে ধরে তুলল একটা নতুন আলো– পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টার ভবিষ্যত ইংগিত।

•

ভারতীয় রাজনীতির ঘূর্ণায়মান আবর্তে সমস্ত মুসলিম জাতি যখন দিশেহারা, শতধা বিভক্ত, তখন তিনি সংহতি ও ঐক্যের বাণী শুনিয়ে সকলকে সংঘবদ্ধ ও শক্তিমান করে তুলতে সচেষ্ট হন। বিশ্বাস ও দৃঢ় সংকল্প নিয়ে জাতির সংহতি স্থাপনে যে সাধনা, মনোবল, আদর্শনিষ্ঠা ও কর্মশক্তির পরিচয় তিনি দিয়েছেন সে সম্পর্কে কায়েদে আজমের প্রশস্তি অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য : *'তিনি (ইকবাল) আমার কাছে ছিলেন বন্ধু, পথপ্রদর্শক ও দার্শনিক। মুসলিম লীগের চরম সংকটকালে সব সময় তিনি অটল পাহাড়ের মত আমার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মুহূর্তকালের জন্যও তিনি কোন দিন দমে যাননি। মুসলিম চিন্তা ও সংস্কৃতির তিনিই ছিলেন সার্থক বীণাবাদক। জগতের সুন্দরতর কাব্য তাঁর বীণা থেকে স্বতোৎসারিত হয়েছে। যতদিন ইসলাম থাকবে ততদিন তাঁর নামও থাকবে অম্লান হয়ে। তাঁর কাব্যে মুসলমানদের যথার্থ আশা-আকাঙ্ক্ষা মূর্ত হয়ে উঠেছে। তা থেকে আমরাই যে শুধু প্রেরণা পাই তা নয়, আমাদের*

বহু পুরুষ পরের মুসলমানরাও ইকবালের কাব্য থেকে সমভাবে প্রেরণা পাবে।'

শিক্ষা-দর্শন

ইকবালের শিক্ষা-দর্শন কতকগুলি প্রেরণাত্মক বলিষ্ঠ চিন্তাধারায় সমৃদ্ধ— সকল কালের সকল মানুষের জন্য অমৃত বাণী। তাঁর মতে *'খুদী'* বা অহম হচ্ছে জীবনের পূর্ণ সংগঠনের কেন্দ্র ও ভিত্তিমূল। ব্যক্তিত্বের বিকাশেই ব্যক্তি মহিমান্বিত, সমাজ গৌরবান্বিত এবং জাতি সমুন্নত। শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যও ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ। কবি বলেন ঃ

'প্রত্যেক বস্তুই আত্মবিকাশের জন্য উন্মুখ ;
প্রত্যেক অণু মহত্ত্বলাভের প্রয়াসী,
জীবন এই গতিবেগ ব্যতীত সূচনা করে মৃত্যুর।
আর ব্যক্তিত্বের পূর্ণতা দ্বারা
মানব হয় ঐশী গুণসম্পন্ন ;

ব্যক্তি ও সমাজ

ব্যক্তির পরিপূর্ণ রূপ প্রকাশিত হয় সমাজের সংস্পর্শে। তাই ব্যক্তি ও সমাজ পরস্পর সম্পৃক্ত। একে অন্য ছাড়া অসম্পূর্ণ। ব্যক্তি সমষ্টিরই অংশ, আর সমষ্টির মাঝেই ব্যক্তির পূর্ণ বিকাশ। 'মানুষের আত্মপ্রকাশের ও আত্মপ্রত্যয়শীলতার জন্য সমাজের উপর তাকে নির্ভর করতে হয়। ব্যক্তি যখন নিজকে সমাজ-দেহের সংগে অভিন্ন করে তুলতে পারে, তখনই সে অতীত ঐতিহ্যের প্রতীকরূপে গণ্য হয় এবং তখনই তাকে কেন্দ্র করে অতীত ও ভবিষ্যত একই সংগে মূর্ত হয়ে উঠে।'

ব্যক্তির অস্তিত্ব সমাজের সংযোগে
একা সে কিছুই নয়।
তরংগের অস্তিত্ব থাকে নদী বক্ষে,
নদীর বাইরে সে কিছু নয়।
ব্যক্তি অর্জন করে গুরুত্ব সমাজ থেকে।
সমাজ লাভ করে তার সংহতি ব্যক্তির ভিতর দিয়ে।
সমাজ তাকে অনুপ্রাণিত করে আত্মবিকাশের আকাঙ্ক্ষায় ;
আর সমাজের মান নির্ণীত হয় তারই কার্য দ্বারা।

ইকবালের মতে, আদর্শ সমাজের আটটি বৈশিষ্ট্য এবং এ বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করেই শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠবে ঃ

১. সমাজের ভিত্তি হবে– আল্লাহ্র একত্ববাদের আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর।

২. সমাজের কেন্দ্র হবে– প্রেরণাত্মক নেতৃত্বের উপর তথা জাতীয় আদর্শের উপর।

৩. সমাজের কতকগুলো পরিচালন বিধি থাকবে– তা আসবে কোরআন থেকে।

৪. সমাজের একটা কেন্দ্র থাকবে– যা হবে কৃষ্টি ও সৃষ্টির উৎস।

৫. জীবনের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য সমাজের সকলকে চেষ্টা করতে হবে।

৬. পরিবেশের প্রাকৃতিক প্রভাবের উপর সমাজের প্রভুত্ব থাকবে।

৭. ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের ন্যায় সমাজের সামাজিকত্ব ফুটিয়ে তুলতে হবে।

৮. সমাজ হবে মাতৃত্বের গুণাবলীতে সমৃদ্ধ।

প্রকৃতির পরিবেশে শিক্ষা

মানুষ প্রকৃতির সন্তান। প্রকৃতির মাঝেই শিশুর বর্ধন সুন্দর হয়। শিক্ষার সঙ্গে যদি চার পাশের প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিচয় না থাকে, শ্রেণীকক্ষের চার-দেয়ালের মাঝে আটকে রেখে যদি বাচনিক ও কাল্পনিক শিক্ষাই শুধু দেয়া হয়, তবে শিক্ষা হবে জীবন সংযোগ বঞ্চিত। শিশুকে প্রকৃতির বিচিত্র রূপের সঙ্গে পরিচিত করার প্রয়োজনেই তিনি বলেছেন ঃ

তোমার গৃহের অংগন যদি
আলোর ধারায়
প্লাবিত করতে চাও,
তবে সূর্য-লোকের চলার পথে,
প্রাচীর দাঁড় করো না।

শিক্ষার স্থান শুধু স্কুল গৃহ নয়। চার পাশের প্রকৃতিও। খেলার মাঠ, ফলের বাগান, ধানের ক্ষেত, শ্যামল বনানী।

নারী শিক্ষা

নারী শিক্ষার কি রূপ হবে কবির চোখে তা বাদ পড়েনি। পাশ্চাত্যের নারী শিক্ষার আদর্শ আমাদের দেশেও জাতির জন্য কল্যাণপন্থী নয়। অথচ সে আদর্শই দেশ গ্রহণ করছে। তাই তিনি ব্যঙ্গ করে বলেছেন ঃ

'মেয়েরা সব ইংরেজী পড়ছে, জাতি সফলতার পথ পেয়েছে খুঁজে। পাশ্চাত্যের চোখ ধাঁধানো আলো আমাদের দৃষ্টিকে করেছে আচ্ছন্ন। তাই প্রাচ্যের রীতি হয়েছে পাপ। এই অভিনয়ের শেষ দৃশ্য কি ? পর্দা তোলার সময়টুকুই যা বাকী।'

স্ত্রী শিক্ষার বিরুদ্ধাচরণ তিনি করেননি, বরং নারীকে শিক্ষিত করে তোলার উপরই জাতির প্রগতি নির্ভর করছে সে কথাও বলেছেন ঃ

'মাতৃজাতিই কোরআন ও জাতির শক্তি।' ধর্মীয় শিক্ষা বিবর্জিত নারী শিক্ষার প্রতি তিনি কটাক্ষ করেছেন। বস্তুত ধর্ম ব্যতীত জীবনের ভিত্তি শিথিল হয়। পারিবারিক ও আত্মিক জীবন সুন্দররূপে গড়ে উঠে না।

নারী শিক্ষার পাঠ্যসূচী সাধারণ শিক্ষার পাঠ্য বিষয়কোষের একই রূপে রচিত হবে না। সৃষ্টির মাঝে পুরুষ ও নারীর জীবনের গতি-প্রকৃতি যেমন বিচিত্র, তাদের জন্য শিক্ষার ধারাও হবে তেমনি প্রকৃতিগত– পারিবারিক ও সামাজিক প্রয়োজনমাফিক।

জীবন ও সাধনা

জীবনই সংগ্রাম। সংগ্রাম ব্যতীত আত্মপ্রতিষ্ঠা মানুষের জীবনে সম্ভব নয়। অবিশ্রান্ত সংগ্রাম ও কর্মতৎপরতাপূর্ণ জীবনই ইকবাল দর্শনের মূলকথা। মানুষের সুপ্ত শক্তির বিকাশ ও উন্নতির সম্ভাবনা সংগ্রামের মাঝেই লুক্কায়িত। 'যত গভীর অভিনব, বিচিত্র, কর্মবহুল, বিপদসংকুল ও সংগ্রামপূর্ণ হবে তার অভিজ্ঞতা, তত বেশী বর্ধিত হবে তার জ্ঞান ও শক্তি এবং বিকশিত হবে ব্যক্তিত্ব ও সৃজনী প্রতিভা।' জীবন সংঘাতসংকুল। ভয়-ভীতি, বাধা-বিপত্তি, বিপর্যয়, পরাজয় এগুলো জীবনপথের নিত্যকার ঘটনা। কিন্তু এসব আত্মবিকাশের প্রতিবন্ধক নয়, বরং পরীক্ষার ভিতর দিয়ে আৎমোন্মেষের পথ। সংগ্রামের মাঝেই মানবজীবনের বলিষ্ঠ পরিচয় আর জীবনের অনন্ত সম্ভাবনার সমুজ্জ্বল পরিব্যাপ্তি তারই মধ্যে ঃ

'জীবনের মর্যাদা রয়েছে কাঠিন্যের মধ্যে,
দৌর্বল্য কেবল অপক্কতা ও হীনতারই প্রমাণ।'

উদ্দেশ্য, সাধনা ও নব নব প্রচেষ্টাই মানবের মৌলিক প্রতিভা বিকাশের সহায়ক। নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলাতে ও নতুন পথ সৃষ্টি করার মধ্যেই জীবনের সার্থকতা। পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ ও গবেষণা দ্বারা প্রাকৃতিক শক্তিকে করায়ত্ত করে স্বীয় সৃজনী প্রতিভার সাহায্যে সুন্দরতর বিশ্ব সৃষ্টিতে সহায়তা করাই শিক্ষার একটা প্রধান উদ্দেশ্য। অথচ অনুকরণপ্রিয়তা আমাদের একেবারে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে। আমরা গতানুগতিক পথে চলতেই অভ্যস্ত। এ পথে আমাদের অগ্রগতির সম্ভাবনা নেই। তাই নতুন পথ সৃষ্টির জন্য তাঁর আহ্বান ঃ

'প্রশংসা করি আমি সেই পথচারীর
যে ঘৃণা করে পদক্ষেপ করতে গতানুগতিক পথে
যে পথে নেই মরুভূমি পর্বত ও নদী।'

তিনি আরও বলেন ঃ

'তোমার পথ কেটে নাও
নিজের কুঠারে;
অন্যের পায়ে চলা পথ
অনুকরণ করা পাপ।'

মানবজীবনে চেষ্টার অতীত কিছুই নেই। কর্মচঞ্চল জীবনই সার্থক জীবন। নিষ্কর্মা জীবন তার কাছে মৃত্যুতুল্য। সৃষ্টিধর্মী হওয়া ব্যতীত জীবনে প্রগতি আসতে পারে না। তাঁর উদাত্ত আহ্বান ঃ

'জাগ্রত হও।
সৃষ্টি করো একটা নতুন জগত।
জীবনশক্তির প্রকাশ আর তার উৎস–
বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা, নব নব সৃষ্টি।'

ইতিহাসের শিক্ষা

ইতিহাসের শিক্ষা মানুষের জন্য এক অমূল্য সম্পদ। ইতিহাস অতীত স্মৃতি, জ্ঞানের আকর, অভিজ্ঞতার দর্শন। ইতিহাস জোগায় অফুরন্ত প্রেরণা, জাগায় আত্মমর্যাদাবোধ, প্রাণে সঞ্চার করে নব নব শক্তি, তৈরী করে সৃষ্টিধর্মী মন –বলিষ্ঠ চিন্তাধারা। অতীত ইতিহাস বর্তমান ও ভবিষ্যতের সংযোজক, মানবজাতির জন্য নতুন গতিপথ নির্দেশক। শিক্ষার বুনিয়াদও স্থাপিত হবে অতীত কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের উপর ঃ

'তোমার বর্তমান মাথা তোলে অতীতের ভিতর দিয়ে,
তোমার ভবিষ্যত জন্ম নেয় বর্তমান থেকে।
ইতিহাস তোমায় করবে আত্মসচেতন,
কর্মে বীর্যবান, গবেষণায় নিপুণ।
অর্জন করতে চাও চিরন্তন জীবন ?
তা হলে ছিন্ন করো না অতীতের বন্ধন
বর্তমান ও ভবিষ্যত থেকে।'

স্বাধীনতা বনাম পরাধীনতা

ইকবাল বিশ্বাস করতেন স্বাধীনতা ব্যতীত জীবনের অনন্ত সম্ভাবনা অথবা ব্যক্তি বা জাতির অন্তর্নিহিত শক্তিমত্তার পূর্ণ রূপায়ণ অসম্ভব। শৃংখলিত জীবন বাধা-নিষেধের কঠোর নিগড়ে অচল, অসার। ব্যাপ্তি পথ সেখানে নেই, স্বতঃস্ফূর্ত স্ফুরণের গতিবেগ অবরুদ্ধ। সেখানে প্রতিটি মানুষের অন্তরতলে ধুঁকে মরে শত আকাঙ্ক্ষা। কবি বলেন ঃ

'দাসত্বে জীবন পরিণত হয় ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীতে।
স্বাধীনতা তাকে করে তোলে সীমাহীন সমুদ্র।
গোলাম হয় অনুকরণশীল –মৌলিকত্বহীন তার অভিজ্ঞতা।
আজাদ মানুষ সর্বক্ষণ সৃষ্টিধর্মী।'

দারিদ্র্য আর জীবন

মানুষের জীবনে দারিদ্র্য একটা অভিশাপ। ব্যক্তিত্ব সেখানে ডুবে যায়, মনুষ্যত্ব হয় পরাজিত ; আত্মিক বল হয় বিনষ্ট। দারিদ্র্য প্রপীড়িত মানুষ দুর্বলতার আশ্রয়ে হয়ে উঠে প্রাণহীন। সৃষ্টিধর্মী প্রাণ তার হয়ে পড়ে নিষ্কর্মা। দৃষ্টি তার ক্ষীণ, হাত তার শিথিল, মন তার সংকীর্ণ, গতি তার প্রাণহীন ঃ

'দারিদ্র্য অবনমিত করে আত্মাকে
আর বঞ্চিত করে আত্মার সিনাইকে আলো থেকে।'

তাই সমাজ থেকে দারিদ্র্য্য, অভাব-অনটন বিদূরণের প্রচেষ্টা হওয়া উচিত। আর্থিক অসচ্ছলতা ব্যক্তি ও জাতির উন্নতির পথে একটা প্রবল অন্তরায়।

ধর্মীয় জীবন

কাজে ও চিন্তায়, সাধনায় ও লক্ষ্যে ইসলামের মূলনীতির উপর ইকবালের ছিল প্রগাঢ় বিশ্বাস। মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আরাধনা, জীবন, মরণ সবই সর্বশক্তিমানের নিকট সমর্পিত। শরীয়ত, তরিকত ও মারেফতের ক্রিয়াকলাপের সাহায্যে মানুষ *'কামিল ইনসান'* বা পরিপূর্ণ মানুষ পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে–এ ছিল তাঁর ধর্মীয় বিশ্বাস এবং এসবের মূল উৎস কোরআনের দিকে ফিরে যাওয়ার জন্য তাঁর ইংগিত সুস্পষ্ট। কোরআনের শিক্ষা ব্যতীত জাতির মুক্তি নেই। তাই তাঁর অমোঘ বাণী ঃ

'কোরআন মোমেনের হৃদয়ের শক্তি,
তার জ্ঞান জাতির জন্য সুদৃঢ় রজ্জু;
তার অঞ্চল ছেড়ে দেয়ার অর্থ–মৃত্যু,
ব্যক্তির মৃত্যু–জাতির মৃত্যু।'

কিন্তু আমাদের জীবনে ধর্মবিমুখতা ও অনৈসলামিক প্রভাব আমাদের বিভ্রান্ত করে তুলেছে। তাই দুঃখেই তিনি বলেন ঃ

'আমাদের যুগ, আমাদের নিজস্ব কৃষ্টি এবং মহানবীর সুন্দর আদর্শ থেকে আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করে তুলেছে।'

সে জন্যই ইসলামী জীবনে জাতিকে পুনরুজ্জীবিত করতে হলে প্রয়োজন–ধর্মীয় শিক্ষা ও জাতীয় কৃষ্টির উপর শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন। [সৌজন্যে ঃ শিক্ষানীতির কয়েকটি কথা]

জাগরণের পথে আফ্গানী

[১৮৩৯—১৮৯৭]

স্যার সৈয়দ আহমদের সমসাময়িক যে অগ্নিপুরুষ সারা মুসলিম জাহানে জাগরণের বাণী বহন করে ফিরেছেন, সম্বিতহারা মুসলিম জাতির প্রাণে নবজীবন সঞ্চার করে নবযুগের সূত্রপাত করেছেন,—তিনি হচ্ছেন যুগ নকীব, প্রাচ্যের অগ্নিপুরুষ জামালউদ্দীন আফ্গানী। প্রাচ্য-প্রতীচ্যের এমন কোন দেশ নেই যেখানে এ মহাপুরুষের উপস্থিতি ও অগ্নিবর্ষণে একটা উন্মাদনাময় প্রাণ চঞ্চলতার সৃষ্টি হয়নি। মিসর, তুরস্ক ও ইরান তাঁর দীক্ষায় দীক্ষিত হয়েই জাতীয় জীবনে নব যুগের সূচনা করতে সমর্থ হয়েছে। তাঁর প্রতিভাদীপ্ত জীবনের স্পর্শ যারা পেয়েছে, তারা তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার নিকট শুধু মাথাই নত করেননি, বরং তাঁর শিক্ষা মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছেন। আল আযহার-ইস্তাম্বুলে শিক্ষক জীবনে তিনি যে যুক্তিবাদ প্রচার করেছেন, দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবোধ ও ধর্মীয় আনুগত্যবোধ সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছেন, তারই ফলে— *'দিকে দিকে ঐ পুনঃ জ্বলিয়া উঠেছে ইসলামী লাল মশাল'*। সত্যিই আফগানীর আবির্ভাব মুসলিম জাহানের জন্য এক অপূর্ব নিয়ামত। তাঁর বাণী যেমনি প্রেরণাত্মক, তেমনি জাতীয়তা সঞ্চারণী প্রবাহে ভরপুর। তাঁরই নিম্নোক্ত উক্তি ক'টি উহার প্রমাণ ঃ

১. কুরআনের দিকে আমাদের দৃষ্টি ফিরাতে হবে।
২. প্রাচ্যের জড়বাদ নয়, কুরআনের আদর্শকে আমাদের জীবনে রূপায়িত করতে হবে।
৩. ধর্ম জাতির অস্তিত্বের ভিত্তি, মানুষের আনন্দ উৎস। ধর্মভিত্তিক কৃষ্টি ও সভ্যতাই সত্যিকারের সভ্যতা।
৪. ইসলাম স্থিতিশীল ধর্ম নয়, গতিশীল ধর্ম, স্থান-কালের পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনানুযায়ী ইজতেহাদের স্থান ইসলামে বিদ্যমান।
৫. জাতির অন্তর থেকে কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসের কলুষ নাশ করতে হবে।
৬. ইউরোপীয় সভ্যতার অন্ধ অনুকরণ করা উচিত নয়। মহানবীর জীবনই আমাদের একমাত্র আদর্শ।
৭. জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ও বাস্তব প্রয়োগের ভিতর দিয়ে ইসলামের আধুনিকতা ও প্রগতিশীলতা প্রমাণ করতে হবে।
৮. বস্তুজগত ও আত্মিক জগত—এ দু'য়ের সমন্বয়েই গঠিত হবে ইসলামী জীবন।
৯. ধর্ম ও শিক্ষা অন্ধ বিশ্বাসের পরিবর্তে যুক্তিবাদের উপর স্থাপন করতে হবে।
১০. যারা জাতিকে বিদ্যা ও নীতি শিক্ষা দেয়ার ভার গ্রহণ করেন—তারা নিশ্চয়ই মনের ও আত্মার চিকিৎসক।
১১. মানুষ মাত্রেরই নিষ্কলঙ্ক চরিত্র গঠনের মৌলিক অধিকার আছে এবং তা অর্জনের স্পৃহা ও চেষ্টা থাকা চাই।
১২. সাম্রাজ্যবাদী শোষক শক্তির কবল থেকে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে মুক্ত করতে হবে। স্বীয় ক্ষুদ্র স্বার্থের পরিবর্তে বৃহত্তর স্বার্থের জন্য দুনিয়ার সব মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে এক ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করতে হবে। তাতেই মুসলমানের মঙ্গল নিহিত আছে।

[সৌজন্যে ঃ শিক্ষানীতির কয়েকটি কথা]

খোশহাল খানের ওসিয়ত

মূল ঃ ইকবাল

হাস্‌নাইন ইমতিয়াজ অনূদিত

মিল্লাতেরই একাত্মতায় গোত্র-সকল বিলীন হলে
আফগানীদের মর্যাদা মান তখন শুধুই বুলন্দ হবে।

সেই যুবকের জন্যে আমার প্রেম-অনুরাগ সমর্পিত—
নক্ষত্রেরও পুঞ্জে যারা আপন হাতে ফাঁস পরাবে।

শৌর্য-বীর্যে মুঘল থেকে কোন রূপেই হীন তো নয়
পাহাড়-গিরি-শৈলদেশের এই সাহসী বালক সবে।

বন্ধু ! আমি তোমার কাছে মনের কথা বলছি, শোনঃ

সেই সমাধি খোশাল খানের নিজের জন্যে পসন্দ হবে

যেখানটাতে শৈলবায়ু কভুও মুঘল অশ্বারোহীর
অশ্বখুরের ধুলির কণাও উড়াবে না হীন্ গরবে।

আফগান জাতি-চেতনার স্থপতি, আফগান জাতির নিরাপোষ ও সংগ্রামী জীবন-সাধক, দুর্ধর্ষ সেনানায়ক এবং পুশতুসাহিত্যের 'বাবা'রূপে ['বাবা-ই-পুশতু'] স্মরণীয় মুঘলবৈরী খোশহাল খান খটকের ব্যক্তিত্ব ও অবদানের প্রতি আল্লামা ইকবাল অকুণ্ঠ স্বীকৃতি জানিয়েছেন। তাঁর 'বালে-জিবরীল'-এ 'খোশহাল খান কী ওসিয়্যত' শিরোনামের এই কবিতাটির পাদটীকায় ইকবাল মন্তব্য করেন ঃ

'খোশহাল খান খটক পুশতু ভাষার সুপ্রসিদ্ধ দেশপ্রেমিক কবি ছিলেন। তিনি মুঘলদেরর কব্জা থেকে আফগানিস্তানের মুক্তির জন্যে সীমান্ত অঞ্চলের আফগান গোত্রসমূহের সমন্বয়ে সেনাদল গঠন করেন। গোত্রগুলোর মধ্যে শুধুমাত্র আফরীদীরাই শেষ পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে ছিল। তাঁর প্রায় ১০০টি কবিতার ইংরেজী অনুবাদ ১৮৬২ খৃস্টাব্দে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয়।' —অনুবাদক।

ইকবালের কবিতা

মতিউর রহমান মল্লিক

☐ *হে খোদা মোর প্রার্থনা এই*
তোমার দুয়ারে
খুব সাধারণ অন্তর-চোখ
দাওগো আমারে

☐ *দৃষ্টিশক্তি দাওগো প্রভু*
ভাগ্যাহত মানুষদের
দেখেছি হায় এই আমি যা
দাও দেখিয়ে তা তাদের

☐ *একটি মাত্র দিন-রজনীর*
সফল বিজয় এলে
ডুব দিওনা ভোগ-বিলাসে
দায়-দায়িত্ব ফেলে
সামনে অনেক মনজিল আছে
অনেক যুগ যে আর
সব করতলগত করার
আয়ত্তে আনবার

☐ *প্রেম-দুয়ারে নীড় বাঁধো হে*
তৈরী করো যুগ নবীন
সৃষ্টি করো নতুন সকাল
নতুন সন্ধ্যা ক্লান্তিহীন

দেখেছো কি চিন্তা করে
হে মুসলমান নওজোয়ান
কোন্ আকাশের বিচ্ছুরিত
তারা তুমি জ্যোতিষ্মান

সব কাফেরই যুদ্ধ করে
ভরসা তার তলোয়ার
মোমিন সে তো ঝাঁপিয়ে পড়ে
হোকনা খালি হাত তাহার।

একটি লক্ষ্য যায় হারিয়ে
যদি কভুও
পায় না যেন নাগাল হুতাশ
তোমার তবুও
আরো আছে শত উপায়
শত উপাদান
ঘুরছে আজো কালের চাকা
সময় অফুরান।

[আল্লামা ইকবালের বিভিন্ন কবিতার স্বর্ণখণ্ড]

ইবলীসের পরামর্শ-সভা

মূলঃ ইকবাল

মনীর উদ্‌দীন ইউসুফ অনূদিত

ইবলীস

পঞ্চভূতের লীলা ভূমি এই মোহ-সুন্দর প্রাচীন ধরা,
আরশবাসীর বাসনার খুন শুষিয়াছে যার ধূলির খরা।
এরি ধ্বংসের আয়োজনে আজ লিপ্ত হয়েছে তাঁহার হাত,
যিনি এর নাম রেখেছেন সুখে 'কুন্ ফায়াকুন' সৃষ্টি-রাত।
আমি দেখায়েছি য়ুরোপবাসীরে রাজ্যলোভের স্বপন এক,
আমি ভাঙ্গিয়াছি মস্‌জিদ আর গীর্জা ঘরের যত না ভেক।
সঙ্গতিহীনে আমি শিখায়েছি ভাগ্যের কথা যতন করি,
ধনীর চক্ষে পুঁজির স্বপন লোভন-শোভন দিয়েছি ধরি।
কে পারিবে আজ করিতে ঠাণ্ডা দৃপ্ত সে শিখা বহ্নিমান ?
লেলিহ জিভেতে লুকায়ে যাহার শয়তানী তাপ অণু সমান।
যে-তরু তুলেছে আকাশেতে শির আমারি জলের সেচনে আজ,
কে পারিবে তার নোয়াইতে মাথা ? লাজে ফিরে যাবে দৃপ্ত বাজ !

প্রথম পারিষদ

সন্দেহ নেই, আছে মজবুত শয়তানী রাজ দুনিয়া পর,
জনগণ যার অমিত প্রভাবে গোলামির মাঝে মত্ততর।
অনাদি হইতে মানব-ভাগ্যে রয়েছে প্রণতি আমরা জানি,
'কেয়াম' তাহার নাহিক নমাজে 'সিজদাই' শুধু নিয়াছে মানি।
এমন হৃদয়ে রহে না বাসনা, –যদি বা কখনো জন্ম লয়,
অকাল-মৃত্যু সাথী হয় তার, অথবা পঙ্গু হয়ে সে রয়।
বিপুল যত্নে ধর্মে এমন ধরাতে পেরেছি আমরা চিড়,
সূফী ও মোল্লা দু-ই আছে আজ শক্তির কাছে নোয়ায়ে শির।
প্রাচ্যের তরে এমনি আফিম প্রয়োজন ছিল, তাই তো জানি–
*'কাওয়ালী'র চেয়ে বেশী কিছু আর হয়নি 'ইলমে কালাম' * বাণী।*

---

* *কবি মনে করতেন যে, প্লেটোর প্রভাব-জাত মুসলমান দার্শনিকদের রচনায় ইসলামের কর্ম-প্রেরণার মৃত্যু ঘটেছিল।*

কা'বারে ঘিরিয়া 'তওয়াফে'র ধুম যদি বা রয়েছে, কিসের ভয় ?
মুসলমানের তলোয়ারে আজ ধার নেই, ভোঁতা পড়িয়া রয়।
বলিতে পার কি কাহার হতাশা গড়িয়াছে এই যুক্তিবাদ ?
*'মুসলিম তরে হারাম জেনো গো, এযুগে সকল যুদ্ধ-স্বাদ' * ।*

দ্বিতীয় পারিষদ

তবু বল দেখি গণতন্ত্রের বুলি সে কেমন মোদের লাগি ?
দেখিতেছি আমি, বিপদ যেন গো গণরাজ নামে উঠিছে জাগি।

প্রথম পারিষদ

জানি তাহা সখা ; কিন্তু আমার বিশ্ব-জ্ঞানের বিজ্ঞতাতে,
বলিতেছি, এটি বহু পুরাতন, বিপদ কিছুই নাহিক তাতে।
আমরাই আজ বাদশাহীকে যে সাজায়েছি গণ-পোশাক সাজে,
যখন দেখেছি আত্ম-বোধন কিছুটা জেগেছে মানুষ মাঝে।
রাজ্য-শাসন রীতির তত্ত্ব গুরুতর এক হেয়ালি যার–
রাজা ও নেতার সংজ্ঞার মাঝে খুঁজে পাবে নাকো অর্থ তার।
গণপরিষদ কিংবা তখ্‌ত একই চিত্রের দুইটি দিক,
অপরের জমি প্রতি যার চোখ, সেই রাজা, নাম যাহাই নিক।
তুমি কি দেখনি কি রূপ ধরেছে পশ্চিমে গণতন্ত্র রাজে ?
মুখেতে সদাই স্ফুরিছে হাস্য, অন্তরে তার চেঙ্গিস রাজে !

তৃতীয় পারিষদ

ভাল ; যদি হয় মূলে তাহা সাম্রাজ্যবাদেরি নূতন রূপ,
*কিন্তু বল তো জবাব দিবে ওই য়িহুদীর * ?–থেকো না চুপ।*
জ্যোতিহীন এক মূসা সে যেন গো, ক্রুশহীন যেন ঈসা সে নবী,
রসূল যদিও নহে, তবু তার কিতাবে যে আছে প্রতীতি-ছবি।
কি বলিব সেই অবিশ্বাসীর তীক্ষ্ম দৃষ্টি যেন সে তীর,–
পুবে পশ্চিমে আনিয়াছে আজ কেয়ামত এক চিরস্থির।
মানব-স্বভাবে আর কিবা তুমি গভীর ওলট-পালট চাও ?
গোলামেরা মিলি কাটিয়া দিতেছে মনিবের তাঁবু-তন্ত্রী, তাও।

---

* *গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর মতবাদের দিকে ইঙ্গিত।*
* *কার্ল মার্ক্‌স।*

চতুর্থ পারিষদ

*জবাব ইহার হতেছে তৈরী রোমক-প্রাসাদে * দেখনা কেন ?*
সীজারের খাব মোরা দেখায়েছি সীজার-বংশধরেরে জেনো।
ওই দেখ কারা রোম-সাগরের ঊর্মি লইয়া খেলিছে আজি,
কোথাও মেলিছে দেবদারু পাতা, কোথাও বাজনা উঠিছে বাজি।

তৃতীয় পারিষদ

*আমি তো তাহার * বাণীর মর্ম কিছুই বন্ধু বুঝিতে নারি,*
কেন সে য়ুরোপ-রাজ্যনীতির বক্ষ এমন দিতেছে ফাঁড়ি ?

পঞ্চম পারিষদ

[ইবলিসের প্রতি]

হে, তোমার প্রাণ-নিঃশ্বাস-বায়ু জিন্দা রাখিছে বিশ্ব-প্রাণ,
যখনি চেয়েছ, খুলিয়াছ তুমি প্রতি বস্তুর তত্ত্ব-জ্ঞান।
তোমার প্রাণের উষ্ণতা নিয়ে মাটি জলে এল প্রাণের সাড়া,
তব শিক্ষায় জ্ঞান পেয়ে গেল স্বর্গে যে ছিল অবোধ-পারা।
মানব-স্বভাব জান তুমি ভাল তারো চেয়ে যারে স্রষ্টা কয়,
সকল সরল বান্দারা মিলি নিশিদিন গাহে যাহার জয়।
যারা ছিল সদা জপমালা আর শুদ্ধাচারের মন্ত্র নিয়ে,
আত্মবোধের সম্মুখে তোমার নতমুখী তারা লজ্জা পিয়ে।
যদিও তোমার শিষ্যের দলে আছে যাদুকর য়ুরোপে শত,
বিশ্বাস আমি হারাতে বসেছি তাদের যাদুর উপরে যত।
*ওই যে য়িহুদী মজদকী * প্রাণ দিয়েছে যাহাতে নূতন সুর,*
মত্ততা তার কাঁপায়ে তুলেছে প্রতিটি মানব-বক্ষপুর।
তুচ্ছ বায়স সম পদ চায় লভিতে দারুণ শ্যেনের সাথে,
কি ত্বরিতে দেখ, বদল হতেছে বিশ্ব-বিধান সেই সে খাতে।
উপেক্ষাভরে যার দিকে মোরা চাইনি কখনো চক্ষু তুলে,
সেই দেখি আজ চাইছে আকাশ, এক মুঠি ধূলি ছিল যে মূলে।

---

* ফ্যাসিজমের উৎপত্তি-স্থান ইতালীর দিকে ইঙ্গিত।

* ফ্যাসিজমের উদ্গাতা মুসোলিনীর দিকে ইঙ্গিত।

* প্রাচীন ইরানের এক দার্শনিক যিনি বিবাহ-বিধির ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদ প্রচার করতেন। সম্রাট নওশেরওয়ান মজদককে নিহত করেছিলেন।

আগামী দিনের বিপদ ইহার সম্ভাবনার নাহিক শেষ,
দাপটে ইহার কাঁপিতেছে গিরি, কান্তার, দরী সকল দেশ।
হে প্রভু মোদের, সে-দুনিয়া আজ বুঝিবা ওলট পালট হয়,
চিরদিন তব পরিচালনার অধীনে যাহার ঘুচিত ভয়।

ইবলীস

আমার হাতের ক্ষমতায় ধৃত গন্ধ-রঙের জগৎ এই,
এ পৃথিবী, এই চন্দ্র-সূর্য, সপ্ত তলার আকাশ এই।
*অচিরেই সব দুনিয়ার লোক অবাক দেখিবে তামাশা * এক,*
ফিরিঙ্গি-প্রাণে বহায়েছি ওই তপ্ত লহুর দরিয়া দেখ।
রাজনীতিকের বুদ্ধি কিংবা গীর্জার যত পুরানো মন,
আমার ডাকেতে পাগল সবাই, চঞ্চল যত জগৎ জন।
আমার রচিত এ ঘরকে যারা ভঙ্গুর ভাবে কাঁচের মত
ভেঙ্গে একবার দেখুক না এই সভ্যতা-ভিত শক্ত কত !
প্রকৃতি আপনি জামার বক্ষ দীর্ণ করিয়া রেখেছে যার,
এই মজদকী দর্শন-সূচি পারিবে কি দিতে জোড়াটি তার।
কি ভয় আমারে দেখাইতে পারে ভবঘুরে এই সাম্যবাদী,–
জীবিকা-ব্যাকুল অথির-চিত্ত ব্যস্ত-স্বভাব প্রলয়নাদী ?
যদি কারে ডরি দুনিয়াতে আমি তবে তাহা সেই জাতিটি যার,–
ভস্মে আজিও প্রেমের অগ্নি প্রকাশে ক্ষণিক দীপ্তি তার।
কদাপি এমন চোখে পড়ে যায় মুসলিম তাতে ভাবিত হই,
জালেম আজিও ভোরের অশ্রু দিয়া রচিতেছে জীবন-বই।
অজানা জগৎ ফেলিতেছে ছায়া তাহার আঁখির তারকা 'পর,
বলিতেছি তাই, তারই ভয় করি, সাম্যবাদীর নাহিক ডর।

।। ২ ।।

জানি এই জাতি কোরান লইয়া করেনাক আর জীবনে রণ,
তারো জীবনের লক্ষ্য হয়েছে সঞ্চয় করা পুঁজির ধন।
জানি, প্রাচ্যের আঁধার রাত্রে কা'বার পূজারী করিয়া সাজ,
দীপ্ত হাতের উজল আলোতে পথ-নির্দেশ করে না আজ।
আধুনিক যুগ-তাগিদ তবুও সমস্যা এই তুলেছে ধরে,
মুহম্মদের প্রণালী বুঝি বা প্রকাশ হইয়া আজিকে পড়ে।

---

* *দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণী।*

সাবধান করি, বেঁচে রও তার নীতির দারুণ আঘাত থেকে,
নারীকে সে করে রক্ষা এবং পৌরুষ আসে যাহারে দেখে।
সকল গোলামি তরে তার বাণী মৃত্যুর যেন রুদ্র ডাক,
রাজা ভিখারীর দেখা পাবেনাক যেথায় এ বাণী ছেড়েছে হাঁক।
সে করে সকল অর্থকে পুতঃপবিত্র যত কলুষ হতে,
ধনী যে ধনের রক্ষক শুধু, মালিক নহেকো সে কোনমতে।
কর্মের আর চিন্তার বল, এর চেয়ে বড় কি বিপ্লব–
ভূমির মালিক রাষ্ট্র নহেকো, খোদারি মাত্র দুনিয়া সব।
জগতের কানে চাপা যতদিন থাকে এর বাণী, ততই ভালো,
আশার কথা যে মুসলিম খোদ ভুলেছে জ্বালাতে নিজের আলো।
উত্তম, তারা ধর্ম মাঝেই থাক চিরদিন হইয়া লীন,
ব্যস্ত থাকুক কালামুল্লার ব্যাখ্যা লইয়া রজনীদিন।

।। ৩ ।।

তকবীর যার ভাঙ্গিয়াছে কভু দশটি দিকের যাদুর ঘোর,
হোক তাহাদের মোহ-তমিস্রা-ঘেরা এ রাত্রি কভু না ভোর।
মেরীর তনয় ক্রুশেতে মরেছে, অথবা গিয়াছে গগন-পার ?
খোদার গুণ কি সত্তায় আছে, অথবা বাহিরে প্রকাশ তার ?
যে মহা পুরুষ আসিবেন তিনি খ্রীষ্ট, ঈসা না অন্য জন ?
'মুজাদ্দিদ' তিনি ? –রয়েছে যাঁহাতে ঈসার গুণের সকল ধন ?
কোরান রচন অমর না তারা যুগের বারতা বহিছে শুধু ?–
কেবল যাহার বিশ্বাসে আছে হাশর দীনের নাজাত-মধু !
–যুক্তি জালের এই বুতেদের এ যুগে তাহারা শরণ নিক,
এমনি সকল প্রশ্নের ধাঁ ধাঁ প্রতিভা তাদেরে বাছিয়া দিক !
কর্ম-জগৎ হতে আরো দূরে তোমরা এদেরে ভুলিয়ে নাও
কিস্তি এদের প্রথম চালেই হয় যেন মাৎ দেখিয়ো তাও।
ভাল আমাদের, এই মুসলিম থাকে যদি দাস চিরটি কাল,
নশ্বর ধরা অপরকে দিয়া গোলামিরে যদি জানে সে ভাল।
এমনি কবিতা মরমী তত্ত্ব শোভন তাদের, জানিয়া লও,–
জীবনকে যাহা রাখে সুগোপন, সে-গীতি তাদের শ্রবণে কও।
সাবধান থেকো, খুব সাবধান এ জাতি যেন না জাগর হয়,–
ধর্ম যাহার নিতি নিতি এই ধরার সকল হিসাব লয়।
মত্ত করিয়া রাখ ইহাদেরে উপাসনা আর জপের মাঝে,
'খানকা-মেজাজ' * দৃঢ়তর কর, উদাসীন রাখ সকল কাজে।

* আশ্রম বা পীরের আস্তানা যেখানে তপজপ করা হয়ে থাকে।

POLITICAL PHILOSOPHY OF IQBAL

ADVOCATE MUJIBUR RAHMAN

Talent and the capacity for the acquisition of ideas and their assimilation with wisdom and vision play vital roles in the making of a great man. All these factors contributed conjointly in the case of Allama Iqbal, the greatest philosopher-poet of the Modern Age. He was born on November 9, 1877 at Sialkot, Punjab. He came of a Muslim family with a background of Islamic moorings. After his education up to M.A. in philosophy in Lahore, he entered into a new phase of life through his education in Europe. During his stay there for three years (1905-1908) he secured his M.A. degree in philosophy from Cambridge where his talent attracted the special attention of his famous philosopher-teacher Dr. McTaggart and others. He obtained his Doctorate from Munich University in Germany for his thesis, *Development of Mataphysics in Persia,* and he was called to the Bar from the Hon'ble Society of Lincoln's Inn.

His study of both Eastern and Western philosophy and his intimate acquaintance with the concepts of both the Eastern and Western Worlds on different issues of life created in him an extraordinary synthesis. This reorientation made him a master of modern thought and a reconciler of the spiritualism of the East and the materialism of the West. He consequently assumed a world personality.

WHY ISLAM IS THE SHEET-ANCHOR OF IQBAL'S POLITICAL PHILOSOPHY

Religions other than Islam do not offer a complete system of life. Those religions establish a private relationship between an individual and the Creator. So those religions teach only some rites and rituals for the limited purpose of His adoration. Christianity condemns and forsakes this worldly life in clear terms. Jesus said, "Render unto Caesar the things that are Caesar's and unto God the things that are God's."[1] Christianity teaches the renunciation of this worldly life. "My kingdomis not of this world", said Jesus.2

So the Christians became very busy during its early centuries for the kingdom of the heaven; as such they liked renunciation of this world and encouraged monasticism, though Allah's Kingdom requires firmness, courage, resistance, law and discipline to establish and enforce truth and justice. Evasion from society and worldly affairs amounts to escapism from reality. Islam, on the other hand, disapproves of monasticism, asceticism and celibacy. Al-Quran therefore, warned, referring to the followers of Jesus Christ, that what they invented for themselves was not prescribed by Allah for them. [3]

But after the Renaissance (15th century) Europe took a diametrically opposite turn from religiosity and monasticism to unmixed worldly-mindedness and materialism. Machiavelli (1469-1527), said to be the father of moderm politics in Europe, divorced ethics from politics altogether. Consequently religion and worldly affairs have been following different courses in the West.

But Islam offers a complete system of life. Through innumerable prophets the divine guidance for mankind was gradually sent and with the intellectual development of mankind it was perfected as a complete code of life revealed to man through the last of the prophets, Mohammad (P.h.) [4]

Temporal and spiritual aspects of life are blended in Islam and as such Islam does not admit of any dichotomy in life. It is an integrated, indivisible and complete scheme of life. Lammens,S.J. an eminent orientalist, rightly observes : 'Shariah', the Quranic Law, imposes on a Muslim an obligation in triple capacity of a believer; of a man and of a citizen of an Islamic State. Shariah regulates his religious, political and social life reserving to itself the right to superintendent its multiple manifestation and to direct its complicated rhythm. [5]

According to Professor Hitti, "In the Muslim mind Religious Law (Shariah), Secular Law and Theology were mixed inextricably. Religious Law (Shariah) was an integral part of the word of Allah. It co-existed with Him. The Shariah, according to traditional view, is eternal, universal, perfect and fit for all men at all times in all places. It preceded the state and the society. It recognises no difference between sacred and the secular. It sets forth and regulates man's relations with and

obligations to Allah as well as his relations with and obligations to his fellow man. Of the roughly six thousand verses in the Quran some two thousand are strictly legislative. They are mostly embraced in Suras "Baqara" and "Nissa."[6]

According to Allama Iqbal, "In Islam the spiritual and the temporal are not two distinct domains, and the nature of an act, however secular in its import, is determined by the attitude of mind with which the agent does it. It is the invisible mental backgrund of the act which ultimately determines its character. An act is temporal or profane if it is done in a spirit of detachment from the infinite complexity of life behind it; it is spiritual if it is inspired by that complexity. In Islam it is the same reality which appears as Church looked at from one point of view and State from another. It is not true to say that Church and State are two sides or facets of the same thing. Islam is a single unanalysable reality which is one or the other as your point of view varies."[7]

Keith Callard; Associate Professor of Political Science, McGill University observes : "In the context of 2000 years of Christian experience and 1600 years of co-existence of Church and State as separate entities, it is difficult for the West to understand a Muslim when he talks of 'the Sovereignty of God', 'Ideological State' and an 'Islamic Republic'. Early Christians had no opportunity to run Civil Government. But the Prophet and the early Caliphs had and there was no dual authority in Medina."[8]

Iqbal made a deep and penetrating study of Al-Quran, which convinced him that it was Islam alone, as a Complete System of Life, that could pragmatically solve all human problems on the one hand and ensure a balanced development of an individual as well as of collective human society on the other. So the sheet-anchor of his political philosophy was Al-Quran. He called the Muslim Ummah to the pristine purity of Islam. The code of life prescribed by Al-Quran is a complete one, which furnishes the basic principles for the solution of all human problems -social, political, economic, national and international.

The choice of Islam by Iqbal to be the foundation of his political philosophy is not due to the fact that he was a Muslim by birth and faith. His choice was based on a comparative and dispassionate study of

Islam vis-a-vis the other religions and systems of life and his conclusion rested on the merit of Islam as a code of life.

Even non-Muslim political philosophers, top-ranking Western sociologists and thinkers admit the superiority of Islam as a code of life. According to Wilfred Cantwell Smith, the superiority of Islam over Christianity is glaring. He says : "During the Middle Ages, religion flourished in both the Communities, yet that was when Islamic civilization flourished while Christendom showed no vitality. He further observes that as long as Christianity reigned supreme, Europe was actually backward; it is only as Europe has gradually shed her religion, or relegated it to less and less decisive aspects of life that she has forged ahead so spectacularly. The Islamic World, on the other hand, has retrogressed since gradually forsaking the true tenets of Islam.[9]

H.G. WELLS (1866-1946), English novelist, Sociologist and historian, discussing the phenomenal and marvellous vigour of Islam as a Complete Code of life says : "And if the reader entertains any delusion about a fine civilization, either Persian, Roman, Hellenic or Egyptian being submerged by this flood, the sooner he dismisses such ideas the better. Islam prevailed because it was the best social and political order the times could offer. It prevailed because everywhere it found politically apathetic peoples, robbed, oppressed, bullied, uneducated and unorganized, and it found selfish and unsound government, out of touch with any people at all. It was the broadest, freshest and cleanest political idea that had yet come into actual activity in the world, and it offered better terms than any other to the mass of mankind." [10]

Charis Waddy in appreciation of the merit of islam as a complete code of life and greatness of the Prophet of Islam observes : "What does the life of the Prophet mean to us ? When he died at the age of sixty-three, his life's work had completely transformed his native land. Not only did a new pure faith prevailed, but the whole of existence had become different; the status of the poor and of the slaves, the right of the woman and the protection of the minors had been put on a totally new basis, politics and economy were reorganized, democracy brought into public life all in a new manner incredibly audacious for those days." [11]

She further observes : "In Islam, for the first time, an economic theory

of equal opportunities and fair distribution was outlined. Islam teaches that God is concerned not only with moral and ethical reforms but also with social emancipation and economic conditions. The Quran provides a basis for a moral interpretation of history, an interpretation which is deeper and broader than that of Karl Marx, bacause it covers both the moral and material aspects while that of Karl Marx concentrates entirely on the material aspect being greatly influenced by the materialistic evolutionary philosophies of his time." [12]

The comprehensive code of life as prescribed by Allah for the guidance of mankind through Al-Quran was preached and practised most successfully by the Prophet Muhammad (SM) in the laboratory of the Islamic State at Medina. So the Prophet of Islam was given the top position among the prophets, political philosopher, scientists and others for his contribution to world civilization. Michael H. Hart, in his book 'The 100' (One Hundred) observes, 'My choice of Muhammad to lead the list of the world's most influential persons may surprise readers and may be questioned by others, but he was the only man in history who was supremely successful both on the religious and secular levels." [13]

Even with regard to the modern world, tormented by multifarious problems, the teachings of Islam and of its Prophet is the only guidance and hope for mankind. George Bernard Shaw, the most critical observer of human affairs with deep insight, who was also said to be the voice of the conscience of Modern Europe, says, "I have always held the religion of Mumammad (SM) in high estimation because of its wonderful vitality. It is the only religion which appears to me to possess that assimilating capacity to the changing phase of existence which can make its appeal to every age. I have studied him, the wonderful man, and in my opinion far from being an anti-Christ, he must be called the saviour of humanity. I must believe that if a man like him were to assume the dictatorship of the modern world, he would succeed in solving its problems in a way that would bring it the much needed peace and happiness. I have prophesied about the faith of Muhammad (SM) that it would be acceptable to the Europe of tomorrow as it is beginning to be acceptable to the Europe of today"[14]. So the choice of Islam by Iqbal to be the basis of his political philosophy is justified even by non-Muslim

political thinkers, philosophers and sociologists.

Iqbal, having been equipped with wise, balanced and pragmatic ideas derived from al-Quran, the divine guidance, interpreted different issues, national and international, in an objective way. He exploded, inter alia, the Western secular concepts of nationalism, capitalistic democracy and dialectical materialism.

NATIONALISM

According to *Iqbal*,nationalism, which is based on geography and bereft of any idealism is considered by the West as a demi-god; 'right or wrong my country is the attitude.' Under the impulse of nationalistic patriotism the demon of imperialism was let loose to facilitate exploitation which led the world to continual conflicts and to two World Wars. On the threshold of the new year (1924) his warning to the world was that the magnitude of evils brought into the world by the forces of imperialism had puzzled and bewildered the thinkers of the world and if these things continued for long the world would become unfit for human habitation. Bertrand Russell subsequently echoed the same view through his anti-nuclear compaign. Islam does not believe in geographical nationalism, it believes in internationalism and universalism.

DEMOCRACY

According to Iqbal class war is the result of Western democracy where, as justice and unanimity are the results of Islamic democracy. [15]

The superiority of Islamic concepts lies in the basic characteristic of Islam that it neither allows any deal with others unjustly nor allows itself to be dealt with unjustly. [16] Iqbal, having critically examined the concept of modern secular democracy and its functioning, observed that its sole function is to exploit the poor in the interest of the rich. He further observed that democracy is a coat which several European countries discarded after trial and which a number of Asiatic countries have picked up to wear, however ill fitting it may be. He says in 'Zarb-e-Kaleem' : democracy counts the heads and does not weigh the brain. His view in 'Payam-e-Mashriq' is : the brain of two hundred asses cannot produce the brain of a single person. Iqbal could not reconcile

himself to Western democracy on the main ground that popularity is the yardstick, though without ability and wisdom a man can be popular. Iqbal gave this message to the West through his 'Gulshan-e-Raz' that Satan was let loose through Western democracy which is a naked sword in the hand of the political factions. Iqbal heard the voice of imperialism in the flute of Western democracy in his 'Khijr-e-Rah'. According to him, the institution and civilization built upon secular democracy can never be sound.

Harold J. Laski in his 'Parliamentary Goverment in England'[17] and 'Democracy in Crisis'[18], Bertrand Russell in his article 'The Taming of Power'[19] and British statesman Sir Stafford Cripps in 'Democracy up-to-Date'[20] had to agree with the adverse views of Iqbal on the Western democracy.

The causes of the glaring failure of democracy in the West are that the secular heterogeneous society in the West is characterised by conflicts between the nobles and commoners, exploiters and exploited haves and have-nots. Moreover there is no definite and common cultural, social, political and economic programme based on moral foundations as is available in Islam which is a complete and a divine system of life that prescribes the solution of all problems: political, economic, social, national and international.

The basic reason behind the success of democracy in Islam, under the concept of sovereignty of God, is that an Islamic state is a homogeneous institution of Islamic Brotherhood, based on a common cultural, social, political and economic code backed by the supremacy of Law and Independence of Judiciary. The ruler and the ruled are to co-operate in executing the common programme as guided by Al-Quran and Sunnah, There is, as such, no scope for any free style excercise of power politics, usurpation of power and exploitation in Islam.

MARXISM

Iqbal was critical of Communism.

Karl Marx in his Theory of Dialectical Materialism offered an atheistic pattern of an economic system under the slogan of Proletarian dictatorship. It has failed in the same way as western democracy.

Bertrand Russell held the view in his article 'The Taming of Power' that old-fashioned democracy and new-fashioned Marxism have failed, because the former was political and the latter was only economic and without the combination of both no solution was possible [21]. Marxism under its artificial system instead of solving economic problems took away human rights and human dignity. It led society to Totalitarianism and ruthless supression of civil liberty. It is Islam alone that combines both political and economic democracy. Marx's study of history was incomplete and his interpretation of history was very narrow.

Iqbal pointed out that the root cause of all the ills that humanity suffers from is separation of moral values (ethics) from politics. So he advocated spirituality to be combined with materialism. In his lecture on 'Structure of Islam' he emphasised : "Humanity needs three things today : a spiritual interpretation of the universe, spiritual emancipation of the individual, and basic principles of a universal import directing the evolution of human society on a spiritual basis." [22]

As a modern interpreter of Islam, Iqbal, on the basis of his political philosophy, came forward with the vigorous proposal that the world should reorganise society on the values of Islam to solve social, political, economic, national and international problems. He also emphasised it boldly for the Muslim world. Though he was convinced that the Muslim Ummah, to rehabilitate itself should go back to Al-Quran and that was the only means of arresting further decadence of the Muslims, he found a practical difficulty in going back to Al-Quran, particularly in the context of the political situation in the Indian sub-continent because of obvious reasons, viz. (a) sinister designs of the Hindus, (b) Muslims with one third of the population or even less, could never command a majority in the central legislature having a two-thirds Hindu majority in a United India to have a constitution of their own choice and to manage their affairs according to the principles of Islam. So a Muslim state comprising at least the Muslim majority area was felt by him to be indispensable. He emphasised the two-Nation Theory, on the basis of which he in his presidential address to the All India Muslim League Session at Allahabad in 1930 put forward the demand for the partition of the Sub-continent. Iqbal felt the necessity of a statesman who could take upon himself the responsibility of executing his thoughts. A leader,

according to his ideas, was one who by divine gift or experience possessed a keen perception of the spirit and destiny of Islam along with equally deep perception of the trend of modern history. He found extraordinary qualities in Quaid-e-Azam M.A. Jinnah to whom he addressed 13 letters during the period from May 1936 to November 1937, urging him to take up the cause of Muslim India. For Iqbal the Quaid-e-Azam was a great statesman whose talent was indispensable for executing his dream into action and to the Quiad-e-Azam Iqbal was a friend, philosopher and guide. In a letter on May 28, 1937 Iqbal urged the Quaid-e-Azam to demand the partition of the sub-continent and in another letter on June 27, 1937 Iqbal sought to convince the Quaid-e-Azam that the Muslims of North-West India and of Bengal should be considered as nations and entitled to self-determination as other nations. As desired by Iqbal the Quaid-e-Azam reorganised and strengthened the All India Muslim League and adopted the Lahore Resolution, on March 23, 1940 for the establishment of two autonomous states, one in the North-Western corner and another in the North-Eastern part of the sub-continent. The resolution was amended in Delhi convention by the representatives elected on the Mulsim League ticket in 1946 to form one Pakistan. The amendment was initiated by Muslim Bengal and Mr. H. S. Suhrawardy moved the resolution. Ultimately Pakistan was acheived on the 14th of August, 1947 as an ideological state and present Bangladesh is a consequential effect of the partition of the Indian Sub-continent on the basis of the Two Nation Theory. Hence present Bangladesh is the necessary corollary of Iqbal's political philosophy.

References

1. Bible — Matt xvii : 21
2. Do — John xviii : 36
3. Al-Quran — Hadid : 27
4. Do — Maida : 4
5. H. Lammans S.J, Professor of Arabic at St. Joseph's University of Beyroute. — Islam. Belief and Institution P. 82
6. Philip K. Hitti — Islam-A Way of Life P. 42

7. Sir Mumammad Iqbal — The Reconstruction of Religious Thought in Islam Published by Dr. Javid Iqbal S/o Sir Mohammad Iqbal, Sheikh Mohammad Ashraf, Kashmiri Bazar. Lahore, P. 154.

8. Keith Callard Associate Professor of Political Science McGill University. — Pakistan A political Study Ruskin House George Allen and Union Ltd.. Museum Street London, PP 1948196.

9. Wilfred Cantwell Smith — Modern Islam In India. A Social Analysis S.H. Muhammad Ashraf Kashmir-i-Bazar Lahore. Pakistan P 62.

10. H. G. Wells — Out line of History P 425.

11. Charis Waddy — The Muslim Mind. Longman London and New York PP 35-36.

12. Do — -Do P.47

13. Michael H. Hart. — The 100 (One hundred) P. I. Hart Book Galashad Book. New York City.

14. George Bernard Shaw — The Genuine Islam. Singapore Vol. 1 No 8 1936.

15. Thoughts and Reflections of Iqbal. — Edited by Syed Vahed, Muhammad Ashraf Publication, Lahore, P.39.

16. Al-Quran-Baqara — 279

17. Harold J. Laski — Parliamentry Government in England, London George Allen and Unwin Ltd P.43.

18. Harold J. Laski — Democracy in Crisis, George Allen and Unwin Ltd Museum Street, London, P.75.

19. Bertrand Russell — Article 'The Taming of Power in Readings for Thought and Expressions, Compiled by MacMillan Co. New York, P. 177.

20. Sir Stafford Cripps — Democracy Up-To-Date, George Allen and Unwin Ltd Museum Street, London PP.15,20,54.

21. Bertrand Russell — Ibid P. 180.

22. Sir Muhammad Iqbal — Ibid P.179.

Abstract of Contents
Dr. Syed Sajjad Husain

Dewan Muhammad Azraf discusses Iqbal as an exponent of humanism, a philosophy often obscured by the poet's concern about the fate of the Muslims of the subcontinent.

Dr. Abu Said Nuruddin analyses Iqbal's concept of Insan-e-kamil.

Mr. Abbas Ali Khan gives a survey of the life and achievements of Iqbal in the context of India's cultural diversity.

Mr. Abdul Mannan Taleb addresses himself to an enquiry into the ideals underlying the poet's literary work.

The subject of Prof. A. F. M. Hussain Ahmad's essay is Iqbal's attitude to economic and social issues.

Prof. Abu Bakar Rafiq throws light on some aspects of Iqbal's philosophical thought.

Syed Tosaraf Ali emphasises that no matter what political changes the subcontinent undergoes, Iqal's fame will endure.

Miss Kaniz-e-Batul examines Iqbal's attitude to democracy in theory and practice.

Muhammad Sakhi Mian throws light on the poet's attitude to new converts to Islam.

Principal K. A. Rahman, Muhammad Nurul Islam, Abu Naim, Faruq Ahmad Khan, Muzzammilul Huq and Saleh Ahmad contribute Bengali translations from the Urdu and English of essays on Iqbal and his art by Abul Hasan Ali Nadvi, Iqbal as a friend by Maulana Maududi, Humour in Iqbal, Iqbal and Sarojini Naidu, Iqbal and Afghanistan, Iqbal and Jawaharlal Nehru and other subjects.

Mr. Sharif-al-Mujahid's summary of the message of Iqbal is also given in Bengali translation.

ইকবালের ৫২-তম মৃত্যুবার্ষিকী সভা ও ইফতার মাহফিল

নূরুজ্জামান

মহাকবি, প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের স্বাধীন-মুক্ত চিন্তানায়ক আল্লামা মুহাম্মাদ ইকবালের ৫২তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে *'আল্লামা ইকবাল সংসদ'* ২১ এপ্রিল (শনিবার, ১৯৯০) হোটেল পূর্বাণী দিলকুশায় এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলের আয়োজন করে। সংসদ সভাপতি, প্রবীণ দার্শনিক অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় স্বাগত ভাষণ দেন সংসদের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক জনাব বি. এইচ. হারুন।

ইকবালের কালজয়ী আবেদনের উপর আলোচনায় অংশ নেন—ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চান্সেলর, সংসদের অন্যতম উপদেষ্টা, সম্পাদনা ও প্রকাশনা কমিটির চেয়ারম্যান ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, সাবেক ভাইস প্রেসিডেণ্ট জাস্টিজ এ. কে. এম. নূরুল ইসলাম, সাবেক তথ্যমন্ত্রী, রাবেতা, ইবনে সীনা ও বাংলাদেশ-সৌদী আরব ভ্রাতৃ মৈত্রী সমিতির চেয়ারম্যান এডভোকেট মুজীবুর রহমান, বাংলাদেশ-পাকিস্তান মৈত্রী সমিতির সভাপতি প্রফেসর শাহেদ আলী, সংসদ উপদেষ্টা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রিন্সিপাল কে. এ. রহমান, সংসদ সহ-সভাপতি ডঃ আ. ন. ম. বইছউদ্দিন, সংসদ সহ-সভাপতি প্রফেসর এ. এফ. এম. হোসাইন আহমদ, দৈনিক ইনকিলাবের নির্বাহী সম্পাদক মাওলানা কবি রুহুল আমীন খান ও দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদকীয় সহকারী সৈয়দ তোসারফ আলী।

আলোচকবৃন্দ তাঁদের সুচিন্তিত বক্তৃতায় ইকবালের অবদানের বিশ্লেষণ করে বলেন, সূর্যের কিরণ যেমন সর্বত্র প্রতিভাত হয় তেমনি ইকবালের প্রতিভাও সর্বত্র বিস্তৃত। তিনি মানবজাতিকে মর্দে মুমিন হওয়ার দীক্ষায় উদ্দীপ্ত করার আমৃত্যু চেষ্টা করেছেন। ইকবাল দার্শনিক ছিলেন, তার চাইতে বড় কথা তিনি কবি ছিলেন। ইকবাল শুধু মুসলমানদের জন্য নয়, সমগ্র মানবজাতির মুক্তির জন্য কথা বলেছেন। তাঁর কবিতায় বাস্তবতা ছিল, জীবনবোধ ছিল, ছিল মানবতার মুক্তির পথ-নির্দেশ। ইকবালই মানবজাতির ইতিহাসে একমাত্র ব্যক্তি যাঁর চিন্তা থেকে একটি রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছে। বক্তাগণ সংকীর্ণতা পরিহার করে দল-মত নির্বিশেষে জাতীয় স্বার্থে ইকবাল চর্চার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

সংসদের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক, বাংলাদেশ-সৌদী আরব ভ্রাতৃ মৈত্রী সমিতির জেনারেল সেক্রেটারী, রাজবীথি ট্রাভেল এজেন্সীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জনাব বি. এইচ. হারুনের সৌজন্যে সংসদ এ আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলের আয়োজন করে। ইকবালের *'তারানায়ে মিল্লী'* শীর্ষক কবিতা আবৃত্তি করেন জনাব তারেক মোনাওয়ার। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন চৌধুরী গোলাম মাওলা ও মতিউর রহমান মল্লিক। ইফতার পার্টি ও টি পার্টির পর অনুষ্ঠান শেষ হয়।

ইকবালের ৫২তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলের আলোচকবৃন্দ
ডান থেকে পাকিস্তান দূতাবাসের হাই কমিশনার জনাব আনোয়ার কামাল,
প্রিন্সিপাল কে. এ রহমান, জাস্টিস এ. কে. এম নুরুল ইসলাম,
এডভোকেট মুজিবুর রহমান প্রিন্সিপাল দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ অধ্যাপক শাহেদ আলী,
ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন, বি. এইচ. হারুন ও সৈয়দ তোসারফ আলী বক্তৃতা করছেন (বামে)

হোটেল পূর্বাণীর দিলকুশায় আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিলের একাংশ

IQBAL ACADEMY PAKISTAN Library 30992 LAHORE

00030992
8U